PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF BENGAL.
BY THE INDIAN GARDENING ASSOCIATION, CALCUTTA.

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন দ্বারা
প্রকাশিত।

ফসলের পোকা।

ভারতীয় কৃষি-বিভাগের কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত এইচ্ ম্যাক্‌সয়েল-লেফ্রয় সাহেব কৃত

“ইণ্ডিয়ান ইন্‌সেক্ট পেষ্টস্” , ভারতীয় (ফসলাদির)

কীট রোগ নামক পুস্তক অবলম্বনে

এবং

শিবপুর কৃষিকলেজের উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ও

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সহকারী কীটতত্ত্ববিদ্

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পালের

সহায়তায়

উক্ত কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের সহকারী

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি, এ,

প্রণীত।

কলিকাতা

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারত-মিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩১৭ সন।

উপক্রমণিকা।

ভারতীয় কৃষি-বিভাগের কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ম্যাক্সয়েল-লেফ্রয় সাহেবের 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌সেক্ট পেষ্টস্" [ভারতীয় (ফসলাদির) কীট রোগ] নামক পুস্তক অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত। তবে তাঁহার পুস্তকে যে সমস্ত পোকার বৃত্তান্ত আছে তাহাদের মধ্যে অনেক স্বল্প হানিকর পোকার কথা এই পুস্তকে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত যাহাদের বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে এমন অনেক নূতন পোকার কথা বলা হইয়াছে। ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় কীটপতঙ্গ বা পোকা সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ সম্বন্ধে কোনই পুস্তকাদি নাই। বৈজ্ঞানিক কথার প্রতিশব্দও প্রায় বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক কথা ব্যবহার করিয়া পুস্তক লিখিলে এই পুস্তকের যে উদ্দেশ্য তাহা সাধিত হইবে না এই ভাবিয়া বৈজ্ঞানিক কথার প্রয়োগ কিম্বা পোকাদের বৈজ্ঞানিক নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই পুস্তক যাহাদের জন্য লিখিত বৈজ্ঞানিক কথা বা বৈজ্ঞানিক নামের তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই। কোন্ পোকা এবং কি রকমের পোকা শস্যাদির হানি করে, তাহারা কি রকমে খায়, কি রূপে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত বৎসর তাহারা কি ভাবে কাটায় ইহা জানিতে পারিলেই সাধারণ কৃষকের পক্ষে যথেষ্ট হইল। পোকাদের স্থানীয় নাম ব্যবহারেও অনেক আপত্তি আছে। একই পোকার নানা জায়গায় নানা নাম। একই জেলার মধ্যে হয়ত একই পোকা দুই তিন নামে কথিত হয়। আবার দুই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন পোকাকে হয়ত একই নামে ডাকা হয়। এই জন্য কয়েকটী ছাড়া প্রায় সকল পোকারই স্থানীয় নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। পোকাদের গঠনাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও অনাবশ্যক বোধে দেওয়া যায় নাই। প্রায় সকল স্থলেই অনিষ্টকারী পোকা মাত্রেরই চিত্র দেওয়া হইয়াছে। পোকাদের আচরণ যতদূর সম্ভব বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহারা কিরূপে খায় সকল স্থলেই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে কোন্ পোকার কথা বলা হইতেছে যাঁহারা একবার পোকা দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব এই পুস্তকে স্থানীয় নাম অন্বেষণ না করিয়া যে ফসলের পোকার বিষয় জানিতে চান সেই ফসলের পোকার বিবরণ পাঠ করিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন। যে সমস্ত পোকা ক্ষতি করে বলিয়া দেখা হইয়াছে তাহাদেরই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গাছ পাতা ও ফসলাদির উপর অনেক পোকাই দেখা যায়, কিন্তু সকলেই ক্ষতি করে না ; বরং অনেক পোকা অপর পোকাকে নষ্ট করিয়া উপকার করে।

আমাদের দেশের লোকের কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্তই কম, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে অবস্থায় তাঁহারা পোকাকে দেখেন, মনে করেন সেই অবস্থাতেই সেই পোকার উৎপত্তি ও লয়। মেঘ ডাকিলে বা পশ্চিমে কি পূবে হাওয়া বহিলে কিম্বা কেহ শাপ দিলে তাঁহারা মনে করেন পোকা আপনা আপনিই জন্মে। অনেক শিক্ষিত লোকেরই এই ধারণা, কৃষকদের ত কথাই নাই। তাহার উপর কৃষকেরা পোকার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ক্ষেতে ঘাস হইলে যেমন নিড়াইয়া দিবার বা পরিষ্কার করিবার আবশ্যকতা হয় পোকা লাগিলেও সেইরূপ পোকা ছাড়াইবার উপায় করিতে হয়। মানুষ গো মহিষাদির অসুখ হইলে ঔষধের প্রয়োজন হয় ; ফসলে পোকা লাগাও ফসলের অসুখ ; তাহারও উপায় করিতে হয়। ফসলের কীট-রোগের পক্ষে বিশেষ ঔষধ ফসলের তদ্বির। কথাতেই বলে "ঘরের কোণা দূরের সোণা", ঘরের কাছে একটু জমিও ভাল যাহা সকল সময়েই নজরে থাকে, দূরে হইলে অনেক ভাল জমিও ভাল নয়।

অনেক সময় কৃষকেরা ফসল হইতে পোকা বাছিয়া একটু অন্তরে ছাড়িয়া দেয়। ইহার ফলে এই হয় যে, অনেকে ফিরিয়া আসিয়া আবার খাইতে থাকে। আর যাহারা বড় হইয়াছে তাহারা মাটির ভিতর যাইয়া পুত্তলি হয় এবং আবার পতঙ্গ হইয়া ক্ষেতে উড়িয়া আসে ও ফসলের উপর আবার ডিম পাড়ে।

পোকা লাগিয়া ফসল খাইতেছে। তারপর পোকারা অদৃশ্য হইয়া গেল। কৃষক মনে করিল কোন দেবদেবীর পূজা বা কোন ফকীর সন্ন্যাসীর মন্ত্রের তেজে পোকার কুল নষ্ট হইল। দিন কতক পরেই ঝাঁকে ঝাঁকে সেই পোকার প্রজাপতি ক্ষেতে আসিয়া ডিম পাড়িতে লাগিল এবং আরও দিন কতক পরে অসংখ্য পোকা জন্মিয়া সমস্ত ফসল শেষ করিয়া দিল। কৃষক এই পাতা খাওয়া পোকার সঙ্গে প্রজাপতির কি সম্বন্ধ তাহা জানে না। দুইই এক, ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র। এই সমস্ত জানিতে পারিলে কৃষক নিজেই পোকা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার এমন সহজ উপায় করিয়া লইবে যে বহু খরচে যন্ত্রপাতি বা ঔষধাদির কোন আবশ্যকতা হইবে না।

পোকার আচরণ লক্ষ্য করিয়া কি উপায় করিলে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতে পারে এবং ফসলের ক্ষতি হয় না, যতদূর সম্ভব তাহা এই পুস্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন কীটতত্ত্ববিদ্ হইলে অতি সহজেই মন্ত্রাদি দ্বারা ফসলকে পোকা শূন্য করিতে পারা যায়, তাঁহাদের ধারণা নিতান্তই ভুল। অন্যান্য জীব জন্তুর মত কীট পতঙ্গও ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা কাহারও সাধ্য নাই। পোকা সব জায়গাতেই আছে। সাধারণতঃ তাহারা প্রায় ফসলাদির কোন ক্ষতি করে না। সময়ে সময়ে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং তখনই কেবল হানিকর হইয়া উঠে। তাহাদের আচরণাদি লক্ষ্য করিয়া কি উপায় করিলে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া রাখিতে পারা যায় এই পুস্তকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কৃষকদিগকে পোকা চিনাইয়া দেওয়া এবং পোকাদের আচরণ লক্ষ্য করিয়া তাহারা নিজেই পোকার প্রতিকার করিতে পারে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সফল হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আজ প্রায় এক বৎসর হইল "ফসলের পোকা" লিখিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল। নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে যতটুকু অবসর পাইয়াছি সেই সময়েই ইহা লিখিত। প্রথমাবধি শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল এই পুস্তক লিখনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। পারিবারিক ঝঞ্ঝাটে কিম্বা শরীরের অসুস্থতাবশতঃ বা কার্য্যানুরোধে মফস্বলে ভ্রমণ হেতু তিনি এই পুস্তক প্রণয়নের যতদূর ভার লইয়াছিলেন তাহা বহন করিতে পারেন নাই। আমারই উপর সমস্ত ভার পড়িয়াছিল। তাঁহার সহায়তার জন্য আমি বিশেষ ভাবে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত ম্যাক্সয়েল-লেফ্রয় সাহেবের অনুগ্রহে সমস্ত চিত্রপটই প্রায় এক চতুর্থাংশ মাত্র মূল্য দিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অন্যান্য সমস্ত চিত্রই বিনা ব্যয়ে ব্যবহার করিয়াছি। ইহার জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। পুষা কৃষি কলেজের আর্টিষ্ট শ্রীছোটলাল দৌলতরাম সা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি, শ্রীকৃষ্ণধন দাস, শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ভড় ও শ্রীরাঘব রাও দ্বারা আমার তত্ত্বাবধানে সমস্ত চিত্রপট অঙ্কিত।

সহৃদয় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তক প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া কৃষকদের হিতাকাঙ্ক্ষিতার পরিচয় দিয়াছেন।

পুষা—
২০শে সেপ্টেম্বর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ } শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ।

প্রকাশকের নিবেদন।

আমরা আজ কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের "কৃষক" পত্রিকায় ফসলের পোকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কৃষি পরিদর্শক শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কীট-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ কৃষকে ধারাবাহিক বাহির হইয়াছে। ফসলের পোকার বিষয় একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল। বলা বাহুল্য বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তকের নিতান্ত অভাব হইয়াছিল। সহকারী কীট-তত্ত্ববিদ শ্রীযুত চারুচন্দ্র ঘোষ বি, এ মহাশয় প্রণীত ফসলের পোকা নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়া উপস্থিত আমাদের সে অভাব পূরণ হইয়াছে। গ্রন্থকার সহজ ভাষায় কীটতত্ত্ব সাধারণকে বুঝাইবার যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন এবং কীটতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত ম্যাক্সয়েল-লেফ্রয় সাহেবের অনুগ্রহে পুস্তক খানি চিত্রপট সমন্বিত হইয়া সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়াছে। সহৃদয় বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমরা এই পুস্তক প্রকাশের ভার প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়া কৃষিকার্য্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে এই পুস্তক খানি সাধারণের উপকারে আসিলে এই পুস্তক প্রচারের প্রবর্ত্তকগণ সকলেই তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিবেন ইতি।

ভারতীয় কৃষি-সমিতি।
(ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন)
১৬২নং বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

—)*(—

ফসলের পোকা।

পোকার সাধারণ বিবরণ।

আমরা সচরাচর যে সমস্ত পোকা দেখিতে পাই তাহাদেরই উদাহরণ লইয়া পোকা কাহাকে বলে এবং পোকার আচরণ কিরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আর্শলা। (১ ও ২ চিত্র) আর্শলা সকল ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দিনের বেলা প্রায় অন্ধকার স্থানে লুকাইয়া থাকে। কখনও কখনও রাত্রিতে বিশেষতঃ ঝড় বৃষ্টির পুর্ব্বে ঘরের মধ্যে উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা গুড় চিনি চাউল ডাইল পুরাতন কাগজ বা চামড়া প্রভৃতি সকল জিনিসই খায়। রাত্রিতে ঘুমন্ত মানুষের হাতের ও পায়ের নখের কোণের মাংস কাটিয়াও খায়। ইহাদের গঠন চ্যাপ্টা সেইজন্য যেখানে একটু ফাঁক বা ফাট পায় সেইখানে ঢুকিয়া লুকাইতে পারে। পীঠ ডানায় ঢাকা থাকে। ডানা মসৃণ বলিয়া ইহাকে তেলা পোকাও বলে। ইহার ছয়টী পা আছে বড় বড় দুইটী চোখ আছে এবং মাথার উপর চোখের কাছ হইতে দুইটী লম্বা ও সরু শুঙ্গ বা শুঁয়া বাহির হইয়াছে। কামড়াইয়া খাইবার দাঁতওয়ালা
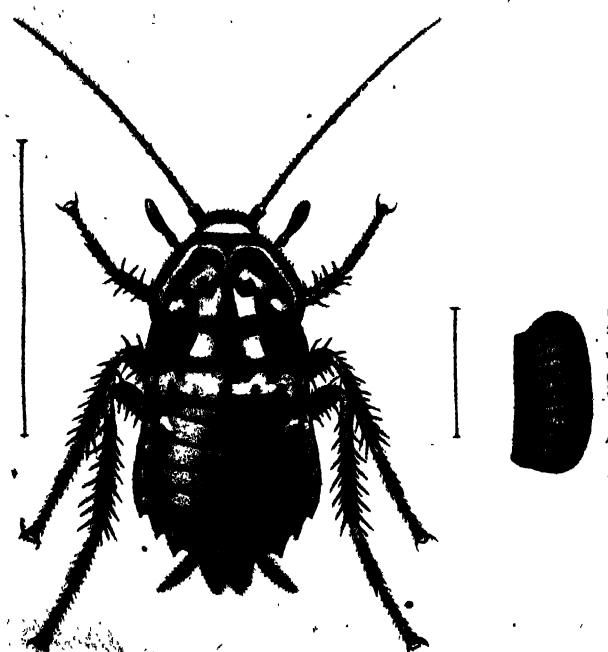
১ চিত্র—আর্শলা ও ডিম।

বা দাড়াওয়ালা মুখ আছে। শরীরের গঠন দেখিয়াই বুঝা যায় যেন কতকগুলি গিরা পর পর লাগাইয়া দিয়া সমস্ত শরীর গঠিত হইয়াছে। আর্শলার ডিম (১ চিত্র) সকলেই দেখিয়া থাকিবে। ইহাকে একটী ডিম না বলিয়া ডিম্ব কোষ বলা উচিত। কারণ ইহার ভিতর আকারানুসারে ১৪ হইতে ১৮টী ডিম সাজান থাকে এবং আমরা যাহাকে ডিম বলি ইহা এই সমস্ত ডিমের আবরণ মাত্র। অতএব এই একটী ডিম্বকোষ
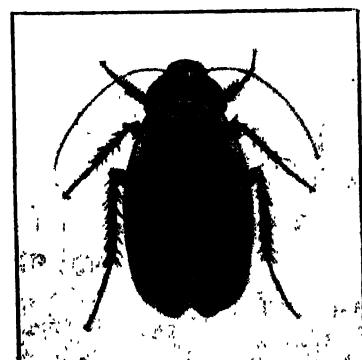
২ চিত্র—আর্শলা।

হইতে ১৪টী কিম্বা ১৬টী কিম্বা ১৮টী ছানা আর্শলা বাহির হয়। সকলেরই নজরে পড়ে ছানা আর্শলাদের ডানা থাকে না। যদি কেহ লক্ষ্য করেন তবে দেখিতে পাইবেন ছানা আর্শলারা যেমন বড় হইতে থাকে মাঝে মাঝে খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার পরই কিছুক্ষণ ইহার রং সাদা থাকে তার পর ক্রমে লাল হইয়া যায়। সেই জন্য অনেক লাল আর্শলার সঙ্গে কখনও কখনও সাদা আর্শলা দেখা যায়। খোলস ছাড়িতে ছাড়িতে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া ডানা গজায়। অর্দ্ধেক ডানা গজাইয়াছে এমন আর্শলা প্রায়ই নজরে পড়ে। সম্পূর্ণ ডানা গজাইলে দেখা যাইবে ইহাদের দুইধারে দুইটী করিয়া চারিটী ডানা আছে। যখন উড়ে না তখন চারিটী ডানাই লম্বালম্বি দেহের উপর পড়িয়া থাকে।

গঙ্গাফড়িং। (৩ চিত্র) ঘাস ও অনেক গাছের উপরেই গঙ্গাফড়িং দেখা যায়। ইহাদের রং, পাতা ও ঘাসের মত সবুজ। সেই জন্য পাতা বা ঘাসের মধ্যে বসিয়া থাকিলে সহজে নজরে পড়ে না। ইহারা কেবল কাঁচা পাতা ও ঘাস খায়। অনেক ছোট গঙ্গা ফড়িং দেখা যায় যাহাদের ডানা আদৌ নাই। অনেকের সামান্য মাত্র ডানা গজাইয়াছে দেখা যায়। বড় গঙ্গাফড়িংএর শরীর যত লম্বা, ডানাও তত লম্বা থাকে। যখন উড়ে না আর্শলার মত ইহারও ডানা শরীরের উপর লম্বালম্বি পড়িয়া দেহকে ঢাকিয়া রাখে। গঙ্গা-ফড়িঙের মত সবুজ এবং আরও কতরকম রঙের অনেক ফড়িং দেখা যায়। সকলেই পাতা, ঘাস খায়। ৪ চিত্রে এক রকম ফড়িং দেখান হই-য়াছে। যখন উড়ে না তখন ডানা কিরূপ থাকে নিম্নের চিত্রে দেখ। যখন উড়ে তখন উপরের চিত্রের মত চারিটী ডানাই দেখা যায়। যখন বসে তখন নিম্নের ডানা ভাঁজ হইয়া উপরের ডানার ভিতর ঢাকা থাকে। ছোট গঙ্গাফড়িংএর যখন ডানা থাকে না তখন লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। গঙ্গাফড়িঙেরও ঘাস পাতা ইত্যাদি কাটিয়া খাইবার মুখ আছে, ছয়টী পা আছে এবং মাথায় চোখের কাছে দুইটী শুঁড় আছে। ইহার শরীর আর্শলার মত চ্যাপ্টা নয়; উহা গোল
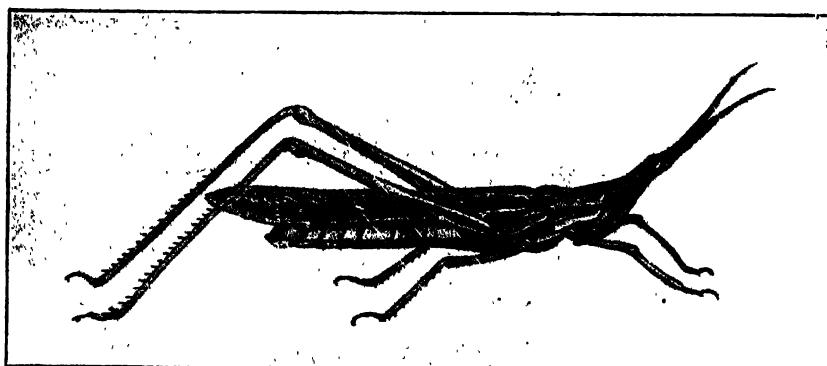
৩ চিত্র—গঙ্গাফড়িং।
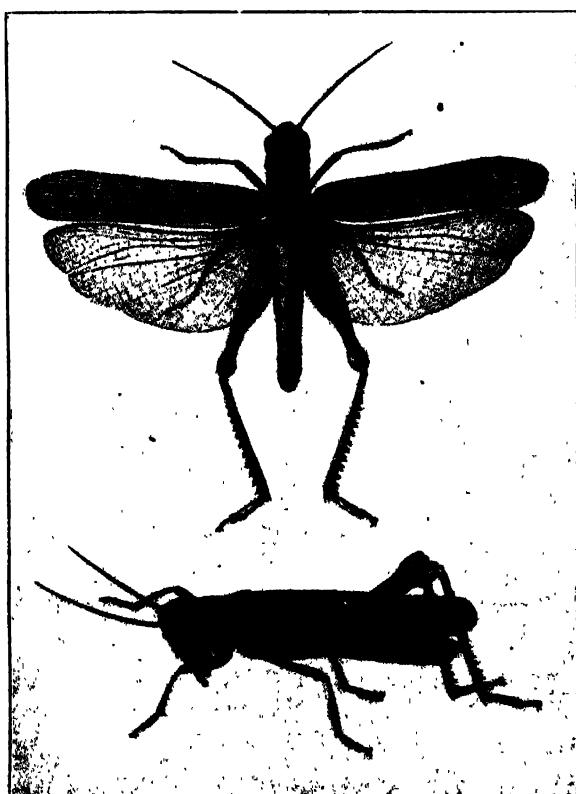
৪ চিত্র—ফড়িং।

নলের মত। তবে ইহার দেহও কতকগুলি গিরা বা গাঁট বা পাব লাগাইয়া লাগাইয়া গঠিত বলিয়া বোধ হইবে।

উই ও বাদ্‌লা পোকা। (৫ ও ৬ চিত্র) উই পোকার ডানা গজাইলে, উই বাদলা পোকা হইয়া উড়ে সকলেই জানে। শুকান পাতা, কাঠ, বাঁশ, কাপড়, চামড়া, ফুল বাগানের গোলাপ প্রভৃতি
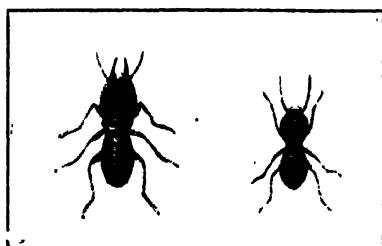
৫ চিত্র—উইপোকা।
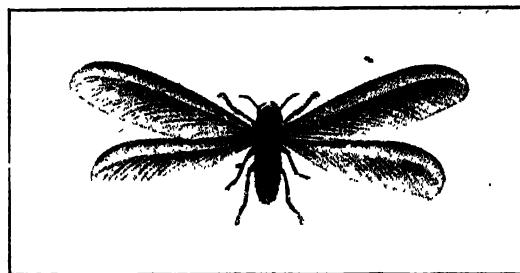
৬ চিত্র—বাদলা পোকা।

গাছ, আক্ প্রভৃতি কত জিনিস উইএর খাবার তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। সচরাচর আমরা যে সব উইকে জিনিস খাইয়া লোকসান্ করিতে দেখি তাহাদের ডানা নাই। কিন্তু কাটিয়া খাইবার মুখ আছে, ছয়টী পা আছে এবং চোখের কাছে দুইটী শুঙ্গ আছে। ইহাদেরও দেহ কতকগুলি গিরা লাগাইয়া গঠিত দেখা যাইবে। এই সমস্ত ছাড়া যে উই পোকার ডানা হয় তাহার চারিটী ডানা থাকে। উই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পুস্তকের অন্যত্র দেখ।

জল ফড়িং। (৭ চিত্র) জল ফড়িং অনেক রকমের আছে। ইহাদিগকে দলে দলে এক এক সময় অনেক উড়িতে দেখা যায়। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—জল ফড়িং, মাছি ও ছোট ছোট প্রজাপতি কিম্বা অন্যান্য পোকা ধরিয়া খায়। পোকাই ইহাদের খাবার। কতকগুলি গিরা লাগাইয়া ইহারও দেহ গঠিত বলিয়া বোধ হইবে। ইহারও ছয়টী পা আছে, মাথার উপর চোখের কাছে দুইটী শুঙ্গ আছে, কামড়াইয়া খাইবার মুখ আছে এবং চারিটী ডানা আছে। অনেকেরই ডানা গঙ্গাফড়িঙের মত পীঠে লাগিয়া থাকে না। দেহ ছাড়াইয়া বিস্তৃত ভাবে থাকে। যখন বসে তখন যেমন থাকে উড়িলেও সেই রকম থাকে।

৭ চিত্র—জল ফড়িং।

ছার। (৮ চিত্র) খাট বিছানার মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া ছার কি রকম বিরক্ত করে তাহা বলিতে হইবে না। ইহারা এত চ্যাপ্টা যে সামান্য ফাটের মধ্যেই ঢুকিয়া লুকায়। ইহাদেরও ছয়টী পা আছে এবং দুইটী শুঙ্গ আছে। ইহাদের কামড়াইবার মুখ নাই। একটী সরু শুঁড় আছে; এই শুঁড় মানুষের গায়ের চর্ম্মের ভিতর ঢুকাইয়া ইহারা রক্ত চুষিয়া খায়। সাধারণতঃ শুঁড় পায়ের মধ্যে পেটের উপর লম্বালম্বি পড়িয়া থাকে। ছারের কখনও ডানা হয় না। ছারের ডিম সকলেই দেখিয়া থাকিবে। লেপ বালিসের কোঁচকান জায়গায় কিম্বা খাট চেয়ারের ফাটে অনেক সাদা সাদা ডিম দেখা যায়। ডিম হইতে যখন বাহির হয় তখন ছোট ছারেরও গঠন বড় ছারের মত এবং ইহারাও বড় ছারের মত মানুষের গায়ে শুঁড় ঢুকাইয়া রক্ত চুষিয়া খায়। ছারের কি রকম গন্ধ তাহা সকলেই জানে। ছারের জাতের যত পোকা আছে সকলেরই প্রায় এই রকম গন্ধ। আলোর কাছে অনেক ছারের জাতের পোকা উড়িয়া আসে। তাহাদেরও এই রকম গন্ধ। লোকে ইহাদিগকে পেঁদা পোকা বলে।
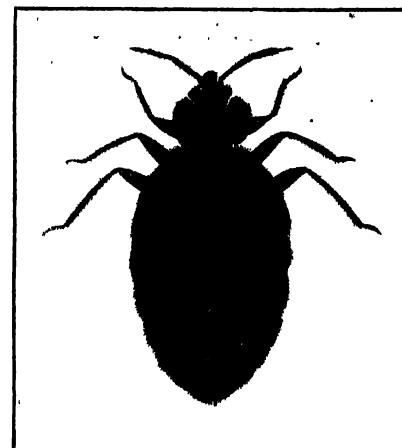
৮ চিত্র—ছার।

উকুন। (৯ চিত্র) অপরিষ্কার লোকের মাথায় উকুন হয়। ছারের মত উকুনেরও একটী ছোট শুঁড় আছে। এই শুঁড় মাথার চামড়ায় ঢুকাইয়া রক্ত চুষিয়া খায়। ইহাদেরও ছয়টী পা আছে এবং কখনও ডানা হয় না। যাহাদের মাথায় উকুন আছে তাহাদের চুলে "নিখি" দেখা যায়। নিখি একটু লম্বা ধরণের এবং চুলে লাগিয়া থাকে। অনেকেই বোধ হয় জানে না যে নিখি উকুনের ডিম। যাহাতে ডিম মাথা হইতে পড়িয়া না যায় উকুনেরা চুলের উপর এইরূপে ডিম লাগাইয়া দেয়। ডিম হইতে যখন বাহির হয় তখন ছানা উকুনেরও আকার বড় উকুনের মত এবং ইহারা নিজেই রক্ত চুষিয়া খাইয়া বড় হয়।
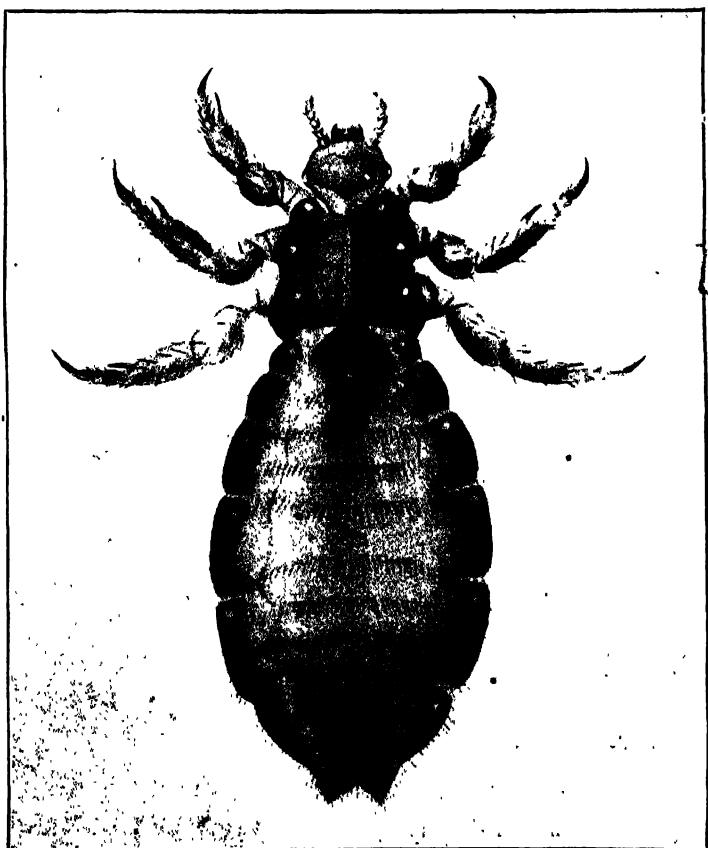
৯ চিত্র—উকুন।

গান্ধি বা ভোমা। (৩য় চিত্রপটের ৮ চিত্র) ইহার বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেখ। ইহারও ছয়টী পা আছে, দুইটী শুঙ্গ আছে এবং চারিটী ডানা আছে। যখন বসে তখন ডানা একটীর উপর একটী এই ভাবে পীঠের উপর সাজান থাকে। ইহার কামড়াইবার মুখ নাই কেবল একটী শুঁড় আছে। এই শুঁড় ঢুকাইয়া ধানের দুধ চুষিয়া খায়। সাধারণতঃ শুঁড় পায়ের মধ্যে পেটের উপর কি রকমে থাকে ১০ চিত্রের বাম পাশের চিত্রে দেখান হইয়াছে।
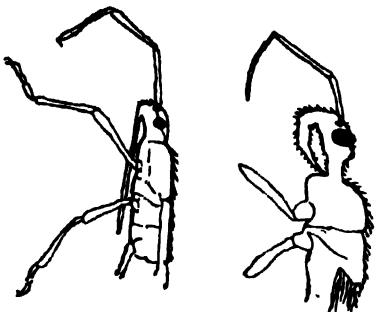
১০ চিত্র—গান্ধি জাতীয় পোকার মুখ।

শসা কুমড়ার লাল ও কাল পোকা। ১৫শ চিত্রপটের ৯ চিত্রে যে পোকা দেখান হইয়াছে ইহারা শসা লাউ কুমড়া প্রভৃতির পাতা খায়। ইহাদের কামড়াইয়া খাইবার মুখ আছে যাহা দ্বারা পাতা কাটিয়া কাটিয়া খায়। দুইটী শুঙ্গ আছে এবং ছয়টী পা আছে। যখন বসিয়া থাকে তখন মনে হয় ইহাদের ডানা নাই এবং পীঠ শক্ত খোলায় ঢাকা। কচ্ছপের পীঠের খোলার মত ইহাদের পীঠের খোলা এক খণ্ড নয়; পীঠের মাঝখানে যে কাটা দাগ দেখা যাইতেছে এই দাগে দুই ভাগ করা। যখন উড়ে তখন দুই ধারের খোলা এই কাটা দাগ হইতে ফাঁক হইয়া যায় এবং ভিতর হইতে দুইধারে পাতলা পর্দ্দার মত দুইটী ডানা বাহির হয়। ১১ চিত্রে এক রকম পদ্ম পোকা দেখান হইয়াছে; যখন উড়ে তখন ইহার ডানা কিরূপে বাহির হয় উপরের চিত্রে দেখ। যখন বসে তখন এই পর্দ্দার মত ডানা ভাঁজ হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে পীঠের উপরে দুই ধারের দুইটী খোলাও ইহাদের ডানা। এই দুইটী ডানা শক্ত হইয়া পীঠের আবরণ স্বরূপ হইয়াছে। এই জাতের সমস্ত পোকারই দুইটী ডানা এইরূপে শক্ত হয় এবং অপর দুইটী ডানা পাতলা পর্দ্দার মত থাকে যাহাদ্বারা ইহারা উড়িতে পারে। সেই জন্য ইহাদিগকে "শক্ত পক্ষ" বা "কঠিন পক্ষ" পতঙ্গ বলে। ভোমরা পোকা (৪র্থ চিত্রপটের ৭ চিত্র এবং ১৭শ চিত্রপটের ৮ চিত্র), সাপের মাসীপিসী (১২ চিত্র) ধামসা পোকা (৩য় চিত্রপটের ১১ চিত্র) চেলে পোকা (১৮শ চিত্রপটের ১১ চিত্র) ধানের মরিচ পোকা (২য় চিত্রপটের ১৪ চিত্র) প্রভৃতি সকলেই এই জাতের শক্ত পক্ষ পতঙ্গ। ইহাদের উপরের দুইটী ডানা শক্ত এবং নিম্নের দুইটী ডানা পাতলা পর্দ্দার মত। যখন উড়ে না তখন নীচের ডানা ভাঁজ হইয়া উপরের শক্ত ডানার ভিতর লুকান থাকে।

১১ চিত্র—শক্তপক্ষ পতঙ্গ।

গোবরে পোকা। (৪র্থ চিত্রপটের ১ ও ২ চিত্র) গো মহিষ প্রভৃতির নাদি সারকুড়ে বা মাটির উপর পড়িয়া থাকিলে এই নাদিতে প্রায়ই এই পোকা দেখা যায়। ইহারা এই নাদি খায়। অনেক গোবরে পোকা গাছের শিকড়ও খায়। ইহাদের কামড়াইয়া খাইবার বেশ দাড়া ওয়ালা মুখ আছে এবং ছয়টী পা আছে। শরীর খুব নরম। ইহারা আলোক আদৌ ভলবাসে না। মাটি বা নাদি উলটাইয়া বাহির করিয়া দিলে তখনই আবার গর্ত্ত করিয়া ঢুকিয়া যায়।
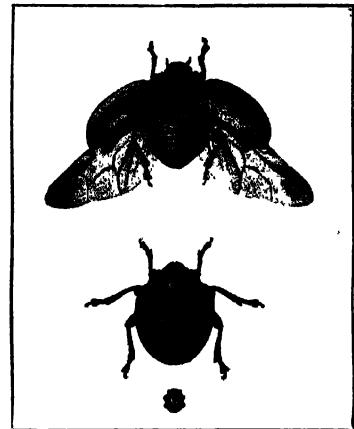
সাপের মাসীপিসী। (১২ চিত্র) যখন তখন যেখানে সেখানে ইহাকে চলিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। যদি কেহ লক্ষ্য করে তবে দেখিতে পাইবে ইহা ছোট ছোট গঙ্গা ফড়িং ধরিয়া ধরিয়া খায়। গঙ্গাফড়িং এবং অন্যান্য পোকাই ইহার খাদ্য। ইহারা বড় বড় দাড়া দ্বারা সহজেই এই সমস্ত পোকাকে ধরিয়া কামড়াইয়া খায়। ধাম্‌সা পোকারও এই রকম দাড়া আছে। ক্ষেতে গান্ধি লাগিলে প্রায় ধাম্‌সা পোকা আসিয়া জোটে এবং গান্ধি ধরিয়া ধরিয়া খায়।
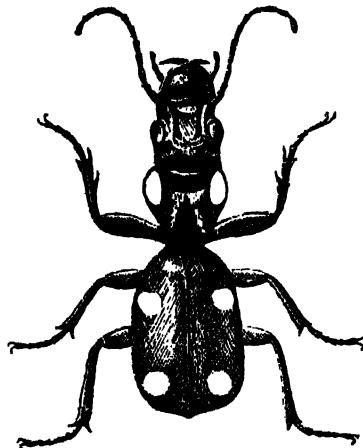
১২ চিত্র—সাপের মাসীপিসী।

চেলে পোকা। (১৮শ চিত্রপটের ১১ চিত্র) চেলে পোকা চাউল খাইয়া অনেক লোকসান করে। ইহারযে শুঁড় দেখা যায় তাহারই অগ্রভাগে কামড়াইয়া খাইবার ছোট মুখ আছে। অনেক কঠিন পক্ষ পতঙ্গের এই রকম লম্বা শুঁড় থাকে।

ঘুণ। ঘুণ ধরা কাঠ ও বাঁশ যদি ফাড়া যায় তবে ঘুণের গুঁড়ার সঙ্গে ৮২ চিত্রের নীচে বাম ধারের পোকা বা ৮১ চিত্রের উপরে ডান ধারের পোকা কিম্বা ১৮শ চিত্রপটে ৯ চিত্রের পোকার মত সাদা পোকা দেখা যায়। ইহারাই ঘুণ পোকা এবং ভিতরে থাকিয়া কাঠ ও বাঁশ কুরিয়া কুরিয়া খায়। ইহাদের সকলেরই দেহ নরম। ইহাদের মধ্যে একটীর ছয়টী পা আছে, অপর দুইটীর পা নাই। তিনেরই শক্ত জিনিস কাটিবার উপযোগী শক্ত দাঁতওয়ালা মুখ আছে। সকলেই শুকান কাঠ বা বাঁশের ভিতর থাকে এবং খুব সম্ভব সেখানে হাওয়ার পর্য্যন্ত চলাচল নাই।

কুম্ভ কারিকা বা কুমরে পোকা। (১৩ চিত্র) ঘরের যেখানে সেখানে কুমরে পোকা একটু একটু মাটী আনিয়া ছোট ছোট বাসা প্রস্তত করে। সকলেরই নজরে পড়ে যেমন এক একটী কুঠরী শেষ হয় কুমরে পোকা এই কুঠরীর ভিতর হয় মাকড়্সা না হয় কোন রকম সবুজ রঙের পোকা রাখিয়া কুঠরীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। কিছুদিন পরে এই কুঠরী হইতেই একটী কুমরে পোকা বাহির হয়। সাধারণ লোকের ধারণা এই মাকড়্সা বা সবুজ রঙের পোকাই কুমরে পোকা হইয়া বাহির হয়। কিন্তু ইহা ভ্রম। মাকড়সা বা সবুজ রঙের পোকা কুমরে পোকার ছানার খাবার। কুঠরীর মধ্যে মাকড়্সা বা সবুজ রঙের পোকাকে রাখিয়া কুমরে পোকা ইহার গায়ে একটী ডিম পাড়ে তার-পর কুঠরীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ডিম হইতে ফুটিয়া ছানা এই মাকড়্সা বা পোকা খাইয়া বড় হয় এবং পরে কুমরে পোকা হইয়া বাহির হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে এক রকম চক্‌চকে গাঢ় সবুজ রঙের বোল্‌তা (ইহাকে কোথাও কোথাও কাঁচ পোকা বলে, বালিকারা ইহার টিপ্ পরে) আর্শলা টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আর্শলা ইহার ছানার খাবার। কুমরে পোকার মত আর্শলাকে গর্ত্তে রাখিয়া আর্শলার গায়ে একটী ডিম পাড়ে। ছানা, আর্শলা খাইয়া বড় হয়। আরও অপর রকমের বোল্‌তা আছে যাহারা অপরাপর পোকাকে নিজেদের গর্ত্তে রাখিয়া তাহাদের গায়ে এইরূপে ডিম পাড়ে এবং ছানারা এই সমস্ত পোকা খাইয়া বড় হয়। যে সমস্ত পোকাকে এইরূপে ধরিয়া আনিয়া গর্ত্তের মধ্যে রাখে
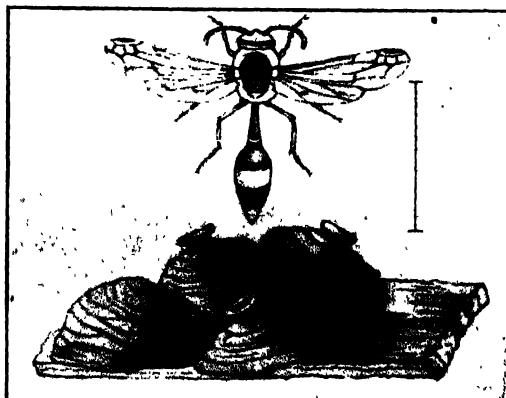
১৩ চিত্র—কুমরে পোকা।

তাহাদিগকে হুল ফুটাইয়া অজ্ঞান করিয়া দেয়, একেবারে মারে না। মারিলে শীঘ্র পচিয়া যায়। অজ্ঞান অবস্থায় থাকে বলিয়া পচে না এবং ছানাদের খাবার অভাব হয় না।

কুমরে পোকার দেহের মধ্যভাগ সরু। ইহারও ছয়টী পা আছে, কামড়াইবার মুখ আছে, দুইটী শুঙ্গ আছে এবং চারিটী ডানা আছে। ডানা গুলি ছোট ছোট এবং পশ্চাতের ডানা অগ্রের ডানা অপেক্ষা ছোট। যখন বসে তখন ডানা পীঠেও পড়িয়া থাকে না কিংবা বিস্তৃত ভাবে খাড়া হইয়াও থাকে না।

পিপীলিকা বা পিঁপড়ে। পিঁপড়ে কত রকমের দেখা যায়। ইহারা মরা পোকা মাকড়, চাউল চিনি প্রভৃতি কত জিনিস নিজেদের বাসায় বহিয়া লইয়া যায়। এই সমস্ত ইহাদের খাবার। ইহাদের কামড়াইয়া খাইবার মুখ আছে। পিঁপড়ের কামড় সকলেই জানে। ছয়টি পা আছে এবং দুইটি শুঙ্গ আছে। ইহাদের দেহের মধ্য ভাগ সরু। সচরাচর যে সমস্ত পিঁপড়ে দেখা যায়, তাহাদের ডানা থাকে না। কখনও কখনও গর্ত্ত হইতে দলে দলে ডানাওয়ালা পিঁপড়ে বাহির হয়। যখন ডানা গজায় তখন চারিটী ডানা হয়। চারিটী ডানাই ছোট ছোট এবং পশ্চাতের অপেক্ষা অগ্রের ডানা বড়।

মৌমাছি বা মধুমক্ষিকা। (১৪ চিত্র) ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে এবং অনবরত এ ফুলে ও ফুলে উড়িয়া উড়িয়া মধু যোগাড় করে। এই মধুর লোভে অনেকেই মধুচক্র বা মৌমাছির চাক্ ভাঙ্গিয়া লয়।

১৪ চিত্র—মৌমাছি বা মধুমক্ষিকা।

যাহারা চাক্ ভাঙ্গে তাহারা দেখিতে পায়, কতক ঘরে এক একটী সাদা নরম একটু লম্বা মাংসপিণ্ডের মত জিনিস রহিয়াছে। বাহির করিয়া লইলে ইহা নড়ে এবং ভাল করিয়া দেখিলে ইহার সরু দিকে একটী ছোট মাথা আছে বোধ হইবে। ইহাকে মৌমাছির কীড়া বলে। আবার অনেক ঘরে এমন এক একটী সাদা জিনিস থাকে, যাহার চেহারা দেখিতে প্রায় মৌমাছির মত, তবে পা, ডানা ও শুঙ্গ সমস্ত বুকের উপর জড়ান আছে, ইহা প্রায় নড়েচড়ে না। আর যদিই নড়ে তবে খুব কম। দেখিতে পুতুলের মত বলিয়া ইহাকে পুত্তলি বলে। যদি কেহ লক্ষ্য করে, তবে দেখিতে পাইবে, কীড়াই বড় হইয়া পুত্তলি হয়, আবার পুত্তলিই মৌমাছি হইয়া বাহির হয়।

ঘরের ভিতর ছাদে ও চালে কিম্বা কড়ির নীচে অথবা খিলানের নীচে অনেক সময় যে হল্‌দে রঙের বোল্‌তা চাক্ প্রস্তুত করে এই চাকেও বোল্‌তার কীড়া ও পুত্তলি দেখা যায়। ইহার কীড়াকে টোপ্ করিয়া অনেকে বঁড়শী দ্বারা মাছ ধরে। এই কীড়াও ক্রমে পুত্তলি হয় এবং পুত্তলি শেষে বোল্‌তা হইয়া বাহির হয়।

মৌমাছি ও বোল্‌তা উভয়েরই দেহের মধ্যভাগ সরু, ছয়টী পা আছে, দুইটী শুঙ্গ আছে এবং চারিটী ডানা আছে। ইহাদের ডানা ছোট ছোট এবং পশ্চাতের ডানা অগ্রের ডানা অপেক্ষা ছোট। ডানা গঙ্গাফড়িঙের মত পীঠে পড়িয়া থাকে না এবং জল ফড়িঙের মত বিস্তৃত হইয়াও থাকে না। উভয়েরই কাটিবার মত দাঁত আছে। তা ছাড়া মধু চাটিয়া লইবার জন্য মৌমাছির একটী জিব্ আছে।

যাহারা চাক্ ভাঙ্গিতে যায়, মৌমাছি তাহাদিগকে হুল ফুটাইয়া ত্যক্ত করে। হুল মৌমাছির অস্ত্র। বোল্‌তারও হুল আছে। পাখী টিকটিকী প্রভৃতি ইহাদিগকে ধরিয়া খায়। খুব সম্ভব এই সমস্ত শত্রু হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য ইহাদের এই অস্ত্র।

শুঁয়া পোকা। (৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৮ চিত্র) শুঁয়াপোকা সকলেই দেখিয়া থাকিবে। ভালুকের মত ইহাদের গা লোমে ঢাকা। ইহাদের রং অনেক রকম হয়। অনেক শুঁয়াপোকা আছে যাহাদের লোম মানুষের হাতে বা পায়ে বা চামড়ার যে কোনখানে ফুটিলে ঘা হয়। সব শুঁয়াপোকার লোমে ঘা হয় না। পূর্ব্ববাঙ্গালায় শুঁয়াপোকাকে বিচ্ছা বলে। শুঁয়াপোকা পাতা কাটিয়া কাটিয়া খায়। ইহাদের কামড়াইবার মুখ আছে। ইহাদেরও

দেহ কতকগুলি গিরা লাগাইয়া লাগাইয়া গঠিত। ইহাদের ৮ জোড়া বা ১৬টী পা আছে। তন্মধ্যে মাথার কাছের তিন জোড়া পায়ে গিরা আছে বলিয়া বোধ হইবে। দেহের মধ্যস্থলের ৪ জোড়া ও লেজের ১ জোড়া পা কেবল মাংসপিণ্ডের মত। শেষের এই পাঁচ জোড়া পা দিয়া ধরিয়াই গাছ পাতার উপর শুঁয়াপোকারা চলিয়া বেড়ায়।

বেগুণের পোকা। (১২শ চিত্রপটের ৪ চিত্র) দাগী বেগুন কাটিলে এই রকম লাল লাল পোকা বেগুনের ভিতর দেখা যায়। ইহারাই বেগুনে সিঁদ কাটিয়া ঢোকে এবং ভিতরে কুরিয়া কুরিয়া খায়। শুঁয়াপোকার মত ইহাদেরও কামড়াইবার মুখ আছে এবং ৮ জোড়া পা আছে।

নেবুপোকা। (১ম চিত্রপট) নেবুগাছে সবুজ রঙের নেবুপোকা প্রায় সকলেরই নজরে পড়ে। ইহারা পাতা খায়। ছোট বেলায় নেবুপোকার রং ঐ চিত্রপটের ২,৩,৪, ও ৫ চিত্রের পোকার মত থাকে ; পাতার উপর বসিয়া থাকিলে দূর হইতে মনে হয় যেন পাতার উপর কোন পাখীর বিষ্ঠা পড়িয়া আছে। আবার বড় হইলে (চিত্রপটের ৬ চিত্র) রঙ নেবু ডাঁটার মত সবুজ হয়। ডাঁটার উপর বসিয়া থাকিলে সহজে চেনা যায় না। পাখী প্রভৃতির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণের ইহা এক উপায়। ইহার পীঠে যদি হঠাৎ আঙ্গুল দেওয়া যায় কিম্বা কাঁটা ফুটাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা (৫ চিত্রের মত) মাথার কাছ হইতে দুইটা সরু শিঙের মত জিনিস বাহির করিয়া আঙ্গুলকে কিম্বা কাঁটাকে বিঁধিতে চেষ্টা করে। মৌমাছি বা বোল্‌তা যেমন হুল ফুটাইয়া শক্র হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তেমনই শক্র হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার ইহাদের ইহাও এক উপায়। সব পোকার এরকম শিং নাই। শুঁয়াপোকার মত ইহাদেরও কামড়াইবার মুখ আছে এবং ৮ জোড়া পা আছে (ঐ চিত্রপটের ৬ চিত্র দেখ)

যদি কেহ কতকগুলি নেবুপোকা সংগ্রহ করিয়া একটা গ্লাসেই হোক কিম্বা ছোট একটা টোক্‌রীতেই হোক রাখে এবং রোজ রোজ তাজা নেবুর পাতা খাইতে দেয়, তাহা হইলে নেবুপোকারা পাতা খায় ও বেশ থাকে। যাহাতে না পালায় সেই জন্য টোক্‌রী বা গ্লাসের মুখটা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। পোকা যখন বড় হইবে, তখন দেখা যাইবে যে, আর পাতা না খাইয়া ৭ চিত্রের মত হেঁট মাথা হইয়া চুপ্‌ করিয়া বসিয়া আছে। ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে ইহার পীঠের উপর লাগামের মত একটা সূতা ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং সেই সূতার দুই প্রান্ত গ্লাস বা টোকরীতে লাগান আছে। প্রায় একদিন এইরূপে বসিয়া থাকিবার পর একবার খোলস ছাড়িয়া ৮ চিত্রের মত আকার ধারণ করিবে। ইহাকে নেবুপোকার পুত্তলি বলে। আরও ৮।১০ দিন পরে এই পুত্তলি হইতে ৯ ও ১০ চিত্রের মত প্রজাপতি বাহির হইবে। এই রকম অনেক প্রজাপতি নেবু গাছের উপর উড়িতে দেখা যায়। যখন নেবু গাছের উপর প্রজাপতি উড়ে, তখন ভাল করিয়া দেখিলে কচি কচি পাতার উপর এই চিত্রপটের ১ চিত্রের ন্যায় ছোট ছোট গোল গোল সাদা ডিম পাওয়া যাইবে। প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া পাতার উপর এইরূপে ডিম পাড়ে। ইহাই প্রজাপতির ডিম। যদি কেহ পাতা সহিত ডিম ছিঁড়িয়া একটা মাটির ভাঁড়ে কিম্বা গ্লাসে রাখে তবে দেখিতে পাইবে, এই ডিম ফুটিয়া এই চিত্র-পটের ৩ চিত্রের মত এক একটী ডিম হইতে এক একটী পোকা বাহির হইবে। ছোট পোকাদিগকে কচি নেবুর পাতা খাইতে দিলে খাইতে থাকিবে এবং ক্রমে ক্রমে বড় হইবে। দুই তিন দিন খাইয়া কতকক্ষণ একজায়গায় চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকে এবং তখন পাতা দিলেও খায় না। কতকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সাপের মত খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকে, তার পর চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায় এবং আবার পাতা খাইতে থাকে। ২।৩ দিন খাইয়া আবার বিশ্রাম করে এবং আবার খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার পর রং একটু বদ্‌লাইয়া যায়। এইরূপে খাইতে খাইতে যত বড় হয়, সর্ব্বসমেত চারি বার কেহ কেহ বা পাঁচ বার খোলস ছাড়ে। শেষ বার খোলস ছাড়িবার পর রং এই চিত্রপটের ৬ ও ৭ চিত্রের মত সবুজ হইয়া যায়। তার পর ৪।৫ দিন খাইয়া বড় হইলে পুত্তলি হয় এবং শেষে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়।

১ম চিত্রপট।

লেবু পোকা।

অতএব দেখা যাইতেছে নেবু পোকার চারি অবস্থা। প্রথম—ডিম (চিত্রপটের ১ চিত্র); ডিমের আকার গেঁড়ি ও গোল এবং রঙ প্রায় সাদা। দ্বিতীয়—নেবু পোকা (চিত্রপটের ২—৭ চিত্র); এই অবস্থাকে কীড়া বলা যায়। কীড়াই পাতা কাটিয়া কাটিয়া খায়। ছোটবেলায় ইহার রঙ চিত্রপটের ২,৩,৪, ও ৫ চিত্রের মত থাকে; বড় হইলে সবুজ হয়। তৃতীয়—পুত্তলি (চিত্রপটের ৮ চিত্র); পুত্তলি অবস্থায় কিছুই খায় না এবং প্রায় চুপ করিয়া নড়ন চড়ন রহিত হইয়া বসিয়া থাকে। চতুর্থ—প্রজাপতি (চিত্রপটের ৯ ও ১০ চিত্র); প্রজাপতির চারিটী বড় বড় ডানা আছে এবং ছয়টী পা আছে। ইহার কামড়াইবার মুখ নাই। তাহার বদলে লম্বা সরু হটকার নলের মত একটী শুঁড় আছে। সাধারণতঃ এই শুঁড় চিত্রপটের ৯ চিত্রের ন্যায় গুটান থাকে। প্রজাপতি ইচ্ছামত এই শুঁড় গুটাইতে ও সোজা করিতে পারে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবে, অনেক প্রজাপতি ফুলের উপর বসিয়া শুঁড় সোজা করিয়া ফুলের ভিতর ঢুকাইয়া দেয় এবং ফুলের মধু চুষিয়া খায়। ফুলের মধু কিম্বা এই রকম তরল পদার্থই প্রজাপতি মাত্রেরই খাবার। ছোট বড় যত প্রজাপতি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে কাহারও কামড়াইবার মুখ নাই। প্রায় সকলেরই এই রকম শুঁড় আছে। প্রজাপতির দেহ লোমে ঢাকা। প্রজাপতির ডানা যদি ধরা যায় তাহা হইলে আঙ্গুলে এক রকম ধূলার মত জিনিস লাগে। ইহা অতি ক্ষুদ্র আঁইস। প্রজাপতি মাত্রেরই ডানা এই রকম আঁইসে ঢাকা। কোন পতঙ্গ প্রজাপতি কিনা সন্দেহ হইলে এই আঁইস দ্বারা ধরা যায়।

শুঁয়া পোকা, বেগুনের পোকা ও নেবু পোকার মত যাহাদের ৮ জোড়া পা থাকে তাহারা সকলেই কোন না কোন প্রজাপতির অপরিণত অবস্থা। ইহাদিগকে প্রজাপতির কীড়া বলা যায়। সকলেই ক্রমে পুত্তলি হইবে এবং শেষে প্রজাপতি হইবে। কাহারও কাহারও ৮ জোড়ার কম পা থাকিতে দেখা যায়, কাহারও ৭ জোড়া, কাহারও ছয় জোড়া বা কাহারও ৫ জোড়া থাকে। প্রজাপতির কীড়ার ৫ জোড়ার কম বা ৮ জোড়ার বেশী পা থাকে না। ইহার মধ্যে মাথার কাছে গিরাযুক্ত পায়ের সংখ্যা কখনও কম হয় না। ইহাদের সংখ্যা সব সময়েই ৬টী থাকে। যদি পায়ের সংখ্যা ৮ জোড়ার কম হয় তবে শরীরের মধ্যভাগ হইতে লেজের দিকে কমিতে আরম্ভ হয়। যাহার ৫ জোড়া পা থাকে তাহার লেজের দিকের দুই জোড়া এবং মাথার কাছের তিন জোড়া গিরাযুক্ত পা থাকে। যাহার ছয় জোড়া পা থাকে তাহার লেজের দিকে তিন জোড়া এবং মাথার কাছের গিরাযুক্ত তিন জোড়া থাকে; ইত্যাদি। কাহারও কাহারও ৮ জোড়া পা থাকে কিন্তু শরীরের মধ্যভাগের পা অন্যান্য পা অপেক্ষা ছোট থাকে যেমন ৫৩ চিত্র। ৮ জোড়ার কম থাকিলেও শরীরের মধ্যভাগের পা এইরূপ ছোট থাকিতে পারে। পায়ের সংখ্যা করিয়া প্রজাপতির কীড়া সহজেই ধরা যায়। যাহার গায়ে রোঁয়া বা লোম থাকে তাহাকে শুঁয়া পোকা বলে এবং যাহার গায়ে রোঁয়া থাকে না, তাহাকে সুতলী পোকা বলে।

১৫ চিত্র—মশা।

মশা। (১৫ চিত্র)। "মশার কামড়" চলিত কথায় বলে। প্রকৃতপক্ষে ছারের মত ইহারাও কামড়ায় না, সরু শুঁড় ঢুকাইয়া রক্ত চুষিয়া খায়। ইহাদের শুঁড় ছারের শুঁড়ের মত নয়। ইহা সম্মুখে
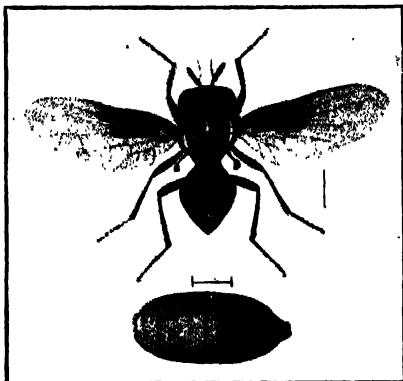
সরু নলের মত থাকে। তবে দুইই একই ভাবে চামড়ার ভিতর শুঁড় ঢুকাইয়া রক্ত চুষিয়া খায়। মশারও ছয়টী পা আছে এবং দুইটী শুঁঙ্গ আছে; শুঁঙ্গের উপরে কম্‌ই হউক আর বেশীই হউক সরু সরু লোম আছে। ইহাদের কেবল মাত্র দুইটী ডানা থাকে এবং অপর দুইটী ডানার বদলে দুইটী সরু ছোট কাঁটা থাকে; এই কাঁটার মাথা মোটা ও গোল। ১৬ চিত্রে ডানা ছড়াইয়া একটী মাছি দেখান হইয়াছে; ইহার ডানার পশ্চাতে এই কাঁটা রহিয়াছে। আমাদের ঘরে যত মাছি দেখিতে পাই তাহাদেরও এই রকম দুইটী ডানা থাকে এবং অপর দুইটী ডানার বদলে দুইটী কাঁটা থাকে। ডাঁস ও কুকুরমাছিও এই জাতের।

১৬ চিত্র—মাছি।

কুজি মাছি। (১৭ চিত্র) যাহারা রেশমের জন্য পলু পোকা পোষে তাহারা বেশ জানে ১৭ চিত্রের ন্যায় এক রকম মাছি পলু পোকার পরম শত্রু। যে ঘরে পলু পোকা রাখা হয় সেই ঘরের দরজায় চিক বা সরু জাল টাঙ্গাইয়া রাখা হয়, যাহাতে এই মাছি না ঢুকিতে পায়। এই মাছিকে জায়গায় জায়গায় কুজি মাছি বলে। কুজি মাছি পলু পোকার ঘরে ঢুকিতে পাইলেই পলু পোকার গায়ে ছোট ছোট ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে মাছির কীড়া বা কৃমি পলু পোকার দেহের ভিতর ঢুকিয়া ভিতর হইতে শরীর কুরিয়া কুরিয়া খায়। সেই সময় হয়ত পলু পোকা গুটী প্রস্তুত করে। কুজির কৃমি, পলুর দেহ ও গুটী ভেদ করিয়া বাহির হয়। তখন ইহা দেখিতে এই চিত্রের বাম ধারের নীচের চিত্রের মত বা চলিত কথায় বড় মুড়ীর মত। বাহির হইয়া এক দিনের মধ্যেই শুকাইয়া বাম ধারের মাঝখানের চিত্রের ন্যায় একটী বীজের মত দেখায়। ইহাই কুজির পুত্তলি। তারপর পুত্তলি হইতে মাছি বাহির হয়। কুজির মত যাহারা অপর পোকার দেহের ভিতর ঢুকিয়া খায়, তাহাদিগকে পরবাসী পোকা বলা যায়। যাহার দেহের ভিতর ঢুকিয়া খায় সে মরিয়া যায়।

১৭ চিত্র কুজি মাছি।

আমাদের দেশে তাল কিম্বা কোন পাকা ফল প্রায় ঢাকা দিয়া রাখে। আঢাকা রাখিলে যদি মাছি বসে তবে "মেছেতা" পড়ে। মেছেতা আর কিছুই নয় মাছির ডিম। মাছি বসিয়া ডিম পাড়ে। সেই ফল যদি রাখিয়া
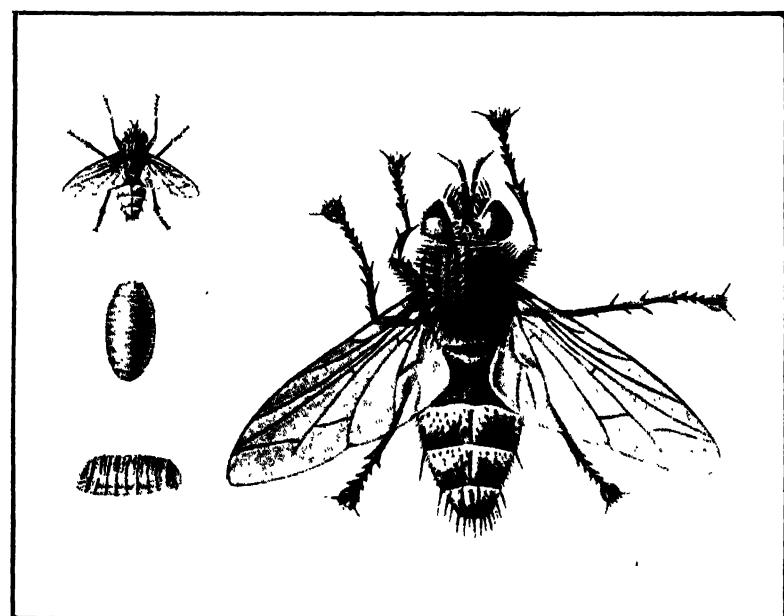
দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে মুড়ীর মত পোকা হইয়াছে দেখা যাইবে। মাছির ডিম হইতে এই সমস্ত পোকা জন্মিয়াছে। ইহারা মাছির কীড়া। ইহাদের পা থাকে না এবং মাথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কৃমি ক্রমে ১৪শ চিত্রপটের ৩ চিত্রের ন্যায় লাল বা কাল বীজের মত পুত্তলি হয় এবং পুত্তলি হইতে শেষে মাছি হইয়া বাহির হয়।

পোকার জাতি নির্ণয়। পাখীরা ডিম পাড়ে। ডিম হইতে যখন ছানা বাহির হয় ছানারা দেখিতে বড় পাখীরই মত হয়, তবে ডানা থাকে না ও গায়ে রোঁয়া থাকে না। সেই জন্য পাখীর দুইটী জন্ম বলে। একবার ডিমরূপে আর একবার পাখীরূপে। আর্শলা ও ছারেরও সেইরূপ দুইটী জন্ম, একবার ডিমরূপে এবং আর একবার আর্শলারূপে ও ছাররূপে। যে সমস্ত পোকার এই রকম দুইটী জন্ম তহাদিগকে দ্বিজন্ম পোকা বলা হয়। নেবুর পোকার চারিটী জন্ম, একবার ডিমরূপে, দ্বিতীয়বার নেবু পোকা বা কীড়ারূপে, তৃতীয় বার পুত্তলিরূপে এবং চতুর্থবার প্রজাপতিরূপে। যাহাদের এই রকম চারিটী জন্ম তাহাদিগকে চতুর্জন্ম পোকা বলা যায়। কুজি মাছি এবং মেছেতার মাছিও চতুর্জন্ম। চতুর্জন্ম পোকার চারি জন্মের অবস্থার আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডিমের সহিত কীড়ার আকারের কোন মিল নাই, কীড়ার সহিত পুত্তলির আকারের কোন মিল নাই এবং পুত্তলির সহিত পতঙ্গের আকারের কোন মিল নাই। চতুর্জন্ম পোকার চারিটী অবস্থা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নামে কথিত হয়। যথা——

(১) ডিম

(২) কীড়া—ডিম হইতে যখন ফোটে তখন কীড়া বলে। কীড়া অবস্থাতে খায়।

(৩) পুত্তলি—ইহা নিশ্চল অবস্থা, এই অবস্থায় কিছু খায় না।

(৪) পতঙ্গ—এই শেষ ও পরিণত অবস্থা। এই অবস্থায় উড়িতে পারে, সঙ্গম করিতে পারে এবং ডিম পাড়ে। পূর্ব্ব তিন অবস্থায় পারে না। এই অবস্থাতেও খায়।

অতএব দেখা যাইতেছে দ্বিজন্ম পোকার কীড়া বা পুত্তলি অবস্থা নাই। ইহাদের ডিম হয় এবং ডিম হইতে ফুটিলেই ছানা দেখিতে মাতৃপোকার মত হয় এবং মাতৃপোকার মত খায়। ছোট বেলায় ডানা থাকে না, ক্রমে ডানা গজায়। ডানা বড় হইলেই পোকা পরিণত হইল, তখন স্ত্রী ও পুং পোকা সঙ্গম করে এবং আবার নিজেরা ডিম পাড়ে।

চতুর্জন্ম পোকার চারিটী পৃথক পৃথক অবস্থা থাকিবেই। যখন পতঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই কেবল পোকা পরিণত হইল এবং তখন স্ত্রী ও পুং পতঙ্গ সঙ্গম করে এবং আবার নিজেরা ডিম পাড়ে।

উপরে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, পোকা কাহাকে বলে তাহা হইতে বোঝা যাইবে। পাখী এবং বাদুড় ছাড়া যাহারা উড়িতে পারে তাঁহারাই পোকা। পরিণতবয়স্ক পোকা মাত্রেরই ৩ জোড়া গিরাযুক্ত পা থাকিবেই থাকিবে। অনেকের ডানা থাকে না যেমন ছার ও উকুন। কিন্তু ইহাদের ছয়টী পা থাকে। মাকড়সা পোকা নয়, কারণ ইহার ৪ জোড়া পা (৭৪ চিত্র দেখ) কিম্বা কেন্নাই বা কেন্নো পোকা নয়, কারণ ইহার ৪০ জোড়ারও অধিক পা। শুঁয়া পোকা ও সুতলী পোকার ৫ জোড়া কিম্বা ছয় জোড়া কিম্বা ৭ জোড়া কিম্বা ৮ জোড়া পা থাকে। ইহার মধ্যে গিরাযুক্ত পা কেবল ৩ জোড়া। ইহারা প্রজাপতিতে পরিণত হইলে কেবল ৩ জোড়া পা থাকে। গোবরে পোকার ৩ জোড়া গিরাযুক্ত পা থাকে। গোবরে পোকাও শেষে ভোমরায় পরিণত

১৮ চিত্র—কেন্নাই বা কেন্নো।

হয় (ভোমরার বিবরণ অন্যত্র দেখ)। মৌমাছি বোল্‌তা এবং মাছির ক্রমির পায়ের চিহ্নমাত্র থাকে না। কিন্তু ইহারা যখন মৌমাছি, বোল্‌তা বা মাছিতে পরিণত হয় তখন ইহাদের ছয়টী গিরাযুক্ত পা হয়। সকল পোকারই দুইটী করিয়া শুঙ্গ থাকে।

উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা ৭ জাতের পোকা দেখান হইয়াছে।

প্রথম—গঙ্গাফড়িঙ, আর্শলা ও উইচিংড়ি। এই জাত দ্বিজন্ম।

দ্বিতীয়—বাদলা পোকা ও জল ফড়িঙ। এই জাতের কতক চতুর্জন্ম, কতক দ্বিজন্ম।

তৃতীয়—মৌমাছি, বোল্‌তা, কুমরে পোকা ও পিঁপড়ে। এই জাত চতুর্জন্ম।

চতুর্থ—কঠিনপক্ষ পোকা যথা শসা কুমড়ার হল্‌দে পোকা, ধাম্‌সা পোকা, চেলে পোকা, সাপের মাসীপিসী। এই জাত চতুর্জন্ম।

পঞ্চম—প্রজাপতি। এই জাত চতুর্জন্ম।

ষষ্ঠ—মশা ও মাছি। এই জাত চতুর্জন্ম।

সপ্তম—ছার ও গান্ধি বা ভোমা। এই জাত দ্বিজন্ম।

পোকার আরও দুই জাত আছে; এ পুস্তকে তাহাদের আলোচনা অনাবশ্যক। পোকা পরিণত না হইলে তাহা কোন্ জাতের ধরা বড় কঠিন। যে সমস্ত পোকার সম্পূর্ণ ডানা গজাইয়াছে তাহারাই পরিণত। তাহার মধ্যে আবার অনেক পোকা আছে যাহাদের ডানা হয় না; যেমন ছার ও উকুন। যে সমস্ত পোকার ডানা হইয়াছে তাহারা আর বড় হয় না। অনেকে মনে করে সম্পূর্ণ ডানাওয়ালা ছোট গঙ্গাফড়িঙ বড় গঙ্গাফড়িঙের ছানা, ইহা ভ্রম। ইহাদিগকে দুই আলাদা আলাদা পোকা বলিয়া ধরিতে হইবে।

পোকার জাত ঠিক করিতে হইলে প্রথমে ডানা দেখিতে হয়, তার পর খাইবার মুখ কি রকম দেখিতে হয়। যে পতঙ্গের কেবল দুইটী মাত্র ডানা থাকে, খুব সম্ভব তাহা দ্বিপক্ষ মশা ও মাছির জাতের। যাহার চারিটী পাত্‌লা পরিষ্কার ডানা আছে, যদি চারিটী ডানাই দেহের অপেক্ষা বড় এবং প্রায় সমান হয় এবং প্রত্যেক ডানাতেই অনেক সরু সরু শিরা মিহী জালের মত সাজান থাকে তবে ইহা জলফড়িঙ ও বাদ্‌লা পোকার জাতের। যদি চারিটী ডানা তত বড় না হয় এবং পশ্চাতের ডানা অগ্রের ডানা অপেক্ষা কিছু ছোট হয় এবং প্রত্যেক ডানাতে মিহী জালের মত শিরা না থাকে তবে ইহা মৌমাছি ও বোল্‌তার জাতের। প্রজাপতি সহজেই চেনা যায়, যদি সন্দেহ হয়, তবে ডানাতে আঁইস আছে কিনা দেখিলেই হয়। প্রজাপতির মধ্যে কতক দিনচর, তাহারা দিনের বেলা উড়িয়া বেড়ায় এবং কতক নিশাচর, তাহারা দিনের বেলা কোনখানে লুকাইয়া থাকে এবং সন্ধ্যা হইলে বাহির হয়। কঠিনপক্ষ পোকা সহজেই ধরা যায়। অনেক গান্ধির জাতের পোকার, কঠিনপক্ষ পোকার মত চেহারা হয়। সে স্থলে মুখ দেখিলেই ধরা যায়। কঠিনপক্ষ পোকার কামড়াইবার মুখ আছে এবং গান্ধির জাতের কামড়াইবার মুখ নাই; কেবল রস চুষিবার জন্য একটী শুঁড় আছে; সেই জন্য এই জাতের পোকাকে শোষক পোকা বলে। আরও কঠিন পক্ষ পতঙ্গের পীঠের মাঝখানে লম্বালম্বি কাটা দাগ থাকে, শোষক পোকার তাহা থাকে না। ইহা দেখিয়াও ধরা যায়। গঙ্গাফড়িঙের জাতের পোকা সহজেই ধরা যায়। এই সকল লক্ষণ দ্বারা অনেক পোকার জাতি নির্ণয় করা যায়। আবার অনেক স্থলে অপর লক্ষণ না দেখিলে চেনা যায় না।

পোকার খাদ্য। পোকার মুখের গঠন দেখিয়া বলা যায় পোকা কি রকমে খায়। যদি দেখা যায় কোন পোকা কোন গাছের পাতা কাটিয়া খাইয়াছে এবং সেই গাছের উপর যদি কোন শোষক পোকা বসিয়া থাকে তবে এই শোষক পোকাই পাতা খাইয়াছে এরূপ মনে করা উচিত নয়। শোষক পোকা কেবল রস চুষিয়া খাইতে পারে, তাহার পাতা কাটিয়া খাইবার মুখ নাই। নিম্নে চিত্রগুলিতে পোকার সাধারণ কয়েক প্রকারের মুখ দেখান হইল।

শুঁয়া পোকা ও সুতলী পোকার মত যাহারা গাছের পাতা কাটিয়া খায়, তাহাদের ছোট ছোট দাঁতওয়ালা মুখ থাকে (১৯ চিত্র দেখ)। ধাম্‌সা পোকাও সাপের মাসীপিসীর মত যাহারা অন্য পোকা ধরিয়া খায়, তাহাদের দাড়ায়ালা মুখ থাকে, যাহাতে সহজেই অন্য পোকা ধরিতে পারে (২০ নং চিত্র দেখ)। উইচিংড়ির মত যাহারা গাছের ডাঁটা কাটিয়া দেয় (ইহার বিবরণ অন্যত্র দেখ) তাহাদেরও বড় শক্ত দাঁতওয়ালা মুখ থাকে (২১ চিত্র দেখ)। গান্ধির মত যাহারা রস চুষিয়া খায় তাহাদের মুখ সরু নলের মত (১০ চিত্র দেখ)। মশা ও ডাঁস প্রভৃতির মুখ ২২ চিত্রে দেখান হইয়াছে। প্রজাপতির মুখ ১ম চিত্রপটের ৯ চিত্রে দেখান হইয়াছে। ইহা ছাড়া মৌমাছির মুখ এরূপে গঠিত যে ইহারা মধু চাটিয়া লইতে পারে এবং কামড়াইতেও পারে।

১৯ চিত্র—সুতলী ও শুঁয়া পোকার মুখ।

২০ চিত্র—কঠিন পক্ষ পোকার মুখ।

২১ চিত্র—।

২২ চিত্র—মাছির মুখ।

খাদ্যানুসারে পোকার নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যায় ;—

প্রথম—শাক্ সব্জী-ভোজী,—যেমন শুঁয়াপোকা, নেবুপোকা, গঙ্গাফড়িঙ ইত্যাদি। উদাহরণে মাত্র কয়েকটী পোকার নাম করা হইয়াছে। গাছের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া ডাঁটা, পাতা, ফুল ও ফল সকলেই পোকা লাগে। গান্ধির মত অনেকে পাতা ইত্যাদি না কাটিয়া খাইলেও গাছের রস চুষিয়া খায়। ইহাদিগকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

দ্বিতীয়—ময়লা জঞ্জাল ও মৃত-ভোজী,—যেমন গোবরে পোকা গো মহিষাদির বিষ্ঠা খায় ; ঘুণ মরা গাছ ও

শুকান কাঠ খায়; পোকা মাকড় মরিলে পিঁপড়েরা টানিয়া লইয়া যাইয়া খায়; উই শুকান কাঠ, পতিত পাতা কুটা ইত্যাদি খায়।

তৃতীয়—হিংস্রক; যাহারা অন্য পোকা মারিয়া খায়। হিংস্রক পোকাকে দুই পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) পরভোজী—খাম্‌সা পোকা, সাপের মাসীপিসী ও জলফড়িঙের মত যাহারা অন্য পোকা ধরিয়া খায়। ব্যাঘ্রে যেমন মানুষ গরু খায় ইহারা সেইরূপ অন্য পোকা ধরিয়া খায়। কুমরে পোকা অন্য পোকা ধরিয়া আনিয়া নিজের সন্তান সন্ততির খাদ্য যোগায়। ইহাদিগকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

(২) পরবাসী—ইহারা কুজি মাছির মত অন্য জীবিত পোকার গায়ে ডিম পাড়ে। ইহাদের সন্তানেরা ঐ জীবিত পোকার দেহের ভিতর থাকিয়া দেহকে কুরিয়া কুরিয়া খায়; কাজে কাজেই ঐ পোকা মরিয়া যায়। মাছির জাতের এবং বোল্‌তার জাতের অনেক পোকা কেবল এই রকম পরবাসীরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দ্বিজন্ম, চতুর্জ্জন্ম প্রায় সকল পোকাতে এইরূপ পরবাসী পোকা দেখা যায়। পরবাসী পোকারা পতঙ্গ, পুত্তলি, কীড়া ও ডিম সকলই আক্রমণ করে। অনেক সময় দেখা যায় এক পোকার ডিমের ভিতর পরবাসী পোকা ডিম পাড়িয়াছে। সে ডিম কখনও ফোটে না। পরবাসী পোকার কীড়া ডিমের ভিতরের সমস্ত জিনিস খাইয়া বড় হয় এবং কিছুদিন পরে ডিমে ছিদ্র করিয়া পতঙ্গ হইয়া উড়িয়া যায়।

চতুর্থ—রক্তপায়ী—যেমন ছার, উকুন, মশা, ডাঁস। ইহারা অন্য জীব জন্তুর রক্ত চুষিয়া খায়। মানুষের মাথায় যেমন উকুন থাকে, সেইরূপ গো মহিষ এবং পাখীদের দেহেও উকুন দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম—গার্হস্থ্য পোকা—প্রকৃত পক্ষে ইহারা এক পৃথক শ্রেণী নহে। উপরের কয়েক শ্রেণীর পোকার মধ্যে যাহারা মানুষের ঘরে আশ্রয় পাইয়াছে তাহাদিকেই গার্হস্থ্য পোকা বলা যায়। যেমন গোলার শস্য ধান, কলাই প্রভৃতির পোকা এবং আর্শলা ইত্যাদি। ইহাদিগকে ময়লা জঞ্জাল ও মৃত-ভোজী শ্রেণীর মধ্যে ধরা যায়। ইহাদের মধ্যে রক্তপায়ী পোকাও আছে, যেমন ছার ও মশা।

ঐ সকল পোকার মধ্যে শাক্ সব্‌জী ভোজী পোকা, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিয়া এবং কয়েকটী গার্হস্থ্য পোকা গোলার ধান কলাই ইত্যাদি নষ্ট করিয়া কৃষকের ক্ষতি করে। হিংস্রক পোকারা কৃষকের বন্ধু। উপকারী পোকা নাম দিয়া ইহাদের বিবরণ এই পুস্তকের শেষে দেওয়া হইয়াছে। শাক্ সব্‌জী-ভোজী পোকা সকলেই ফসল খায় না। যাহারা ফসল খায় তাহারাই কৃষকের শত্রু। শাক্ সব্‌জী-ভোজী পোকার মধ্যে কেহ কেহ কেবল এক রকমেরই গাছ খাইয়া বাঁচিতে পারে। সাধারণতঃ পোকারা এক জাতীয় সমস্ত গাছ খাইয়া থাকে। যেমন কাপাসের পোকা কাপাস জাতীয় অন্যান্য গাছ খাইতে পারে, যেমন ঢেঁড়স্ পেটারী ইত্যাদি; আকের পোঁকা আক্‌জাতীয় মক্কা জোয়ার বাজ্‌রা প্রভৃতি খায়। অনেক পোকা আছে যাহারা নানা জাতের গাছ খাইতে পারে, যেমন পাটের শুঁয়া পোকা ও কাতরী পোকা, তামাকের লেদা পোকা, ছোলা মসুরের লেদা পোকা প্রভৃতি। যে পোকা অনেক প্রকার গাছ খাইয়া বাঁচিতে পারে তাহারাই বেশী অনিষ্টকারী হয়। কারণ সমস্ত বৎসরই কোন না কোন গাছ খাইতে পায় এবং ইহার বংশ বাড়িতে থাকে। যাহারা কেবল এক রকম গাছ খায় সেই গাছ না পাইলে তাহাদের বংশ বাড়িবার সুবিধা হয় না।

পরে ফসলের পর ফসলের পোকার বিবরণ দিবার সময় পোকাদের আচরণের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে, এখানে ডিম কীড়া পুত্তলি ও পতঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ দুই এক কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

ডিম—অনেকে মনে করে, ক্ষেতের পোকা আপনা আপনিই জন্মে। ক্ষেতে যদি শুঁয়াপোকা লাগিয়াছে তবে বলে অমুকদিনে মেঘ ডাকিয়াছিল সেই জন্য শুঁয়া পোকা মাটি হইতে জন্মিয়াছে কিম্বা আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহা ভ্রম। পোকা আপনা আপনিই কখনও জন্মে না। মাতৃপোকা প্রথমে ডিম পাড়ে, সেই ডিম

হইতে পোকা জন্মে। প্রায় সকল পোকাই ডিন পাড়িবার পর মরিয়া যায়। উই, পিঁপড়ে, মৌমাছি প্রভৃতি কয়েক প্রকার পোকা ছাড়া আর কেহ ডিম বা সন্তান সন্ততির যত্ন করে না। তবে পোকা মাত্রেই সন্তান ডিম হইতে ফুটিলেই যেখানে খাবার পাইবে কেবল সেই স্থানে ডিম পাড়ে। অনেক সময় মাতৃপোকা খাবার না পাওয়া পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে না। নেবু পোকার প্রজাপতি কচি কচি নেবু পাতার উপর ডিম পাড়ে। ডিম হইতে বাহির হইয়াই পোকা কচি কচি নেবু পাতা খাইতে পায়। কিন্তু প্রজাপতি আর কখনও সন্তান খাইতেছে কিনা বা সন্তান কেমন আছে দেখিতে আসে না। প্রত্যেক পোকারই ডিম পাড়িবার ধরণ ভিন্ন। কেহ আর্শলার মত ডিম্ব-কোষের ভিতর ডিম পাড়ে, কেহ পাতায় এখানে একটা ওখানে একটা ডিম পাড়িয়া যায়। কেহ এক জায়গায় গাদা করিয়া অনেক ডিম পাড়ে এবং গাদাটা লোম দিয়া ঢাকিয়া দেয়; ইত্যাদি। ডিম ফুটিবার সময়ও প্রত্যেক পোকার পক্ষেই ভিন্ন। মাছিদের ডিম প্রায় দুই এক দিনেই ফোটে। প্রজাপতির ডিম সাধারণতঃ ৩।৪ দিনে ফোটে। সকল পোকারই ডিম ফুটিতে শীতকালে, গ্রীষ্ম ও বর্ষা অপেক্ষা বেশী দিন লাগে। অনেক সময় দেখা যায় ঠাণ্ডার সময় অনেক ডিম ফোটে না। পরে গরম পড়িলে তবে ফোটে। ডিমের সংখ্যায় কোন কোন পোকা মাত্র ২।১০টী ডিম পাড়িতে পারে, আবার কেহ বা হাজারেরও বেশী ডিম পাড়ে। গঙ্গাফড়িঙ জাতের পোকারা প্রায় ৫০ হইতে ১০০ ডিম পাড়ে। মাতা উই একদিনে ৮০০০০ ডিম পাড়ে। প্রজাপতিরা সাধারণতঃ এক একটীতে ৪০০ বা ৫০০ শত ডিম পাড়ে।

কীড়া—ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া আর মাতার যত্ন পায় না। নিজেই যেমন করিয়া পারে খায় এবং নিজেকে শত্রু হইতে রক্ষা করে। খাইয়া খাইয়া যেমন বড় হয় খোলস ছাড়িতে থাকে। প্রজাপতির কীড়ারা অর্থাৎ সূতলী ও শুঁয়া পোকারা সাধারণতঃ ৫ হইতে ৭ বার খোলস ছাড়ে। খোলসের সংখ্যা প্রত্যেক পোকার পক্ষে ভিন্ন। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কীড়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে, শীতকালে বাড়িতে গ্রীষ্ম ও বর্ষা অপেক্ষা বেশী দিন লাগে। কোন পোকার কীড়া কতদিন খাইয়া বড় হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। প্রত্যেক পোকার পক্ষে ইহা ভিন্ন। অনেক সময় অত্যন্ত ঠাণ্ডা বা অত্যন্ত গরম পড়িলে কিম্বা খাদ্যাভাব হইলে কীড়া কিছুদিন নিদ্রিতাবস্থায় থাকে।

পুত্তলি—এই অবস্থায় পোকারা প্রায় নড়ন চড়ন রহিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শত্রু হইতে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। সেই জন্য প্রায়ই পুত্তলি গুটীর ভিতর বা মাটির ভিতর লুকান থাকে। অনেক পোকা নিজের মুখ হইতে রেশম বাহির করিয়া এই গুটী প্রস্তুত করে; যেমন রেশম ও তসরের গুটী। পলু পোকা ও তসরের পোকা নিজের ভবিষ্যৎ পুত্তলি অবস্থার আবরণের জন্য এই গুটী নির্ম্মাণ করে। এই গুটী হইতে মূল্যবান তসর ও রেশম পাওয়া যায়, সেই জন্য যত্নের সহিত লোকে পলু পোকা ও তসরের পোকাকে পালন করে। দিনচর প্রজাপতির পুত্তলির প্রায় কোন আবরণ থাকে না; পুত্তলি গাছের উপর ঝুলিতে থাকে। যেমন ২য় চিত্রপটের ৮ চিত্র এবং ১ম চিত্রপটের ৮ চিত্র। পোকারা সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ৮।১০ দিন পুত্তলি অবস্থায় থাকে। শীতকালে আরও বেশী দিন থাকে। কখনও কখনও পুত্তলি অবস্থায় অনেক দিন নিদ্রিত থাকে।

পতঙ্গ—অধিকাংশ পোকাই পতঙ্গ অবস্থায় ৫।৭ দিনের বেশী বাঁচে না। পতঙ্গের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য বংশরক্ষা এবং সেই জন্য ডিম পাড়া। ডিম পাড়িয়াই প্রায় পতঙ্গ মরিয়া যায়। কুমরে পোকার মত যাহাদিগকে ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য ঘর ও আহার সংগ্রহ করিতে হয় তাহারা বেশীদিন বাঁচে। খাবারের অসম্ভাব হইলে অনেক কঠিন পক্ষ পতঙ্গ অনেক দিন বাঁচে। খাবার পাইলে সেই খাবারের উপর ডিম পাড়িয়া তবে মরে। স্ত্রী পতঙ্গ প্রায় পুংপতঙ্গ অপেক্ষা আকারে বড় হয়। অনেক স্থলে স্ত্রীপতঙ্গের ডানা হয় না কেবল পুংপতঙ্গেরই ডানা হয়। পোকাদের এই বিশেষত্ব যে, যখন পোকা পতঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই ইহার পেটে ডিম হয়। এই ডিম সঞ্জীবিত করিবার জন্য স্ত্রী [illegible] না করিলেও স্ত্রীপতঙ্গই ডিম

প্রসব করিতে পারে কিন্তু এই রকম ডিম কখনও ফোটে না। অনেক পোকা পতঙ্গ অবস্থায় অনেক দিন নিদ্রিত থাকে।

শীতনিদ্রা। বেঙ ও সাপের মত অনেক পোকা শীতকালে নিদ্রিত থাকে। শীতকালে ছারের উপদ্রব অনেক কম হয় এবং মশা ও মাছি প্রায় দেখা যায় না। ইহার কারণ অতিশয় ঠাণ্ডা পড়িলে ইহারা নিদ্রিতাবস্থায় থাকে। অনেক জায়গায় প্রথম শীতের সময় কালীপূজার পর কুলা ডালা পিটাইয়া মশা তাড়াইবার প্রথা আছে। লোকের বিশ্বাস ঐ দিনে মশা তাড়াইয়া দিলে শীতকালে আর মশা হইবে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে লোকে পোকার শীত-নিদ্রার বিষয় অবগত আছে। অনেক পোকা শীতকালে নিদ্রিত থাকে। অনেক পোকার আবার শীতকালেই বংশবৃদ্ধি হয় এবং এই সময়েই ইহারা খায় আর বৎসরের অবশিষ্ট কাল নিদ্রিত থাকে। পোকারা ডিম, কীড়া পুত্তলি ও পতঙ্গ সকল অবস্থাতেই নিদ্রিত থাকিতে পারে। শীতের পর বর্ষার পূর্ব্বে কতকদিন প্রায় অত্যন্ত গরম থাকে, এই সময়টাও অনেক পোকা নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। কেহবা খাবার পাইলে বাহির হইয়া ডিম পাড়ে এবং যদি খাবার না পায় তবে কোন রকমে বর্ষা পর্য্যন্ত নিদ্রায় কাটায়।

এই শীত নিদ্রার পর গরম পড়িলে এক সময়ে হয়ত ৮।১০ দিনের মধ্যে অনেক পতঙ্গ বাহির হয় এবং এক সঙ্গে ডিম পাড়ে। ২।৫ দিন পরে এক সঙ্গে অনেক কীড়া দেখা যায়। কীড়ারা বড় হইয়া পুত্তলি হইতে এবং আবার পতঙ্গ হইয়া ডিম পাড়িতে যদি দেড় মাস সময় লাগে তবে দেড় মাস পরে পরে এই রকম এক সঙ্গে অনেক কীড়া দেখা দিবে। ৪।৫ বার দেখা দিয়া কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে আবার শীত নিদ্রায় অভিভূত হইবে। কিন্তু এই রকম নিয়মানুসারে প্রায় পোকার বংশবৃদ্ধি হয় না। শীত নিদ্রার পর ২।১টা করিয়া অনেক দিনে ইহারা বাহির হয়। কাজেই নিয়মানুসারে বংশবৃদ্ধি হয় না এবং একই সময়ে এক সঙ্গে ডিম কীড়া পুত্তলি ও পতঙ্গ সবই দেখা যায়।

---*০*---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পোকার উৎপত্তি, বাড়, নিবারণের উপায় ও প্রতিকার।

অনিষ্টকারী পোকা যেমন সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সঙ্গে যাহাতে ইহাদের সংখ্যা খুব বাড়িয়া না যায়, ঈশ্বর তাহারও উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। কাক, শালিক্, ময়না প্রভৃতি কত রকমের পাখী পোকা ধরিয়া খায়। টিক্‌টিকী, গির্‌গিটী, বেঙ, মাকড়্‌সা প্রভৃতি আরও কত প্রাণী পোকা খাইয়া জীবন ধারণ করে। হিংস্রক পরভোজী ও পরবাসী পোকাতেও অনবরত কত পোকা নাশ করিতেছে। অনিষ্টকারী পোকাকে দমনে রাখিবার জন্য এই সমস্ত স্বাভাবিক উপায়। পোকার বংশ অতি শীঘ্র বাড়িয়া যায়। যে কোন প্রজাপতি প্রায় ৫০০শত ডিম পাড়ে। ডিম হইতে আবার এক মাস কি দেড় মাসের মধ্যেই প্রজাপতি হয়। এই ৫০০ শতের যদি সকলেই প্রজাপতি হয় এবং অর্দ্ধেক স্ত্রী প্রজাপতি হয়, তবে ২৫০ শত স্ত্রী প্রজাপতি ১২৫০০০ ডিম পাড়িবে। আবার এক মাস কি দেড় মাস পরে ৭৫০০০ স্ত্রী প্রজাপতি প্রত্যেকে ৫০০ ডিম পাড়িবে। অতএব দেখা যাইতেছে, ইহাদের সংখ্যা কত শীঘ্র বাড়িতে পারে। কিন্তু নানা দিক হইতে দমনের উপায় থাকাতে সচরাচর প্রায় এত বাড়িতে দেখা যায় না। উপরে যে সকল শত্রুর কথা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া পোকা দমনের আরও দুইটী উপায় আছে; (১) আবহাওয়া—অত্যন্ত শীতের সময় এবং অত্যন্ত গরমের সময় অনেক পোকাই নিদ্রিত থাকে। অতএব এই সময় ইহাদের বংশ বাড়িতে পায় না। তা ছাড়া নিদ্রিত অবস্থায় শত্রুর আক্রমণে এবং অন্য কারণে অনেকের মৃত্যু হয়। ঝড় বৃষ্টিতেও অনেক পোকা বিশেষতঃ অনেক পতঙ্গ নিহত হয়। (২) খাদ্যাভাব—কেবল বর্ষাকালেই অনেক গাছ সতেজে জন্মে। তার পর শীতকালেও অনেক গাছ থাকে এবং অনেক নূতন গাছ জন্মে। তার পর অনেক গাছ পাতাই শুকাইয়া যায়। যে পোকা এমন গাছ খায়, যাহা কেবল বর্ষাকালেই জন্মে, তাহার বংশ কেবল বর্ষাকালেই বাড়িতে পারে, অন্য সময় খাদ্যাভাবে বাড়িতে পায় না। যে সময় গাছ পাতা শুকাইয়া যায়, তখন অনেক পোকারই বংশ বাড়ে না।

অতএব দেখা যাইতেছে স্বাভাবিক শত্রু, আবহাওয়া এবং খাদ্যাভাব এই তিন কারণে সাধারণতঃ পোকার সংখ্যা বাড়িতে পায় না। কিন্তু মানুষ নিজের কার্য্যগুণে অনেক সময় পোকার বাড়ের সুযোগ করিয়া দেয়। এই রকম কয়েক বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে;——

(১) এক দেশ হইতে অন্য দেশে পোকা আমদানি করা; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বীজ আলুর পোকার কথা বলা যাইতে পারে। এই পোকা আমাদের দেশে ছিল না। বীজ আলুর সঙ্গে বিলাত হইতে এখানে আসিয়াছে। আমেরিকায় এইরূপে এক রকম প্রজাপতির কীড়া লইয়া যাওয়ায় ইহার সংখ্যা এত বাড়িয়াছিল, এবং ইহা এত অনিষ্ট করিয়াছিল যে ইহাকে দমন করিতে বাৎসরিক চারি লক্ষেরও অধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। যখন কোন পোকাকে এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া যাওয়া যায়, নূতন দেশে ইহার সংখ্যা প্রথম প্রথম খুব বাড়িয়া যায়। কারণ পুরাতন দেশে স্বভাবশত্রু প্রভৃতি নানা কারণে ইহার সংখ্যা বাড়িতে পাইত না, নূতন দেশে হয় ত আবহাওয়া সংখ্যা-বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল হয়, এবং প্রথম প্রথম কোন শত্রু থাকে না।

(২) কখন কখন বন জঙ্গলাদি বা বড় বড় গাছ প্রভৃতি কাটার জন্য আবহাওয়া কিছু বদ্‌লাইয়া যায়। অনেক সময় ইহা পোকার সংখ্যা-বৃদ্ধির অনুকূল হয়।

(৩) স্বাভাবিক গাছ অপেক্ষা কৃষিকার্য্য দ্বারা যে সমস্ত গাছ জন্মান যায়, তাহারা কম তেজী। বন জঙ্গলের স্বাভাবিক গাছের, পোকা প্রভৃতি হইতে অনিষ্ট কমই হয়। কম জোর হইলে সকলকেই সহজে রোগে ধরে।

সমস্ত মাঠ জুড়িয়া একই ফসলের চাষ করা হয়। অতএব এই ফসলের পোকাকে খাবার খুজিয়া খুজিয়া ডিম পাড়িতে হয় না। যদি খাবার খুজিতে হইত, হয়ত শত্রুর হাতে মৃত্যু ঘটিত এবং ডিম পাড়িতেই পারিত না। কিন্তু প্রচুর খাবার পাওয়াতে এরকম ভয় থাকে না এবং পোকার সংখ্যা বাড়িয়া যায়। আবার জল সেচন দ্বারা অনেক ফসল প্রায়ই অসময়ে জন্মান হয়। খাদ্যাভাবে হয়ত এই সময় অনেক পোকার মৃত্যু হইত এবং তাহাদের সংখ্যা বাড়িত না। কিন্তু এইরূপে খাবার পাওয়াতে তাহাদের বংশ বাড়িবার সুযোগ হয়।

(৪) অনেক সময় পাখী, টিকটিকী, বাদুড় প্রভৃতি মারিয়া পোকার শত্রু সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয় এবং পোকারা নিঃসঙ্কোচে বাড়িতে পায়।

পোকা সর্ব্বত্রই আছে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ইহারা ডিম পাড়ে এবং ইহাদের বংশ হয়। সংখ্যায় বাড়িয়া যখন ফসলাদির ক্ষতি করে তখনই আমাদের নজরে পড়ে। পোকা মাটি বা জল হইতে আপনা আপনি জন্মে না, কিম্বা বাতাসে উড়িয়া আসে না বা কাহারও শাপ দ্বারা উৎপন্ন হয় না। নানা কারণে ইহাদের সংখ্যা বাড়িতে পারে। উপরে এই বিষয়ের কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

বুদ্ধিমান লোকে অনেক সময় পূর্ব্ব হইতে কীড়া ফসল আক্রমণ করিবে ইহা অনুমান করিতে পারে এবং সতর্ক হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাটের কাতরী পোকার কথা বলা যাইতে পারে। যদি এই কাতরী পোকার প্রজাপতিকে আলোর কাছে অনেক সংখ্যায় আসিতে দেখা যায় বা উড়িতে দেখা যায় তাহা হইলে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে যদি অপর কোন খাবার না পায় তবে এই সমস্ত প্রজাপতি পাটের উপর ডিম পাড়িবে। বুদ্ধিমান লোকে এই সময় পাটের উপর নজর রাখিয়া ইহাদের ডিম জড় করিবে এবং এইরূপে আপনার ফসল বাঁচাইবে। আরও এত বেশী প্রজাপতি দেখিয়া ইহা বোঝা উচিত যে, পূর্ব্বে ইহাদের কীড়ার সংখ্যা ফসলেই হউক আর জঙ্গলেই হউক নিশ্চয়ই বেশী হইয়াছিল। হয়ত একটু চেষ্টা করিলেই কীড়াদিগকে মারা যাইত।

পোকার উপদ্রব একেবারে নিবারণ করা সাধ্যাতীত। পোকা কখন আসিবে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। তবে পোকাদের সাধারণ আচরণ দেখিয়া বলা যায় যে যদি নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে নজর থাকে, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে ইহাদের উপদ্রব নিবারিত হওয়া সম্ভব।

(১) ক্ষেতের পাশে বা মাঠের কাছে আগাছার জঙ্গল থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। পড়া পতিতে কেবল ঘাস জন্মিতে দেওয়া উচিত, তাহা হইলে গোচরও হয় এবং পোকার বংশ বাড়িতে পায় না। আগাছার ঝুপি জঙ্গলই পোকার ঘর। এই রকম জায়গায় কেবল ঘাস জন্মাইলে বা আম ইত্যাদি বড় বড় গাছের বাগান করিলে পোকারা আশ্রয় পায় না।

(২) ফসল কাটিয়া লইয়া ফসলের গোড়া বা ডাঁটা বা ফল ভালই হউক আর খারাপ বা পচাই হউক ক্ষেতে পড়িয়া থাকিতে দিতে নাই। যাহা আবশ্যক ঘরে আনিয়া বাকী পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। ফসলের পোকার কথা বলিবার সময় এই বিষয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(৩) একই ক্ষেতে বৎসর বৎসর একই ফসল উৎপন্ন করা উচিত নয়। অনেক পরিমাণ ক্ষেতে এ বৎসর এক ফসল এবং পরবৎসর অন্য ফসল লাগাইলে পোকার উপদ্রব কম হইতে পারে। কিন্তু ২।৪ বিঘা জমির মধ্যে এ রকম পালা করিলে প্রায় কোন ফল হয় না।

(৪) আমাদের দেশে যে অনেক রকম ফসল এক সঙ্গে লাগাইবার প্রথা আছে তাহা ভাল। কাথায় বলে—সরিষা বনে কলাই মুগ্, বুনে বেড়াও চাপ্‌ড়ে বুক্। অর্থাৎ আনন্দে বুক্ বাজাইয়া বেড়াও। মিশ্র ফসলে পোকার উপদ্রব কম হয়। এক ত পতঙ্গকে গাছ খুঁজিয়া ডিম পাড়িতে হয়। তার পর কীড়া খাইতে খাইতে পাশেই আর খাবার পায় না, মাটিতে নামিয়া খাবার খুঁজিয়া লইতে হয়; তখন বেঙ ইত্যাদির হাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা। আবার এক রকমের অনেক ফসলের মধ্যে যদি অপর রকম ফসলের একটী ছোট ক্ষেত থাকে, তাহা হইলে এই

ছোট ক্ষেতে পোকার উপদ্রব বেশী হওয়া সম্ভব ; অনেক সময় প্রায় সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলে। তবে যদি এই রকমের অনেক ছোট ছোট ক্ষেত মাঝে মাঝে ছড়ান থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি হয় না। ৫০০০ হাজার বিঘা অড়হরের মধ্যে ১০ বিঘা কাপাস ভাল নয়। তবে যদি এই ৫০০০ বিঘার মধ্যে ১০০০ বিঘা কাপাস ১০ বিঘা ১০ বিঘা করিয়া মাঝে মাঝে ছড়ান থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি হয় না।

(৫) অসময়ে কোন ফসল জন্মিলে পোকাদের সুবিধা হয়। কাপাস গাছের প্রায় সমস্ত পোকা টেঁড়স গাছ খাইয়া বাঁচিতে পারে। অতএব কাপাস যখন হয় না তখন যদি টেঁড়স্ হয়, পোকাদের বংশ বৃদ্ধির সুবিধা হয়। অতএব কাপাসের সময় ছাড়া টেঁড়স্ জন্মান উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় এখানে ওখানে কোন রকমে বীজ পড়িয়া অনেক ফসলের গাছ জন্মে। ইহারাও পোকার বংশ বৃদ্ধির সহায়তা করে। অতএব এ রকম গাছ জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়।

ফাঁদফসল—পোকাদিগকে ফাঁদে ফেলিয়া বা ঠকাইয়া মারিবার জন্য যে ফসল জন্মান যায়, তাহাকে ফাঁদ-ফসল বলে। ফাঁদ ফসল দুই রকম হইতে পারে ; (১) আদত ফসল বুনিবার আগে সেই ফসলের সামান্য চাষ করিতে হয়। খাবার পাইয়া যত পোকা এই সামান্য ফসলে ডিম পাড়িবে। তখন পোকা সমেত এই সামান্য ফসল ধ্বংস করিতে হয়, তাহা হইলে আদত ফসল বাঁচিয়া যায়। (২) ফসলের সঙ্গে কোন এক রকম কম মূল্যবান গাছের বীজ বুনিতে হয়। ফসলের সঙ্গে এই গাছ জন্মিবে এবং অনেক পোকা এই গাছ পাইয়া ফসলে তত নজর দিবে না। তার পর যখন আর আবশ্যক হইবে না তখন এই গাছ উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

(৬) ফসলে যে কোন পোকাই দেখা যায়, প্রথম প্রথম যখন ইহাদের সংখ্যা কম থাকে তখন বাছিয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়াই হউক, আর মাটিতে পুতিয়াই হউক, মারিয়া ফেলিলে, ইহাদের সংখ্যা বাড়িতে পায় না। এই উপায়ে অনেক অনিষ্টকারী পোকাকে না বাড়িতে বাড়িতে দমন করা যায়। আমাদের দেশে প্রায় কাহারও ৫০০০।৭০০০ বিঘার চাষ নাই। অধিকাংশ লোকেরই ২।১০ বিঘা লইয়া চাষ। অতএব নজর রাখিয়া এইরূপে পোকা বাছিয়া মারা খুব সহজ। ক্ষেতে মুরগী ছাড়িয়া দিলে মুরগীতে পোকা ধরিয়া খায় এবং পোকার কুল নাশ করে। ফসলের উপর দুইটাই হউক, আর দশটাই হউক, যদি কোন পোকাকে পাতা কাটিয়া বা অন্য কোন রকমে সামান্য মাত্রও ক্ষতি করিতে দেখা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে মারা উচিত।

ফসলে পোকা লাগিলে পোকার আচরণ দেখিয়া অনেক সময় প্রতি-কারের উপায় স্থির করা যায়। তবে সাধারণতঃ বাছিয়া মারা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারা যায় না। হাতে এক একটী বাছা তত সহজ নয়, সেই জন্য ২৩ চিত্রের ন্যায় হাত-জাল ব্যব-হার করা যাইতে পারে। চারি হাত

২৩ চিত্র—হাত জাল।

বা পাঁচ হাত বাঁশের কঞ্চি বা বেতকে বাঁকাইয়া মশারীর কাপড় বা যে কোন কাপড় হউক সেলাই করিয়া সহজেই এই রকম হাতজাল প্রস্তুত করিতে পারা যায়। আবশ্যক হইলে একটা বাঁট বাঁধিয়া লইতে হয়। বড় ক্ষেতে বা ময়দানের উপর টানিবার জন্য ২৪ চিত্রের মত কাপড়ের থলে বেশ সুবিধাজনক ; দুইধারের দড়িতে দুইটী
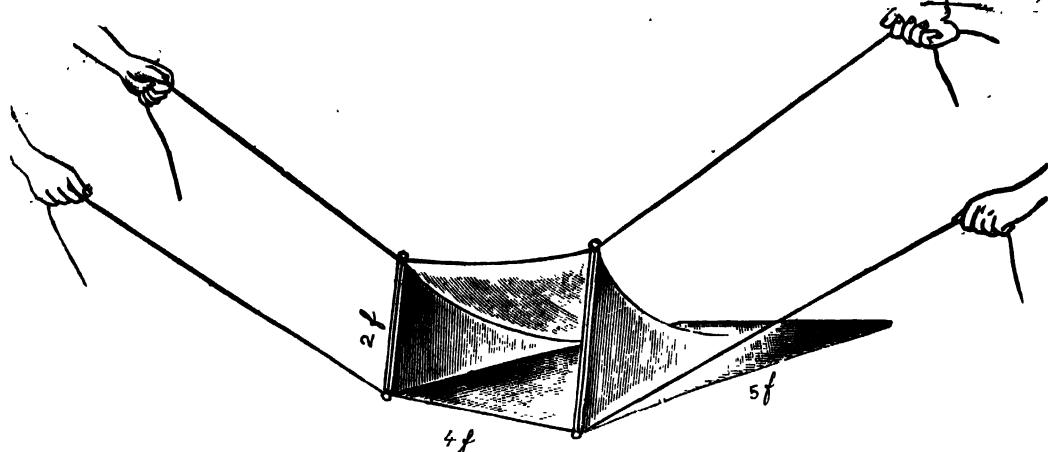
২৪ চিত্র—পোকা ধরা থলে।

সরু বাঁশ বাঁধিয়া এক জনেই এই রকম থলে টানিতে পারে। আবশ্যক হইলে ২৫ চিত্রের মত বড় থলেও করিতে পারা যায়। থলে বড় হইলে মুখে চারি কোণা বাঁশের ঠাট বাঁধিয়া বা সেলাই করিয়া দিতে হয়। থলে ব্যবহার করিবার সময় কেরাসিন তেলে ভিজাইয়া লইলে ভাল হয়। থলের ভিতর যেমন ধরা পড়ে অনেক পোকা কেরাসিন থাকাতে সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়। থলে বা হাত-জালে পোকা ধরিয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া কিম্বা মাটিতে পুঁতিয়া মারা যায়। ফড়িং ইত্যাদিকে থলের ভিতরেই পাক দিয়া বা মোঁচড় দিয়া মারা সহজ। কাপড় সেলাই করিয়া চিত্রের মত থলে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।
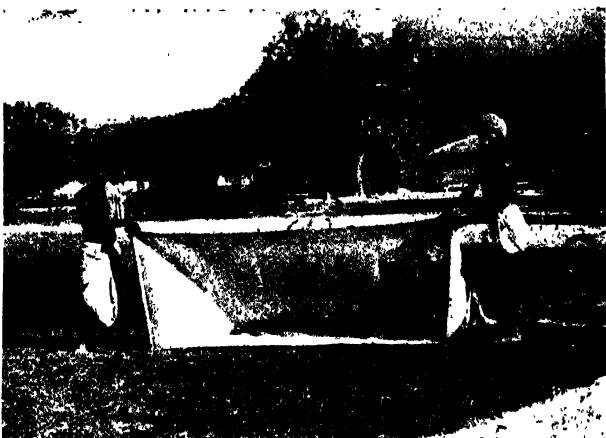
২৫ চিত্র—পোকা ধরা থলে।

অনেক পোকা রাত্রিতে খায় এবং দিনের বেলা এখানে ওখানে লুকাইয়া থাকে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে কতকগুলি করিয়া পাতা বা ঘাস রাখিয়া দিলে এই সব পোকা পাতা ও ঘাসের ভিতর আসিয়া লুকায়। মাঝে মাঝে উল্টাইয়া পোকাদিগকে কেরাসিন তেল মিশ্রিত জলে বা গরম জলে ফেলিয়া মারিতে হয়।

অনেক পতঙ্গ আলো দেখিলে আলোর কাছে উড়িয়া আসে। আলোক ফাঁদে ইহাদিগকে মারা সহজ। আলোক ফাঁদ আর কিছুই নয়, একটা সাধারণ লণ্ঠন। ক্ষেতর মাঝে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া রাখিতে হয় এবং লণ্ঠনের নীচে একটা বড় গামলায় কতকটা জল রাখিতে হয়। জলে একটু কেরাসিন তেল ঢালিয়া দিতে হয়। লণ্ঠনটা এ রকম ভাবে রাখিতে হয় যেমন জলে আলো পড়িয়া চক্‌চক্‌ করে। দুইধারে দুইটা টিনের পাত

ঝাঁকাইয়া রাখিলেও হয়। পোকারা উড়িয়া আসিয়া জলে পড়িবে এবং মরিবে। আলোক ফাঁদের পরিবর্ত্তে ক্ষেতের মাঝে মাঝে আগুন জ্বালাইলেও প্রায় সমানই কাজ হয়।

সুবিধামত ধোঁয়া দিতে পারিলে অনেক উপকার হয়। ধোঁয়াতে একটু গন্ধ হইলে ভাল হয়; ধুনা মিশাইয়া দেওয়া চলে। অনেক গাছের ও পাতার ধোঁয়াতে প্রায়ই এক রকম গন্ধ থাকে। ধোঁয়া লাগিলে পোকা আসে না এবং থাকিলেও উড়িয়া পালায়।

ক্ষেতের উপরের মাটি নিড়াইয়া দেওয়া ও উল্‌টাইয়া দেওয়া ভাল। অনেক সময় অনেক পোকা ও পোকার পুত্তলি ইহাতে বাহির হইয়া পড়ে। তখন পোকাদিগকে বাছিয়া লইতে পারা যায় এবং পাখী ইত্যাদিতেও অনেক খাইয়া নাশ করে।

বিলাতে ও আমেরিকায় ফসলে পোকা লাগিলে বিষ ছিটাইয়া পোকা মারে। বিষ দুই রকমের হয়, (১) যে সব পোকা পাতা কাটিয়া খায়, তাহাদের জন্য পাতার উপর এমন কোন বিষ ছিটাইয়া দিতে হয়, যাহা পাতার সঙ্গে ইহাদের পেটে যাইয়া ইহাদিকে নাশ করে। (২) শোষক পোকারা পাতা কাটিয়া খায় না, কেবল শুঁড় দ্বারা রস চুসিয়া খায়; তাহাদের জন্য গাছের রসে বিষ মিশান সম্ভব হয় না। ইহাদের গায়ে এমন বিষ ছিটাইয়া দিতে হয় যাহাতে ইহারা মরিয়া যায়। প্রথমকে পেটের বিষ এবং দ্বিতীয়কে গায়ের বিষ বলা যায়।

যে বিষই হউক, হাতে করিয়া জল তড়্‌তড়ার মত ছড়াইলে কোন কাজ হয় না। পেটের বিষ পাতার সব জায়গায় সমান ভাবে পড়া আবশ্যক। কারণ পোকা পাতার কোন খান্‌টা খাইবে বলা যায় না। আর গায়ের বিষ এরূপে ছিটান উচিত যাহাতে সব পোকার সমস্ত দেহ বেশ ভিজিয়া যায়। শুধু হাতে এরূপে বিষ ছিটান সম্ভব হয় না। বিষ শুষ্ক ও গুঁড়া হইলে কাপড়ের থলির ভিতর রাখিয়া পাতার উপর থলিটা নাড়িয়া নাড়িয়া বা ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া ছিটান চলে। বিষ যদি জলে মিশান হয়, তাহা হইলে এমন পিচ্‌কারী আবশ্যক যাহা দ্বারা বিষমিশ্রিত জল অনেকটা জায়গার উপর গুঁড়ি গুঁড়ি ভাবে পড়ে। এই-রূপে বিষ ছিটাইবার আজ কাল অনেক রকম ঝারি পিচ্‌কারী ও দমকল হইয়াছে। সাধারণ কৃষকের পক্ষে মাঠের ফসলে বিষ ছিটাইয়া পোকা নাশ করা সম্ভব হইবে না। বিষ ও বিষ ছিটাইবার যন্ত্র কিনিতে পয়সা খরচ হয়।

২৬ চিত্র—টিনের ঝারি পিচ্‌কারী।

২৭ চিত্র—টিনের ঝারি পিচ্‌কারী।

যাহারা সব্‌জী বাগান করে এবং সব্‌জী বাগানে কপি বেগুণ ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া রোজ রোজ সহরে বা হাটে বাজারে বিক্রয় করে, তাহারা কম মূল্যের ঝারি পিচ্‌কারী

দ্বারা সাধারণ দুই একটা বিষ ব্যবহার করিয়া লাভবান্ হইতে পারে। কোন রকমে গাছ বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই তাহাদের লাভ, রোজ বিক্রয়ের দ্বারা পয়সা আসিবে। ২৬ ও ২৭ চিত্রে কমদামী টিনের ঝারি পিচ্‌কারী দেখান হইয়াছে। যে কোন টিনের কারিগর সহজেই ইহা প্রস্তুত করিতে পারে। তবে ইহাতে জল কম ধরে এবং ইহা সব্‌জী বাগানেরই উপযোগী।

আর এক অল্পমূল্যের দমকল ঝারি পিচ্‌কারী ২৮ চিত্রে দেখান হইয়াছে। একটা কেরাসিনের টিনে বিষ গুলিয়া যেথানে ইচ্ছা এই টিন হইতে বিষ ছিটান চলে। ইহার দাম ১৬৲ টাকা। সাবধানে ব্যবহার করিলে ইহা অনেক দিন চলে। মধ্যে মধ্যে রবারের নল বদল করিয়া লইতে হয়। রবারের নলের দাম ।০ ; ইহার নাম "বাকেট স্প্রেয়ার।"

২৮ চিত্র—বাকেট স্প্রেয়ার।

২৯ চিত্র—স্থাপস্থাক স্প্রেয়ার।

২৯ চিত্রে যে দমকল দেখান হইয়াছে ইহার দ্বারা দুইটা লোকে একদিনে ৫।৬ বিঘা জমির উপর বিষ ছিটাইতে পারে। একটু যত্ন করিয়া রাখিলে ইহা অনেক দিন চলে। মধ্যে মধ্যে রবরের নল বদল করিয়া দিতে হয়। ইহার দাম ৪৬৲ টাকা। ইহাতে একটা কেরাসিনের টিনের সমান জল ধরে। ইহাতে এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে, একজন লোকেই পীঠে করিয়া এক হাতে কল চালাইতে পারে এবং অপর হাতে নলের মুখ ধরিয়া যেথানে আবশ্যক বিষ ছিটাইতে পারে। ইহার নাম "স্থাপস্থাক স্প্রেয়ার।"

নিম্নে পোকা মরিবার কয়েকটী সাধারণ বিষের কথা বলা হইতেছে।

সেঁকোবিষ। ইহাই উত্তম পেটের বিষ, খুব কম পরিমাণ খাইলেই পোকা মরে। গাছের উপর যে পরিমাণ জল মিশাইয়া ছিটান যায় তাহাতে এক এক জায়গায় খুব কম পরিমাণ বিষ থাকে। বিষ ছিটান পাতা গরু বাছুরে একটু থাইলেও কিছু ক্ষতি হয় না। তবে সাবধান হওয়া উচিত, গরু বাছুর বা মানুষে যেন সে পাতা কোন রকমে না খায়। লেড্ আর্সিনিয়েট নামক যে সেঁকো বিষ বাজারে পাওয়া যায় তাহাই উত্তম। ইহাতে সেঁকো ছাড়া আরও অন্য জিনিস মিশান আছে। লেড্ আর্সিনিয়েট দুই রকম পাওয়া যায় ; এক রকম গুঁড়া যাহাকে লেড্ আর্সিনিয়েট পাউডার বলে। আর এক রকম জল মিশান যাহাকে লেড্ আর্সিনিয়েট পেষ্ট বলে। জল মিশান অপেক্ষা শুষ্ক গুঁড়ারই তেজ বেশী। দুইই জলে মিশাইয়া সেই জল

ছিটাইতে হয়। চুণ ও গুড়ের সঙ্গে মিশাইলে ইহার তেজ আরও বেশী হয়। নিম্নে সাধারণ ও খুব তেজী জল, কি পরিমাণ বিষ মিশাইলে হয় তাহা বলা হইতেছে।

সাধারণ।	তেজী।
লেড্ আর্সিনিয়েট—	লেড্ আর্সিনিয়েট—
পেষ্ট হইলে—এক ছটাকের তিন ভাগের ১ ভাগ	পেষ্ট হইলে—পৌণে ছটাক
শুষ্ক গুঁড়া হইলে—সিকি ছটাক	শুষ্ক গুঁড়া হইলে অৰ্দ্ধ ছটাক
চুণ—১ ছটাক	চুণ—১ ছটাক
গুড়—২ ছটাক	গুড়—২ ছটাক

এই পরিমাণ বিষ, চুণ ও গুড়ে কেরাসিনের টিনের একটিন জল প্রস্তুত হয়। একটা কেরাসিনের টিনে আন্দাজ ২০ সের জল ধরে।

লেড্ আর্সিনিয়েট না পাইলে বাজারে কিম্বা দোকানে যে সাধারণ সেঁকো পাওয়া যায় তাহা দ্বারাও নিম্ন লিখিত উপায়ে বিষের জল প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ১ ছটাক সেঁকো এবং ৪ ছটাক সোডা মিশাইয়া আন্দাজ ২¼ সের জলে যতক্ষণ না গলিয়া যায় ততক্ষণ ফুটাইতে হয়। এই জল ১০ ছটাক লইয়া দুই ছটাক চুণের সহিত ১ টিন জলে মিশাইলে সাধারণ সেঁকো বিষের জল হইল।

শুষ্ক গুঁড়া লেড্ আর্সিনিয়েট পাউডার ১ ছটাক লইয়া ২০ ছটাক ময়দা বা শুষ্ক গুঁড়া চুণ বা মিহী ধূলার সহিত মিশাইয়া কাপড়ের থলিতে করিয়া ধূলার মত পাতার উপর ছিটান চলে।

কেরাসিন মিশ্রণ। আমরা সচরাচর যে কেরাসিন তেল জ্বালাই ইহা অতি উত্তম পোকার গায়ের বিষ। এই পুস্তকের অনেক জায়গায় কেরাসিন মিশ্রিত জলের কথা বলা হইয়াছে। কেরাসিন তেল জলের সঙ্গে মিশে না; জলে ঢালিয়া দিলে উপরে ভাসে। কতকটা জলে এমন পরিমাণ কেরাসিন তেল ঢালিয়া দিতে হয় যাহাতে জলের উপর এক পর্দ্দা তেল ভাসে; সামান্য তেল দিলেই হয়। এই রকম জলকেই কেরাসিন মিশ্রিত জল বলা হইয়াছে।

কেরাসিন তেলে পোকার দেহ ভিজাইয়া দিতে পারিলে পোকা মরিয়া যায়। কিন্তু গাছের ডালে বা পাতায় যেখানে কেরাসিন তেল লাগিবে সে স্থান জ্বলিয়া যাইবে। সেই জন্য কেরাসিন তেল গাছে ছিটান চলে না। জলের সঙ্গেও ইহা মিশে না। যদি কেরাসিন মিশ্রণ করিয়া সেই মিশ্রণ জলে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পোকাও মরে এবং গাছেরও ক্ষতি হয় না। কেরাসিন মিশ্রণ জলের সঙ্গে বেশ মিশে।

১ ছটাক বার সোপ বা বার সাবান কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ১ সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ কর। সাবানটা গলিয়া যাইলেই আগুন হইতে নামাইয়া লও এবং দুই সের আন্দাজ কেরাসিন তেল লইয়া একটু একটু করিয়া এই জলে ঢালিতে থাক এবং খুব নাড়িতে থাক। এই জলে সব তেলটা মিশাইয়া দাও। ইহাই কেরাসিন মিশ্রণ। আবশ্যক মত ৬ গুণ হইতে ১০ গুণ জলে মিশাইয়া ছিটান চলে। জাবপোকা, ছাতরা প্রভৃতি নরম দেহবিশিষ্ট শোষক পোকাদিগকে মারিতে ইহা বেশ ব্যবহার করা যায়। অনেক প্রজাপতির কীড়ার গায়ে লাগিলে তাহারাও মরিয়া যায়। উই, উইচিংড়ি, মাঠফড়িং, পাতা খাওয়া কঠিন পক্ষ পোকা বা মাটি পোকা প্রভৃতি তাড়াইবার জন্যও ইহা ব্যবহার করা যায়।

ক্রুড্ অয়েল ইমলসন। ইহাও উত্তম গায়ের বিষ। উই প্রভৃতি তাড়াইবার জন্যও ইহা ব্যবহার করা যায়। এক টিন জলে ৫ ছটাক আন্দাজ গুলিয়া লইলে সাধারণ জল প্রস্তুত হইল। খুব তেজী

জল আবশ্যক হইলে ১০ ছটাক পর্য্যন্ত এক টিন জলে গুলিয়া লইতে হয়। জাব, ছাতরা প্রভৃতি নরম দেহ বিশিষ্ট পোকার গায়ে ছিটাইয়া দিলে তাহারা মরিয়া যায়।

স্যানিটারি ফ্লুইড্। স্যানিটারী ফ্লুইড্ বলিয়া যে সমস্ত ঔষধ বিক্রয় হয়, তাহারাও বেশ গায়ের বিষ। তিন ছটাক আন্দাজ এক টিন জলে গুলিয়া দিলে সাধারণ জল প্রস্তুত হইল। তেজী জল আবশ্যক হইলে ৫ ছটাক পর্য্যন্ত গুলিয়া দেওয়া যায়।

তবে কোন বিষই খুব তেজী ব্যবহার করা ভাল নয়। কারণ পাতার উপর পড়িলে পাতা শুকাইয়া যায়। নরম পত্র বিশিষ্ট গাছের জন্য এক টিন জলে ক্রুড্ অয়েল ৩ ছটাক এবং স্যানিটারি ফ্লুইড্ ২ ছটাক লইবে।

তামাকের জল। তামাকের জল ছোট ছোট পাতা খাওয়া পোকার পক্ষে পেটের বিষের কাজ করে এবং জাব পোকা ছাতরা প্রভৃতি নরম দেহ বিশিষ্ট পোকার পক্ষে গায়ের বিষের কাজ করে। নিম্নলিখিত উপায়ে তামাকের জল প্রস্তুত করিতে হয়।

অর্দ্ধ সের তামাক ৫ সের আন্দাজ জলে একদিন এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখ বা অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য সিদ্ধ করিয়া লও; দুই ছটাক বার সোপ বা বার সাবান এই জলে গুলিয়া লও; তাহা হইলেই তামাকের জল প্রস্তুত হইল। এই তামাকের জল সাত গুণ জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা চলে।

———)*(———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধানের পোকা।

গান্ধি বা ভোমা।

গান্ধি বা ভোমা—(৩য় চিত্রপটের ৮ চিত্র) বাঁকুড়া জেলায় ইহাকে "ভোমা" হাজারিবাগ অঞ্চলে "গান্ধি মক্ষি" এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার স্থান বিশেষে "গান্ধি" বা "মেওয়া" বলে। ইহার শরীর হইতে "পেদো পোকার" গন্ধের ন্যায় এক রকম গন্ধ বাহির হয় বলিয়াই ইহার নাম "গান্ধি"।

ধান ফুলিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্ষেতে দেখা দেয় এবং ধান পাকার সময় পর্য্যন্ত থাকে। চাষী মাত্রেই জানে ইহা ধানের কি ক্ষতি করে। ধানের ভিতরে ইহার সরু শুঁড় ঢুকাইয়া দিয়া দুধটী চুষিয়া খাইয়া ফেলে। কাজেই চাল না বাঁধিয়া ধান ভুয়া হইয়া যায়। চাষীকে আগড়া মাত্র লইয়া ঘর ঢুকিতে হয়। যে শীষ গান্ধি চুষিয়াছে তাহা শুকান শুকান দেখায়।

ডিম (৩য় চিত্রপটের ১৬ চিত্র)—এক একটী স্ত্রী গান্ধি ৩০ টী পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ধানের পাতার উপর কাল কাল ধঞ্চে বীজের মত ডিম ২টা হইতে ১৮।১৯ টা এক জায়গায় সারি দিয়া পাড়ে। চিত্র দেখিলেই বোঝা যাইবে। একবার চিনিলে ক্ষেতের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে গান্ধির ডিম বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পাড়িবার পর ৬ হইতে ৮ দিন পরে ডিম ফোটে। ছানা গুলি ডিম হইতে বাহির হইয়াই খাইতে আরম্ভ করে। ৩য় চিত্রপটের ৯ ও ১০ চিত্র দেখ। ছোট বেলায় ইহাদের ডানা থাকে না এবং তখন উড়িতেও পারে না। ক্রমে ক্রমে ডানা গজায় এবং ডিম হইতে বাহির হইবার প্রায় ২০ দিনের মধ্যে ডানা সম্পূর্ণ বড় হয়। তখন অনায়াসে ইহারা এক ক্ষেত হইতে অপর ক্ষেতে উড়িয়া যায়। উড়িতে পারিবার ৩।৪ দিন পরে ডিম পাড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে প্রায় এক এক মাস পরে পরে গান্ধির বংশ বাড়ে।

ধান যখন থাকে না তখন গান্ধি বন জঙ্গলের গাছ হইতে আহার যোগাড় করে। আবার ধান হইলেই দেখা দেয়। চীনা, কোদো, কৌনী এবং শ্যামা বা ভুরা প্রভৃতির শীষ হইতেও গান্ধি রস খায়। প্রায় আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ ধান পাকিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচুর খাবার থাকে। এই সময়েই গান্ধি ডিম পাড়ে এবং ইহার বংশ বৃদ্ধি হয়। ধান পাকিবার পর শীত কালে ও গ্রীষ্ম কালে খাবার যথেষ্ট থাকে না। তখন ইহার বংশ বৃদ্ধি হয় না। কোন রকমে শীত ও গ্রীষ্মটা কাটাইয়া আবার খাবার হইলে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে।

এক একটী শীষের উপর ছোট বড় ১০।১৫টা গান্ধি বসিয়া খাইতে থাকে। গান্ধিরা ধানী রঙের অর্থাৎ ধান গাছের ন্যায় সবুজ। সেই জন্য শীষের উপর বসিয়া থাকিলে সহজে চেনা যায় না। গাছটা নাড়া দিলে ছোটগুলা শীষ হইতে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া পড়িয়া যায় এবং কিছুক্ষন পরে আবার উঠে। আর বড়গুলা উড়িয়া যাইয়া অপর গাছে বসে।

গান্ধি ধানের রস বা দুধ চুষিয়া খায়। অতএব গাছের উপর বিষ ছড়াইলে সে বিষ কখনও গান্ধির পেটে যাইবে না।

অনেক জায়গায় কৃষকেরা গান্ধি তাড়াইবার জন্য ক্ষেতের এক ধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত লম্বা মোটা দড়িতে কড়া গন্ধ ওয়ালা মাছের তেল কিম্বা কেরোসিন তেল মাখাইয়া সেই দড়ি ধানের শীষের উপর টানিয়া

লইয়া যায়। কোথাও কোথাও ধোঁয়া দিয়া গান্ধি তাড়ান হয়। যেদিক হইতে বাতাস বহিতেছে ক্ষেতের সেই দিকে ধুনার বা কোন গন্ধওয়ালা গাছের ধোঁয়া দেয়। কতকটা অন্তর অন্তর আগুণ জ্বালিয়া আগুনের উপর কাঁচা পাতা দেয়। তাহা হইলে ধোঁয়া হয় এবং বাতাসে ধোঁয়াটা ক্ষেতের মধ্যে যায়। ধোঁয়া যাহাতে ভাল করিয়া লাগে সেই জন্য অল্প সেঁতসেঁতে খড়ের বুঁদি বা মশাল জ্বালিয়া ক্ষেতের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সময় যদি ধানের উপর একটা দড়ি টানিয়া গাছ গুলাকে নাড়িয়া দেওয়া যায় তবে অনেক উপকার হয়। কিন্তু এই উপায়ে গান্ধি তাড়াইয়া প্রায় বিশেষ কোন ফল হয় না। তাহারা এক ক্ষেত ছাড়িয়া অপর ক্ষেতে যায় আবার সেই ক্ষেতে ফিরিয়াও আসে। আরও ছানাগুলা উড়িতে পারে না, ক্ষেতেই থাকে। আসাম অঞ্চলে কৃষকেরা কুলার দুই পীঠে কাঁটালের আটা মাখাইয়া কুলাটাকে একটা বাঁশের ডগে বাঁধে এবং সেই কুলাটাকে ধানের শীষের উপর বুলাইয়া লইয়া যায়। ইহাতে অনেক গান্ধি আটায় লাগিয়া যায়। তার পর কুলাটাকে আগুণের উপর ধরিয়া গান্ধিগুলাকে মারিয়া ফেলে। বাঁকুড়া জেলার এক আশী বৎসরের বৃদ্ধ কৃষক বলিয়াছিল যে তাহার বাপ পিতামহের আমলে ভোমা মারিবার নিম্নলিখিত উপায় করা হইত। কোন একটা দিন স্থির করিয়া সেইদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গ্রামের যত চাষী পরিবারের ছেলে বুড় সকলেই এক একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আপন আপন ক্ষেতে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাতে গান্ধিরা উড়িয়া আসিয়া জ্বলন্ত মশালে পুড়িয়া মরিত। অনেক ডানাওয়ালা গান্ধি ইহাতে মরিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ছানাগুলা যেমন তেমনই থাকিয়া যাইত এবং পরে বড় হইলে আবার বংশ বৃদ্ধি করিত। এইরূপ এক জোটে যদি সকলে আপন আপন ফসলের যত্ন করে তাহা হইলে পোকার উপদ্রব যে অনেক কমিয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

গান্ধি মারিবার জন্য পোকা ধরা থলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। কেরাসিন তেল মিশ্রিত জলে হাল্কা থলেকে ডুবাইয়া ও নিংড়াইয়া দ্রুতগতি ধানের উপর টানিয়া লইয়া যাইলে ছোট বড় সকল গান্ধিই ধরা পড়ে। পাতলা কাপড়ের হাল্কা থলেতে ধানের কোন ক্ষতি করে না। ৩য় চিত্রপটের ১১ চিত্রে যে ছয়টী ফোঁটাবিশিষ্ঠ চকচকে কাল নীল রঙের পোকা দেখান হইয়াছে ইহা গান্ধির পরম শত্রু। সারাদিন গান্ধি ধরিয়া ধরিয়া খায়। ভুল করিয়া ইহাকে কোনক্রমেই মারা উচিত নয়। ইহার নাম ধম্‌সা পোকা।

ধান ফুলিবার সময় কেবল ডানাওয়ালা গান্ধিই ক্ষেতে প্রথম আসে; আসিয়া পাতার উপর ডিম পাড়ে। চাষী যদি আপন পরিবারের ছোট ছেলে মেয়েদিগকে একবার ডিম চিনাইয়া দেয় তবে তাহারা সহজেই ডিম সমেত পাতা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া জড় করিতে পারে। পরে সেইগুলা মাটিতে পুঁতিয়া কিম্বা পুড়াইয়া নষ্ট করিতে হয়। ৫।৬ দিন অন্তর একবার করিয়া ডিম জড় করিলেই আর গান্ধির দল বাড়িতে পায় না। গ্রামের সকল চাষী মিলিয়া যদি এক জোটে কাজ করে তবে গান্ধি একেবারেই ধানের কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

মরিচ পোকা।

মরিচ পোকা (২য় চিত্রপটের ১৪ চিত্র) কাল রঙের। ইহার গায়ে কাঁঠালের যেমন কাঁটা তেমনি খাড়া খাড়া কাঁটা আছে। অনেকটা ছোট কাল গোল মরিচের মত দেখায় বলিয়া ইহাকে মরিচ পোকা বলে। ২৪ পরগণা, হুগলী, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় ইহাকে "পামরী" "পারুলী" বা "সানুকী" পোকা বলে। ধানের পাতা খাইয়া সাদা করিয়া দেয় বলিয়া ইহার নাম "সানুকী"। অন্য অন্য জায়গায় ইহার আরও ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কাহাকে মরিচ পোকা বলা যাইতেছে চিত্র দেখিয়া বোঝা যাইবে।

মরিচ পোকা পুর্ব্ববাঙ্গালা ও আসাম অঞ্চলেই বেশী হয়। বীজ ধান জন্মিলেই ইহা দেখা দিতে পারে। বীজতলাতে ও বীজ ধান মাঠে রুইবার পরেই ধানের বিশেষ ক্ষতি করে। ধানের পাতা একবার পাকিলে অর্থাৎ শক্ত হইলে আর তত অনিষ্ট করিতে পারে না। যতদিন ছোট থাকে ও পাতা নরম থাকে ততদিন গাছগুলিকে

সাবধানে মরিচ পোকা হইতে রক্ষা করিতে পারিলে ইহা দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা খুব কম থাকে। যখন ধান থাকে না তখন মরিচ পোকা বন জঙ্গলের ধান বা ঘাস জাতীয় গাছের পাতা খাইয়া জীবন যাপন করে। ধান হইলে ধানে আসিয়া লাগে। মরিচ পোকা চতুর্জন্ম। ইহার চারি অবস্থার আচরণ পরে পরে নিম্নে দেওয়া হইল।

ডিম—ধান জন্মিলে মরিচ পোকা ধানের ক্ষেতে আসিয়া পাতার মধ্যে ডিম পাড়ে। প্রায়ই পাতার গোড়ার কতকটা ছাড়িয়া ডগের দিকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়। ডিম খুব ছোট এবং কাল রঙের। পাতার এক পীঠের পর্দ্দায় একটী ছোট ছিদ্র করিয়া পাতার মধ্যে ডিমটাকে ঢুকাইয়া দেয়। এক জায়গায় একটী করিয়া ডিম পাড়ে এবং পাতার সেই জায়গাটা সাদা হইয়া যায় ও একটা সাদা ফোঁটার মত দেখায়। (২য় চিত্রপটের ১৫ চিত্র দেখ)

কীড়া—প্রায় ৫ দিন পরে ডিম ফোটে। কীড়া অবস্থায় মরিচ পোকা চ্যাপ্টা ও হলুদ রঙের হয়। মাথাটাও চ্যাপ্টা এবং কাল রঙের থাকে এবং ছয়টী পা থাকে (২য় চিত্রপটের ১৬ চিত্র দেখ)। কীড়া পাতার দুই পীঠের পর্দ্দা ঠিক রাখিয়া এই দুই পর্দ্দার মধ্যে যা কিছু থাকে খায় এবং নিজেও এই দুই পর্দ্দার ভিতর থাকে, কখনও বাহিরে আসে না। কেবল দুইটী পাত্‌লা সাদা পর্দ্দা বাদ দিয়া খায় বলিয়া পাতার যে জায়গাটা খায় সেই জায়গাটা সাদা দেখায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্থানে ডিম পাড়ে সেই স্থানটা সাদা ফোঁটার মত দেখায়। ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া খাইতে খাইতে হয় পাতার ডগের দিকে কিম্বা গোড়ার দিকে যায়। এই সময় মনে হয় এই ফোঁটা হইতে একটী সাদা সূতা বাহির হইয়াছে। ক্রমে কীড়া যখন বড় হয় তখন বেশী খায় ও অনেকটা জায়গা জুড়িয়া খায় এবং এই সমস্ত জায়গাটাই সাদা হইয়া যায় (২য় চিত্রপটের ১৭ চিত্র)। আলোর দিকে ধরিলে দুই পর্দ্দার ভিতর কীড়াকে দেখিতে পাওয়া যায় কিম্বা হাত বুলাইলেও উঁচু উঁচু ঠেকে। কীড়া প্রায় ৮ দিন খাইয়া ¼ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। কীড়া যতটা নীচে খায় সেখান হইতে ডগের দিকে পাতাটা সমস্ত শুকাইয়া যায়।

পুত্তলি—পুত্তলিও চ্যাপ্টা এবং লাল্‌চে রঙের হয় এবং ইহার পা, শুঙ্গ প্রভৃতি বেশ দেখা যায়। পুত্তলিও কীড়ার মত পাতার দুই পর্দ্দার ভিতর থাকে।

পতঙ্গ—প্রায় ৪ দিন পুত্তলি অবস্থায় থাকিয়া কাল মরিচ পোকা পাতার ভিতর হইতে বাহির হয়। মরিচ পোকাই পতঙ্গ অবস্থা। এই অবস্থায় ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং ডিম পাড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে প্রায় ১৮ দিন অন্তর অন্তর মরিচ পোকার বংশ বৃদ্ধি হয়। মরিচ পোকা পাতার পর্দ্দা বা ছাল খাইয়া পাতার উপর সরু সরু লম্বা দাগ করিয়া দেয় (চিত্র দেখ)। দুই একটা এমন দাগ হইলে পাতার কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু অনেক পোকা খাইয়া সমস্ত পাতাতে এই রকম দাগ করিয়া দিলে পাতা শুকাইয়া যায়। প্রায়ই মরিচ পোকা এত বেশী আসে যে, যে-ক্ষেতে বসে সেই ক্ষেত কাল দেখায়, অতএব ডিম না পাড়িলেও ইহারাই ঐরূপে খাইয়া সমস্ত ধান শুকাইয়া দিতে পারে।

মরিচ পোকার কীড়া, পুত্তলি এবং ডিম পাতার ভিতরে লুকান থাকে। অতএব এই প্রথম তিন অবস্থায় পাতার উপর বিষ ছড়াইলে উহার কিছুই হয় না। চতুর্থ অবস্থায় মরিচ পোকা যখন খায় তখন ঐরূপ বিষ ছড়াইলে কিছু উপকার হয়; কারণ পাতার ছালের সঙ্গে বিষ খাইয়া অনেকে মরিয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টি হইলেই বিষ ধোয়া যায়, আর কোনই ফল হয় না।

প্রায়ই দেখা যায় যে জমিতে জল আছে আগে সেই জমিতেই মরিচ পোকা লাগে। সেই জন্য ধানে মরিচ পোকা লাগিলে কৃষকেরা যেখানে পারে জমির জল বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু যদি পাতায় একবার ডিম পাড়ে তবে জমিতে জল থাক বা না থাক ডিম ফুটিয়া কীড়া হয় এবং কীড়া খাইয়া পরে মরিচ পোকা হয়।

গান্ধি তাড়াইবার জন্য কৃষকেরা যেমন ধোঁয়া দেয় সেই রকম ধোঁয়া দিলেও মরিচ পোকা পালায়।

তাড়াইয়া দেওয়া বা বিষ ছড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা পোকা ধরা থলে, মিহি জাল কিম্বা কাপড় দিয়া মরিচ পোকাগুলাকে ছাঁকিয়া লইয়া মারাই ভাল।

মরিচ পোকা দেখা দিলেই তাহাদিগকে তাড়াইয়াই হউক আর মারিয়াই হউক এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে কোন রকমে ডিম না পাড়িতে পারে। যদি দেখা যায় পাতায় অনেক ডিম পাড়িয়াছে এবং অনেক কীড়া হইয়াছে তাহা হইলে কীড়া সমেত পাতার ডগা কাটিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। এরূপ না করিলে আবার অনেক মরিচ পোকা হইবে এবং আবার ডিম পাড়িবে। ছোট বেলায় পাতার ডগ কাটিয়া দিলে ধানের প্রায় কোন ক্ষতি হয় না আবার সতেজে পাতা গজায়।

ধান যখন থাকে না তখন কোথায় মরিচ পোকা আছে জানিতে পারিলে তাহাদিগকে সেইখানে ধ্বংস করা উচিত।

ইহাও দেখা যায় যে সব ধানে মরিচ পোকা লাগে না। কতক রকম নরম পাতাওয়ালা ধানেরই ক্ষতি করে। মরিচ পোকার উপদ্রব বেশী হইলে যে ধান মরিচ পোকা খায় না এমন ধানের চাষ করা উচিত।

মাজরা।

ধানগাছের ভিতর ঢুকিয়া মাজটী চিবাইয়া শুকাইয়া দেয় বলিয়া ইহাকে মাজরা বলে। স্থান বিশেষে ইহাকে টৌটা ও ধসা বলিয়া থাকে। গর্ভশীষটী শুকাইয়া যায় বলিয়া গয়া জেলায় ইহাকে চলিত ভাষায় "গবশুকু" (গর্ভশুকু) বলে। ধান ফুলার পরই প্রায় ইহা দেখা দেয়, আগেও দেখা দিতে পারে। যে ক্ষেতে মাজরা লাগিয়াছে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই মাজরা দ্বারা আক্রান্ত সমস্ত গাছগুলিই চিনিতে পারা যায়। পাতাগুলি প্রায় সবুজ থাকে এবং শীষটী বা মাজপাতাটী শুকাইয়া সাদা হইয়া যায় (৩য় চিত্রপটে বামধারের গাছ দেখ)। এইরূপ একটী গাছ ফাড়িয়া দেখিলে ইহার মধ্যে এক বা ততোধিক সূতলী পোকা দেখা যায়। তিন বিভিন্ন প্রকারের পোকাতে ধানের এইরূপ ক্ষতি করে।

(১) প্রথম মাজরা ৩য় চিত্রপটে ১ চিত্রে দেখান হইয়াছে। ইহার রঙ সাদা, তাহার উপর একটু নীল ও হলুদের আভা আছে। ৩য় চিত্রপটের ৩ চিত্র ইহার প্রজাপতি। স্ত্রী প্রজাপতি রাত্রিতে পাতার উপর কিরূপে ডিম পাড়ে ঐ চিত্রপটের ৪ চিত্রে দেখান হইয়াছে। এক জায়গায় অনেকগুলি ডিম গাদা করিয়া পাড়ে এবং ডিমের গাদাটী কটা রঙের লোমে ঢাকিয়া দেয়। এক একটী ডিম গোল পোস্তদানার মত। সাধারণতঃ ৬।৭ দিন পরে ডিম ফোটে এবং ছোট কীড়ারা গাছের উপরেই এখানে ওখানে বেড়াইয়া এবং একটু আধটু পাতার বা গাছের ছাল খাইয়া সিঁদ কাটিয়া গাছের ভিতর প্রবেশ করে। কেহ শীষের নীচে কণ্ঠদেশে কেহ বা আরও নীচে সিঁদ কাটে। এখন হইতে গাছের ভিতরেই থাকে। প্রায় একমাস কাল এইরূপে খাইয়া সম্পূর্ণ বড় হয়। তখন প্রায় ¾ ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহার পর গাছের মধ্যেই পুত্তলি হয়। ৩য় চিত্রপটের ২ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে। ৬।৭ দিন এই অবস্থায় থাকিয়া প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। বাহির হইয়া স্ত্রী ও পুং প্রজাপতি সঙ্গম করে এবং ৩।৪ দিনের মধ্যেই আবার ডিম পাড়ে। এই পোকা ধান ছাড়া অন্য কোন ফসল কিম্বা অন্য কোন গাছ আক্রমণ করে কিনা এখনও জানা যায় নাই। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস-পর্য্যন্ত ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে। শীতকালে গাছের মধ্যে কিম্বা ধান কাটিয়া লইলে যে ধানের গোড়া মাঠে থাকিয়া যায় তাহার মধ্যে ইহারা কীড়া অবস্থায় নিদ্রা যায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় পর্য্যন্ত কীড়া অবস্থাতেই থাকে এবং কোন রকমে গরমটা কাটাইয়া দিয়া আবার ধানের সময় দেখা দেয়।

(২) দ্বিতীয় মাজরা ৯ম চিত্রপটের ৪ চিত্রে দেখান হইয়াছে। ইহার রং লালচে এবং গায়ে সারি সারি ফোঁটা আছে। ইহা ধান ছাড়া, দেবধান্য বা জোয়ার্, মক্কা, বাজরা ও ইক্ষু আক্রমণ করে। ৩য় চিত্রপটের

৩য় চিত্রপট।

ধানের পোকা।

Engraved and Printed
by The Calcutta Phototype Co

৬ চিত্র ইহার প্রজাপতি। ৩য় চিত্রপটের ৫ চিত্রে কি রকমে স্ত্রী প্রজাপতি সারি দিয়া গাদা করিয়া ডিম পাড়ে দেখান হইয়াছে। ইহারও প্রথমের ন্যায় কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বংশ বৃদ্ধি হয়। শীতকালে ধানের ডাঁটা বা গোড়ায় কিম্বা জোয়ার, মক্কা, আক প্রভৃতির ডাঁটার মধ্যে কীড়া অবস্থায় নিদ্রিত থাকে। জোয়ার, মক্কা প্রভৃতির ডাঁটা কাটিয়া জ্বালানির জন্য রাখিলেও তাহার মধ্যে থাকিতে পারে। ফাল্গুণ চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং এই সময় যদি মক্কা হয় তাহা হইলে মক্কা কিম্বা আকের উপর ডিম পাড়ে। আক তখন ছোট। আকে ডিম ফুটিলে কীড়ারা ধানের মত আকের মধ্যে ঢুকিয়া আকেরও মাজটী শুকাইয়া দেয় (৯ম চিত্রপটের বাম ধারের ছোট আকের চিত্র দেখ)। পরে আক বড় হইলে আকের ডাঁটার মধ্যে ছিদ্র করিয়া খাইতে থাকে। তারপর আষাঢ় শ্রাবণে ধান, মক্কা, জোয়ার, প্রভৃতি আক্রমণ করে।

(৩) তৃতীয় মাজরা ৫ম চিত্রপটের ২ চিত্রে দেখান হইয়াছে। ইহার রঙ কাঁচা মাংসের রঙের ন্যায়। ৫ম চিত্রপটের ৩ চিত্রে ইহার পুত্তলি এবং ১ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে। স্ত্রী প্রজাপতি রাত্রিতে পাতার খোলের ভিতর ডিম পাড়ে। ইহার কীড়া সাধারণতঃ ধানগাছের গোড়ায় ছিদ্র করিয়া ডাঁটার মধ্যে প্রবেশ করে এবং খোড়টী চিবাইয়া খায়। খাইয়া ১½ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং ডাঁটার মধ্যে পুত্তলি হয়। তারপর প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়া আবার ডিম পাড়ে। প্রথম ও দ্বিতীয়ের ন্যায় ইহারও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বংশবৃদ্ধি হয়। তারপর একই ভাবে শীতকালে নিদ্রা যায়। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয়ের মত চৈত্র কিম্বা বৈশাখ পর্য্যন্ত নিদ্রা যায় না। মাঘ ফাল্গুন মাসে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং গম ও যব আক্রমণ করে। ধানের মত যব গমেরও মাজ শুকাইয়া দেয় (৫ম চিত্রপটে ডানধারে গমের চিত্র দেখ)। গম ও যব কাটিয়া লইলে আক আক্রমণ করে। দ্বিতীয়ের ন্যায় ইহাও বাজরা, জোয়ার, মক্কা প্রভৃতি খায়। তা ছাড়া গিনিঘাস প্রভৃতি ধান জাতীয় ঘাসেও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ধান আক্রমণ করে। এই পোকাকে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অনেক সংখ্যায় ধানে দেখিতে পাওয়া যায়।

অতএব মাজরা হইতে নিস্তার পাইতে হইলে বারমাসই ইহাদের উপর নজর রাখিতে হয়। শীতনিদ্রার পর যখন প্রজাপতি বাহির হইয়া ডিম পাড়ে তখন হইতেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব যখন যে ফসলে পাওয়া যায় সেই সময়েই ইহাদের বিনাশের উপায় করা উচিত। তাহা না করিলে পরের ফসলের বিশেষ ক্ষতি করিবে।

ক্ষেতে মাজরা লাগিয়াছে কি না মধ্যে মধ্যে দেখিতে হয় এবং মাজরা দ্বারা আক্রান্ত গাছ দেখিলেই তাহা সমূলে উপড়াইয়া ধ্বংস করিলে সেই সঙ্গে অনেক মাজরা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। এইরূপে সংখ্যায় বাড়িতে না পাইলে খুব কমই ক্ষতি করিতে পারে।

প্রথম প্রকারের মাজরা আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অতএব ধান ফুলিবার সময় ক্ষেতে আগুন জ্বালিলে তাহাতে আসিয়া অনেক প্রজাপতি পুড়িয়া মরিতে পারে এবং ডিম পাড়িতে পারে না। ইহাতেও উপকার হইতে পারে।

ধান কাটিয়া লইলে ধানের গোড়াকে আশ্রয় করিয়া যখন ইহারা শীতকাল কাটায় সেই সময় ইহাদিগকে ধ্বংস করা বিশেষ সুবিধাজনক। ধান কাটিবার পরেই ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া সমস্ত গোড়া একত্র করিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া উচিত। আরও ধানের গোড়া ক্ষেতে থাকিলে তাহা হইতে আবার অনেক গাছ জন্মে ইহাতে পোকাদের বংশ বৃদ্ধির সুবিধা হয়। এইজন্য জোয়ার, আক প্রভৃতির গোড়াও ক্ষেতে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়।

যেখানে বাজরা, জোয়ার, মক্কা জন্মে সেখানে অনেকেই ইহাদের গাছ জ্বালানির জন্য সংগ্রহ

করিয়া রাখে। এই ডাঁটাতে অনেক মাজরা শীতনিদ্রার সময় থাকিয়া যায়। অতএব পৌষ মাসের মধ্যেই সমস্ত পুড়াইয়া দেওয়া উচিত।

মাজরা মাছি।

ধান যখন খুব ছোট থাকে তখন বীজতলাতে থাকিতে থাকিতেই হউক আর মাঠে রুইবার পরেই হউক কখন কখনও দেখা যায় যে মাজপাতাটী শুকাইয়া গিয়াছে। ইহাকেও এক প্রকার মাজরা বলা যাইতে পারে। এই মাজরার কীড়া প্রজাপতির কীড়া নহে। ইহা এক প্রকার ছোট মাছির কীড়া; দেখিতে শসা, কুমড়ার মাছির কীড়ার ন্থায় (১৪শ চিত্রপটের ২ চিত্র) কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট। স্ত্রীমাছি মাজপাতার উপর ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিলে কীড়া মাজপাতার ভিতরে দিয়া যাইয়া থোড় খায়। ৭।৮ দিন এইরূপে থাইয়া থোড়ের মধ্যেই পুত্তলি হয়। পুত্তলিও ফলের মাছির পুত্তলির (১৪ চিত্রপটের ৩ চিত্র) ন্থায় তবে খুব ছোট ও লাল। তার পর ৪।৫ দিন পরে মাছি হইয়া উড়িয়া যায়। মাছি দেখিতে আমাদের ঘরে যে মাছি থাকে প্রায় সেই রকম কিন্তু ইহা অপেক্ষা ছোট। যাহার মাজপাতা শুকাইতেছে এমন একটী গাছ যদি ফাড়িয়া দেখা যায় তবে প্রায়ই ঐ কীড়ার পুত্তলি দেখা যায় কিংবা হয়ত মাছি বাহির হইয়া গিয়াছে কেবল শূন্য পুত্তলি কোষটী রহিয়াছে দেখা যায়। মাজপাতাটী শুকাইবার পূর্ব্বে মাত্র হলদে হইতেছে এমন সময় ফাড়িয়া দেখিলে কীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় এই মাছি একবার মাত্র ধান আক্রমণ করে এবং ধান হইতে মাছি হইয়া বাহির হইবার পর ধান ছাড়িয়া চলিয়া যায় আর ধান আক্রমণ করে না। যে জায়গায় ইহার আক্রমণে "বীচধান" এইরূপ নষ্ট হয় সে স্থানে ধান বুনিবার কিছুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি ধান জন্মাইয়া লইলে খুব সম্ভব এই "জ্যেঠ" ধানে মাছিরা ডিম পাড়িবে। ইহাদের মাজপাতা যদি হলদে হইতে আরম্ভ হয় এবং মাছির কীড়া যদি থোড়ের মধ্যে দেখা যায় তবে সমস্ত 'জ্যেঠ' ধানগুলি সমূলে উঠাইয়া জ্বালাইয়া দিলে আর পরে ধানে এই মাছি না লাগিতে পারে। মাজপাতা হলদে হইতে আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ধান উঠান উচিত নচেৎ মাছি বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আর যেখানে এইরূপে "জ্যেঠ" ধান জন্মাইয়া মাছিকে না মারা হয় সেখানেও ধানে যদি এই মাছি লাগে তবে সেস্থলেও মাজপাতা হলদে হইতে আরম্ভ হইলেই সমস্ত আক্রান্ত ধান উঠাইয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। শত্রুর বংশ বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় বার ধান আক্রমণ করিতেও পারে।

বীজতলা হইতে উঠাইয়া মাঠে রুইবার পর এবং মাঠে লাগিয়া যাইবার পর যদি এই মাছি ধান আক্রমণ করে তবে মাজপাতা শুকাইতে আরম্ভ হইলেই ধানের গাছগুলি সমূলে না উঠাইয়া গোড়া হইতে কাটিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। এই কাটা গাছের গোড়া হইতে নূতন গাছ গজায়।

ধেনো ফড়িঙ।

২য় চিত্রপটের ১ চিত্রে যে ফড়িং ধানের পাতা খাইতেছে ইহা ধানের সময় প্রায়ই দেখা যায়। বেশী হইলে ধানের ডাঁটা পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে এবং নূতন নূতন শীষও খায়। ইহারা গঙ্গা ফড়িঙ ও মাঠ ফড়িঙের জাত। ছোট বেলায় ইহাদের ডানা থাকে না। ঐ চিত্রপটের ২ ও ৩ চিত্র ইহার ছোট অবস্থা। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই প্রায় ৩ চিত্রের ন্থায় অবস্থায় দেখা দেয়। ইহার পর ধান খাইতে খাইতে বড় হয়। যত বড় হয় ক্রমে ক্রমে ডানা গজায়। সম্পূর্ণ ডানা গজাইতে প্রায় দেড় মাস দুই মাস সময় লাগে। তার পর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ধানের ক্ষেতেই ডিম পাড়িয়া মরিয়া যায়। মাটিতে শরীরের সরু পশ্চাদ্ভাগ ঢুকাইয়া দিয়া দেড় ইঞ্চি কিম্বা তাহারও অধিক গর্ত্ত করিয়া এই গর্ত্তে ডিম পাড়ে। ৩১ চিত্রের ন্থায় ৫০।৬০টী ডিম একত্রে গর্ত্তের

মধ্যে রাখিয়া দেয়। এক একটী স্ত্রীফড়িঙ ৫০।৬০টী ডিম পাড়ে। এখন হইতে ডিম মাটির নীচে থাকিয়া যায় এবং আবার জ্যৈষ্ঠ মাস আসিলে ফোটে। ধানের ক্ষেতে ঐ সময়েই ছানা ফড়িঙ দেখা দেয়। অতএব দেখা যাইতেছে ধানের সময়েই এই ফড়িঙ হয় এবং অন্য সময় ডিম অবস্থায় মাটির নীচে থাকে। ইহারা ধান না পাইলে আক, মক্কা, জোয়ার, শ্যামা প্রভৃতির পাতা খায়।

মাটির নীচের ডিম যদি কোন উপায়ে নষ্ট করিতে পারা যায় তাহা হইলে ধানের সময় বাহির হইয়া ধানের ক্ষতি করিতে পারে না। চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন খুব রৌদ্র হয় সেই সময় ধানের ক্ষেতে লাঙ্গল ও মই দিয়া বেশ করিয়া মাটি উলট্‌পালট্‌ করিয়া দিতে পারিলে অনেক ডিম রৌদ্রে শুকাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষেতে ডিম আছে বাহির হইতে কিছুতেই চিনিবার উপায় নাই। অতএব যেখানে ইহার উপদ্রব হয় সেখানে সমস্ত ধানের ক্ষেতেই এইরূপে চাষ দেওয়া উচিত।

ডিম ফুটিলে যখন ছানা বাহির হইয়া খাইতে থাকে তখনই ইহাদিগকে জাল কিম্বা থলে দিয়া ছাঁকিয়া মারিয়া ফেলাই সহজ উপায়। মধ্য প্রদেশে এই ফড়িঙের বড় উপদ্রব এবং ইহারা ধানের অত্যন্ত ক্ষতি করে। সেখানে নিম্নলিখিত উপায়ে জাল দিয়া ছাঁকিয়া অনেক স্থান হইতে ইহাদিগকে নিঃশেষ করা হইয়াছে। অল্প জমির মধ্যে থাকিয়া খাইতেছে দেখিলে ইহাদিগকে হাতজাল বা ঘাট জাল দিয়া এক জনেই অনায়াসে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু যদি গ্রামের সমস্ত জমিতে হয় কিম্বা ২।৩ গ্রাম জুড়িয়া হয় তাহা হইলে সকলে মিলিয়া মধ্য প্রদেশের ন্যায় নিম্নলিখিত উপায়ে মারিতে হয়;

এ রকম একটী জাল প্রস্তুত করিতে হয় যাহার ভিতর দিয়া ফড়িঙের ছানা না গলিয়া যায় এবং জালটী জলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইলে অনায়াসে জল গলিয়া যায়। পাৎলা জালের মত চট হইলেও চলে। জাল ৫ হাত চওড়া হওয়া আবশ্যক। লম্বায় যেমন সুবিধা ২০, ২৫, ৩০ বা ৪০ হাত হইতে পারে। লম্বালম্বি দুই ধারে দুইটী দড়া বাঁধিয়া লইতে হয় এবং দুইটী দড়াই এত লম্বা হওয়া চাই যে জালের দুই ধারে প্রায় ৩ হাত করিয়া বাড়িয়া থাকে। লম্বালম্বি এক ধারে জেলেরা যেমন জালে লোহার কাঁঠী লাগায় সেই রকম ৫।৬ আঙ্গুল অন্তর অন্তর লোহা, সীসা বা অন্য কোন ভারী জিনিস বাঁধিয়া দিতে হয়। জালের এই ধারটা নীচে থাকিবে এবং জলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইলে ডুবিয়া ডুবিয়া যাইবে। এই ধারে মধ্যে আরও ২।১টা দড়া বাঁধিয়া লইতে হয়। ৪ জন জালের দুই কিনারার উপরের ও নীচের দড়া ধরিবে এবং নীচের ধারে যে কয়টা দড়া লাগান হইয়াছে এক একজন লোক এক একটা দড়া ধরিবে। জালের উপর ধারটা উঁচু করিয়া রাখিবার জন্যও দুই এক জন লোকের প্রয়োজন হইবে। উপর ধার অপেক্ষা নীচের ধারটী একটু আগে টানিতে হইবে। ক্ষেতের মধ্যে দিয়া টানিয়া লইয়া যাইলে টানা জাল বা গড়ে জালে মাছ ধরার মত সমস্ত ফড়িঙ ধরা পড়িবে। মাঝে মাঝে জালের দুই ধার এক সঙ্গে গুটাইয়া বেশ করিয়া মোঁচড় দিলে যত ফড়িঙ ধরা পড়িয়াছে সমস্ত মরিয়া যাইবে। ফড়িঙদের ডানা গজাইবার পূর্ব্বে এইরূপে ধরিয়া মারিবার ঠিক সময়। ডানা হইলে তাহারা উড়িয়া পালাইবে।

লেদা পোকা ও শীষ কাটা লেদা পোকা।

২য় চিত্রপটের ১২ চিত্রে যে কীড়া পাতার উপর রহিয়াছে ইহাকে স্থানে স্থানে লেদা পোকা বলে। ইহার প্রজাপতি ঐ চিত্রপটের ১১ চিত্রে পাতার উপর বসিয়া রহিয়াছে। দিনের বেলা প্রজাপতি বাহির হয় না কোন স্থানে লুকাইয়া থাকে। রাত্রিতে বাহির হইয়া পাতার উপর কিরূপে গাদা করিয়া ডিম পাড়ে ১০ চিত্রে দেখান হইয়াছে। এক এক গাদায় ২০০ পর্য্যন্ত ডিম থাকে এবং গাদাটা কটা রঙের লোমে ঢাকা থাকে। এক একটী স্ত্রী প্রজাপতি ২৫০।৩০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ৩।৪ দিন পরে ডিম ফুটিলে ছোট কীড়ারা পাতার উপর থাকিয়া পাতা খাইতে থাকে। ছোট বেলায় কীড়ারা সবুজ রঙের থাকে (১৩ চিত্র দেখ) বড় হইলে

রঙ মেটে হইয়া যায় এবং পীঠের দুই ধারে কাল কাল দাগ হয়। বড় হইলে কীড়াদিকে কখন কখনও দিনের বেলা মাটিতে লুকাইয়া থাকিতে দেখা যায়। তবে প্রায় পাতার উপরে থাকিয়াই খায়। ২০।২৫ দিন খাইয়া গাছ ছাড়িয়া মাটির একটু নীচে যাইয়া পুত্তলি হয়। ৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রে কাটুইএর যে পুত্তলি দেখান হইয়াছে ইহার পুত্তলিও সেইরূপ। বর্ষাকালে ১০।১২ দিন এবং শীতের সময় প্রায় ২০।২৫ দিন পুত্তলিরূপে থাকিয়া প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং আবার ডিম পাড়ে।

৩য় চিত্রপটের ১২ চিত্রে ডাঁটার উপর যে কীড়া রহিয়াছে ইহাকেও লেদা পোকা বলে। ইহার প্রজাপতি এই চিত্রপটের ১৩ চিত্রে গাছের উপর বসিয়া রহিয়াছে। এই প্রজাপতিও কেবল রাত্রিতে বাহির হইয়া ডিম পাড়ে। ইহা গাদা করিয়া ডিম পাড়ে না। গুটান মাজপাতা বা অন্য কোন গুটান পাতা কিম্বা পাতার খোলের মধ্যে সারি দিয়া ডিম পাড়ে। এক একটী স্ত্রী প্রজাপতি ৪৫০ পর্য্যন্ত ডিম প্রসব করে। ৩।৪ দিন পরে ডিম ফুটিলে কীড়ারা পাতা খায়। ছোট কীড়ারা দিনের বেলা গুটান পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকে, কেবল রাত্রিতে খায়। বড় হইলে আর পাতায় লুকাইয়া থাকিতে পারে না। তখন গাছ ছাড়িয়া দিনের বেলা মাটির ফাটালে বা মাটিতে গর্ত্ত করিয়া লুকায়। রাত্রিতে বাহির হইয়া খায়। এই জন্য ধানের ক্ষেতে যখন জল থাকে তখন এই কীড়া প্রায় ধান আক্রমণ করে না। ধানের যখন শীষ হইয়া ধান পাকিয়া যায় তখনই প্রায় ইহার উপদ্রব বেশী হয়। ইহারা রাত্রিতে ধানের গাছে উঠিয়া শীষ কাটিয়া দেয়। পূর্ব্বদিন যে গাছে শীষ ছিল পরদিন সেই গাছ শীষ শূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেশী হইলে ইহারা এইরূপে পাকা ধানের অত্যন্ত ক্ষতি করে। ২৫।৩০ দিন খাইয়া মাটিতেই পুত্তলি হয়। ইহারও পুত্তলি প্রথম লেদা পোকার পুত্তলির ন্যায়। তারপর প্রজাপতি হইয়া বাহির হইয়া আবার ডিম পাড়ে।

এই দুই লেদা পোকা যখন পাতার উপরে থাকিয়া খায় তখন পোকা ধরা থলে দ্বারা অধিকাংশকেই ধরা যায়। এই কীড়া দেখা দিলে প্রথম প্রথম তাহাই করা উচিত। যখন কীড়ারা বড় হয় তখন কতকগুলি কাঁচা ঘাস বা পাতা যদি ক্ষেতের মধ্যে ৪।৫ হাত অন্তর অন্তর ছোট ছোট গাদায় রাখা হয় তাহা হইলে দিনের বেলা ইহারা এই ঘাস বা পাতার ভিতর আসিয়া লুকায়। একটু বেলা হইলে এই ঘাস বা পাতা উল্টাইয়া ইহাদিগকে ধরিয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। এইরূপে ফাঁদে ফেলিয়া অনেক পোকা মারা যায়। (পরে কীড়া পালের বিবরণ দেখ)

কোরা পোকা বা গোবরে পোকা।

৪র্থ চিত্রপটের ১ ও ২ চিত্রে যে পোকা দেখান হইয়াছে ইহাদিগকে কোথাও কোরা পোকা এবং কোথাও গোবরে পোকা বলে। গোবরের মধ্যে সার গাদায় এই রকম অনেক দেখা যায় বলিয়া ইহাদিকে গোবরে পোকা বলে। এই চিত্রপটের ৭ চিত্রে ইহার পতঙ্গ রহিয়াছে। পতঙ্গ ভোঁ ভোঁ শব্দ করিয়া আলো দেখিয়া ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসে। এইজন্য ইহাকে ভোঁমরা পোকা বলে। ভোঁমরা পোকা ও ভ্রমর আলাদা। ভ্রমরেরা কেবল দিনের বেলায় উড়িয়া বেড়ায় এবং তাহাদের চারিটী পাত্‌লা ডানা বেশ দেখা যায়। ঘরে উড়িতে উড়িতে ভোঁমরা পোকা দেওয়ালে কি অন্য কিছুতে ধাক্কা খাইয়া ঠক্ করিয়া মেজেতে পড়িয়া যায়। দেখিলে বোঝা যাইবে ইহারা কঠিন পক্ষ পতঙ্গ। কোরা পোকা বা গোবরে পোকা ভোঁমরার কীড়া। ভোঁমরা গোবর বা মাটির মধ্যে রাত্রে আসিয়া গোল গোল সাদা সাদা ডিম পাড়ে। এই চিত্রপটের ৪ চিত্রে ডিম দেখান হইয়াছে। ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া কিছুদিন খাইয়া মাটির মধ্যেই পুত্তলি হয়। এই চিত্রপটের ৩, ৫ ও ৬ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে। তারপর পতঙ্গ হইয়া বাহির হয়।

ভোঁমরা পোকা অনেক রকমের আছে। কাহারও আকার ছোট কাহারও আকার বড়, কাহারও রঙ

৪র্থ চিত্রপট।

গোবরের পোকা বা গুবরেপোকা।

Engraved and Printed by The Calcutta Phototype [illegible]

কাল কাহারও রক্ত লাল বা সবুজ ইত্যাদি। কাহারও মাথায় গণ্ডারের মত শিং থাকে। পরে তাদের ভোঁমরার কথা বলা হইয়াছে। সকলেরই কীড়া প্রায় দেখিতে একই রকম চেহারার হয়। যাহা কিছু সামান্য পার্থক্য আছে সাধারণ লোকের পক্ষে ধরা বড় কঠিন। অনেক কোরা পোকা, গো মহিষ প্রভৃতির নাদি এবং মানুষের বিষ্ঠা খায়। অনেকে গাছের শিকড় খায় এবং শিকড় কাটিয়া গাছ মারিয়া ফেলে।

৪র্থ চিত্রপটে কোরা পোকার চারি পৃথক অবস্থা আঁকিয়া দেখান হইয়াছে (৪ চিত্র ডিম; ১ ও ২ চিত্র কীড়া; ৩, ৫ ও ৬ চিত্র পুত্তলি; ৭ চিত্র পতঙ্গ অর্থাৎ ভোঁমরা। সকলই বড় করিয়া অঙ্কিত)। ইহারা কখনও কখনও ধানের ক্ষেতে বিস্তর হয় এবং ধানের শিকড় খাইয়া গাছ মারিয়া ফেলে। অনেক সময় আকের শিকড় কাটিয়া আক নষ্ট করে। ইহারা ঘাসেরও শিকড় খাইয়া বাঁচিতে পারে এবং মধ্যে মধ্যে বাগানের চারা গাছের শিকড় খাইতেও দেখা যায়। বৎসরের মধ্যে একবার ইহাদের বংশ হয়। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পতঙ্গ বাহির হয় এবং যেখানে সুবিধা পায় ডিম পাড়ে। ৫।৬ দিনের মধ্যে ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়ারা প্রায় আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত খায়। তার পর মাটির ভিতরেই চৈত্র বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত কীড়া অবস্থায় নিদ্রা যায়। তারপর পুত্তলি হইয়া ১০।১২ দিনের মধ্যেই পতঙ্গ হইয়া বাহির হয়।

কোরা পোকা যখন ধানের শিকড় খায় তখন গাছের গোড়ায় কেঁচোতে যেমন মাটি উঠায় সেই রকম উঠান মাটি দেখা যায়। একটু মাটি উল্টাইলেই কোরা পোকা দেখা যায়। ইহাদিগকে এই রকমে বাছিয়া কেরোসিন তেলে ফেলিয়া মারা ছাড়া প্রায় আর কিছুই করিতে পারা যায় না। মাটিতে সোরা প্রভৃতি মিশাইয়া দিলে গাছের গোড়া ছাড়িয়া মাটির নীচে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহা অপেক্ষা মারিয়া ফেলাই সহজ উপায়। সারগাদা হইতে উঠাইয়া জমিতে দেওয়ার পূর্ব্বে সার হইতে কোরা পোকা বাছিয়া মারা উচিত।

———)*(———

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কোরা পোকা অনেক রকমের আছে। ইহারা গোবর, মহিষ প্রভৃতির নাদি, মানুষের বিষ্ঠা, ঘাসের শিকড় কিম্বা অন্যান্য গাছের শিকড় খায়। প্রায় সকলেরই বৎসরে একবার বংশ হয়। কাহারও

৩০ চিত্র—ভোঁমরা পোকা পাতা খাইতেছে।

দুই বৎসরে কিম্বা তিন বৎসরে একবার বংশ হয়। কোরা পোকারা যখন পতঙ্গ হয় বা ভোমরা হইয়া বাহির হয়, তখন প্রায় এক সঙ্গে অনেক বাহির হয়। ভোঁমরারা দিনের বেলা মাটির নীচে বা পাতা ঘাস ইত্যাদির ভিতর লুকাইয়া থাকে। রাত্রে উড়িয়া বেড়ায়, সুবিধামত ডিম পাড়ে এবং গাছের পাতা খায়। ভোঁমরা পোকারা কি রকম করিয়া গাছের পাতা খায় উপরের চিত্রে দেখান হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতের কাছাকাছি

জায়গায় এইরূপে পাতা খাইয়া অনেক লোকসান করে। ভোঁমরা পোকা দলে দলে বাহির হয় বটে কিন্তু ১০।১৫ দিনের মধ্যেই মরিয়া যায়।

সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশে ভোঁমরা পোকা পাতা খাইয়া ফসলের কোন ক্ষতি করে না। তবে যদি জোয়ার, বাজরা প্রভৃতির কিম্বা ধানের শীষ হইবার সময় কোন ভোঁমরার দল বাহির হয় তাহা হইলে অনেক সময় কচি কচি দানা খাইয়া অনেক লোকসান করে। গান্ধি তাড়াইবার জন্য যেমন ধোঁয়া দেয় রাত্রে সেই রকম ধোঁয়া দিতে পারিলে উপকার হয়। মাঝে মাঝে ফসলের উপর একটা দড়া টানিয়া গাছ নড়াইয়া দিতে হয়। ক্ষেতের মাঝে মাঝে আগুন জ্বালাইয়া রাখিলে অনেক ভোঁমরা পোকাই আগুনে আসিয়া পুড়িয়া মরে।

ধৌলি।

১৯০৮ সালে ধানে যে পোকা লাগিয়াছিল তাহাকে মেদিনীপুর কটক ও রাঁচিতে ধৌলি বলে, বর্দ্ধমান হুগলীতে ধসা ও কোন কোন জেলায় মধুপোকা বা ধলসুন্দর বলে। ইহারা গান্ধি জাতীয় পোকা এবং দেখিতে ছোট ছোট। রঙ শুকান খড়ের রঙের মত। ছোট বেলায় ইহাদের রঙ সাদা থাকে এবং ডানা থাকে না; এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইয়া যায়। ইহারা শুঁয়া বা সুতলী পোকার মত পাতা ও ডাঁটা কাটিয়া খায় না। গান্ধি যেমন ধানের দুধ চুষিয়া খায় ইহারা সেইরূপে পাতা ও ডাঁটার রস চুষিয়া খায়। দুই একটা পোকা গাছের কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। অনেক পোকা যদি রস চুষিয়া খায় তবে গাছ কম তেজী হইয়া যায় এবং বেশী খাইলে শুকাইয়া যাইতে পারে। এই পোকারা সাধারণতঃ ঘাস ইত্যাদির পাতার রস খাইয়া থাকে। যখন ঘাস জলে ডুবিয়া বা অন্য কোন রকমে খাবার অনাটন হয় তখন ধানে আসিয়া পড়ে। ইহাদের পিছনদিক হইতে বিন্দু বিন্দু মধুর মত একরকম রস বাহির হয় এই জন্য মধুপোকা বলিয়া থাকে।

এই পোকা লাগিলে কোথাও কোথাও দুই তিন দিনের পচা গোরুর মূত্র ও গোবর মিশাইয়া মাঝে মাঝে ধানের ঝাড়ে লাগাইয়া দেওয়া হয়। তিন চারি ঝাড় ছাড়িয়া এক ঝাড়ে আবার তিন বা চারি ঝাড় ছাড়িয়া এক ঝাড়ে লাগাইয়া দেয়। এই গোবর হাতে লইয়া ঝাড়ের গোড়া হইতে ডগ পর্য্যন্ত মাখাইয়া দেয়।

ধানের ক্ষেতে যখন জল থাকে তখন কেরাসিন তেল জলে ঢালিয়া দিয়া সহজেই ইহাদিকে মারা যায়। এক বিঘা জায়গায় এক বোতল কেরাসিন লাগে। যে দিক হইতে হাওয়া বয় ক্ষেতের সেই দিকে একটু একটু কেরাসিন তেল জলে ঢালিয়া দিতে হয়। কেরাসিন জলে ভাসে এবং হাওয়াতে সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া যায়। সেই সময় একটা লম্বা দড়া বা বাঁশ একবার ধানগাছের উপর দিয়া টানিয়া দিতে হয়। ধৌলিরা লাফাইয়া জলে পড়ে এবং কেরাসিন তেল মাখা হইয়া সব মরিয়া যায়।

ধানের উপর দিয়া পোকা ধরা থলে টানিয়া লইয়া যাইলেও ধৌলিরা থলেতে ধরা পড়ে।

নলী পোকা বা লাউড়ে পোকা।

কখনও কখনও যাহাতে জল দাঁড়াইয়া আছে এমন ধানের ক্ষেতে দেখা যায় যে প্রায় ১ ইঞ্চি কি ১৪ ইঞ্চি লম্বা সবুজ ধানের পাতার নল ভাসিতেছে কিম্বা পাতার উপর এই রকম নল ঝুলিতেছে (২য় চিত্রপটের ৪ চিত্র)। ২য় চিত্রপটের ৫ চিত্রে পাতার পাশে যে কীড়া দেখান হইয়াছে ইহাই ধানের পাতার ডগ কাটিয়া মুখের লালার দ্বারা বাঁধিয়া এই রকম নল প্রস্তুত করে; এই জন্য বাঁকুড়া জেলায় ইহার নাম নলী পোকা। নলের মধ্যে থাকিয়াই ঝুলিতে ঝুলিতে পাতার পর্দ্দা খাইয়া ঝাঁঝরার মত করিয়া দেয় (২য় চিত্রপটে ৪ চিত্র দেখ)। খাইতে খাইতে মাঝে মাঝে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া জলের উপর পড়ে এবং ভাসিতে ভাসিতে যাইয়া আবার অন্য গাছ বহিয়া উঠে। এই জন্য ইহাকে "লাউড়ে" পোকাও বলিয়া থাকে। নলটী শুকাইলে পুরাতন

নল ছাড়িয়া দিয়া আবার পাতা কাটিয়া নূতন নল প্রস্তুত করে। ২য় চিত্রপটের ৬ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে। স্ত্রী প্রজাপতি পাতার ডগে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া কীড়ারা প্রায় ২০ দিন খায়। তারপর মুখের লালার দ্বারা নলটী গাছের গোড়ায় বাঁধিয়া দিয়া ইহার মধ্যে পুত্তলি হয়। ৫।৬ দিন পরে আবার প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। মধ্যপ্রদেশে এই নলী পোকা হইতে বিস্তর ক্ষতি হয়। পোকা বেশী হইলে গাছের সমস্ত পাতা ঝাঁঝরা করিয়া দেয়। ইহাতে গাছ কম জোর হইয়া মরিয়াও যায়।

অল্প জায়গায় হইলে অল্প সময়ের মধ্যে মাছ ধরা হাতজালে কিম্বা কাপড়ে করিয়া ছাঁকিয়া পুড়াইয়া দিলেই হয়। বেশী হইলেও এই রকম জাল দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়াই সহজ উপায়। ক্ষেতের জল বাহির করিয়া দিলে উপকার হয় কিন্তু জল বাহির করিয়া দিলে ধানের ক্ষতি হইতে পারে। সময়ে আর জল না পাওয়া যাইতে পারে।

ঘোড়া পোকা।

৩য় চিত্রপটের ১৪ ও ১৫ চিত্রে ধানের শীষের উপর যে সবুজ ও লাল পতঙ্গ দেখান হইয়াছে ইহাদের ঘাড় ঘোড়ার মত লম্বা এই জন্য কোথাও কোথাও ইহাদিগকে বড় ঘোড়া পোকা বলিয়া থাকে। মটরের মধ্যে যে পোকা হয় তাহাকে "ছোট ঘোড়া পোকা" বলে। বড় ঘোড়া পোকাকে কাচ পোকাও বলে। ইহারা সাধারণতঃ বন জঙ্গলের পাতা ফুল ইত্যাদি খাইয়া থাকে। কিন্তু কখনও কখনও ইহারা ধানের শীষ বাহির হইয়া ধানে দুধ হইবার সময় দলে দলে আসিয়া ধান খাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার না করিতে পারিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা। তাড়া দিলে ইহারা উড়িয়া যায়। পোকা ধরা থলে দ্রুতগতিতে ধানের উপর টানিয়া লইয়া ইহাদিগকে ধরিয়া মারা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

অন্যান্য পোকা।

২য় চিত্রপটের ৭ চিত্রে পাতার উপর যে দুইটী শৃঙ্গ বিশিষ্ট কীড়া রহিয়াছে ইহা কেবল পাতা খাইয়া ধানের অল্প বিস্তর ক্ষতি করে। বেশী হইলেই অনিষ্টের সম্ভাবনা। ঐ চিত্রপটের ৯ চিত্রে যে প্রজাপতি পাতার উপর বসিয়া আছে ইহাই এই কীড়ার পতঙ্গ। স্ত্রী প্রজাপতি পাতায় উপরেই এখানে ওখানে গোল গোল সাদা রঙের ডিম পাড়ে। তিনদিন পরে ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হইয়া পাতা খাইতে থাকে। ২১।২২ দিন এই ভাবে খাইয়া পাতার উপরেই পুত্তলি হয়। ঐ চিত্রপটের ৮ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে। পুত্তলি এই ভাবে পাতায় ঝুলিয়া থাকে। পুত্তলি হইবার ১০।১১ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। ধানের ক্ষেতে এই রকম প্রজাপতি উড়িতে দেখা যায়। যদি কীড়া বেশী হয় তবে বালক বালিকা দ্বারা পাতা সমেত কীড়া ও পুত্তলি জড় করিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে হয়।

২য় চিত্রপটের ১৮ চিত্রে যে গুটান পাতার মধ্যে সবুজ রঙের কীড়া রহিয়াছে ইহাও কেবল পাতা খায়। বেশী হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই কীড়ারা সকল সময়েই মুখের লালার দ্বারা পাতা জড়াইয়া নিজের দেহ পাতার ভিতর ঢাকিয়া রাখে। ঐ চিত্রপটের ২০ চিত্রে যে প্রজাপতি বসিয়া রহিয়াছে ইহাই এই কীড়ার প্রজাপতি। স্ত্রী প্রজাপতি পাতার উপর ডিম পাড়ে। কীড়ারা যখন খাইয়া বড় হয় তখন একই ভাবে পাতা জড়াইয়া তাহার মধ্যে পুত্তলি হয়। ঐ চিত্রপটের ১৯ চিত্রে পুত্তলি রহিয়াছে। দেখাইবার জন্য পুত্তলির পাতার ঢাকা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কখনও কখনও দেখা যায় এক প্রকার সুতলী পোকা উপরের পোকার ন্যায় পাতার ডগ মুখের লালার দ্বারা জড়াইয়া ভিতরে থাকিয়া পাতার ভিতরের পর্দ্দা খাইতেছে। ইহারা এক প্রকার ছোট প্রজাপতির কীড়া।

ইহা হইতে ক্ষতি খুব কমই হয়। তবে বেশী হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা। জড়ান পাতা দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় কীড়া কোথায় রহিয়াছে। বালক বালিকা দ্বারা এই রকম জড়ান পাতা কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলিলেই হয়।

এক প্রকার শুঁয়া পোকাতেও ধানের পাতা খায়। ইহাতে কোন ক্ষতি হয় বলিয়া প্রায় শুনা যায় না। তবে "সাবধানের মার নাই"; প্রথম হইতে সতর্ক হওয়াই উচিত। দেখিলেই বাছিয়া লইয়া পুঁতিয়া কিম্বা পুড়াইয়া ফেলা উচিত।

ভেঁপু।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে মেঘ ডাকিলে ধানে এক রকম রোগ হয় যাহাকে ভেঁপুধরা বা ভেঁপুফুলান বলে। ধানের থোড় হঠাৎ বড় হইয়া উপরদিকে উঠে তারপর শুকাইয়া যায়। সে গাছে আর শীষ হয় না। অনেকেই এই রকম বর্ণনা করেন। লেখক কখনও ভেঁপুধরা দেখে নাই। অতএব ইহার কারণ কি বলা যায় না। অনেকে বলিয়া থাকেন ভেপু ধরিলে জমিতে বেশী করিয়া খোল কিম্বা কোন রকম সার ছিটাইলে উপকার হয়। কোন রকম পোকা লাগা ভেঁপু ফুলানর কারণ বলিয়া বোধ হয় না।

৫ম চিত্রপট।

যব গমের পোকা।

Engraved and Printed by The Calcutta Phototype Co

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যব গমের পোকা।

মাঠ ফড়িঙ।

যব গমের অঙ্কুর যেমন মাটি হইতে বাহির হয় দুই তিন রকমের ছোট ছোট গঙ্গাফড়িঙের জাতের ফড়িঙ এই অঙ্কুর ও চারা গাছ খাইয়া ফেলে। অনেক সময় ক্ষেতের সমস্ত গাছ খাইয়া ফেলে এবং আবার নূতন করিয়া বীজ বুনিতে হয়। ৫ম চিত্রপটের ৪, ৫, ৬, ও ৭ চিত্রে দুই রকমের ফড়িঙ দেখান হইয়াছে। ইহাদের রঙ শুকান মাটির রঙের মত এবং মাটিতে বসিয়া থাকিলে ইহারা সহজে নজরে পড়ে না। এই জন্য ইহাদিগকে "মেটে ফড়িং" বলে। সাধরণতঃ মাঠে থাকে বলিয়া "মাঠ ফড়িং" ও বলে। বিহার অঞ্চলে ইহাদের সাধারণ নাম "ফতিঙ্গা"। এই দুই রকম ছাড়া আরও এক রকম ফড়িঙ ইহাদের সঙ্গে থাকে। তাহাদের রঙ মাটির রঙের মতও হয় আবার সবুজও হয়। একবার গাছ বড় হইযা উঠিলে মাঠ ফড়িঙ আর তেমন ক্ষতি করিতে পারে না।

মাঠ ফড়িং মাঠের মধ্যে মাটিতে ডিম পাড়ে। শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগ মাটিতে ঢুকাইয়া গর্ত্ত করিয়া এই গর্ত্তের মধ্যে একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। ৩১ চিত্রে মাটির ভিতর মাঠ ফড়িঙের ডিম দেখান হইয়াছে। ডিম ফুটিলে ছানারাও বড় মাঠ ফড়িঙের মত খাইতে থাকে। ছানাদের ডানা থাকে না, লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। যত বড় হয় ক্রমে ক্রমে ডানা গজায়। সম্পূর্ণ ডানা হইলেও মাঠ ফড়িঙ প্রায় বেশী উড়ে না, লাফাইয়াই চলে। কখনও কখনও কেবল সামান্য দুর উড়িয়া যায়।

৩১ চিত্র—মাঠ ফড়িঙের ডিম।

মাঠ ফড়িঙ যে কেবল যব গমের ক্ষতি করে তাহা নহে। আক্‌, শ্যামা, কোদো, কাপাস, তামাক, আলু, বেগুণ, কপি প্রভৃতি যাবতীয় তরিতরকারীর গাছ এবং কলাই প্রভৃতি সমস্ত রবি ফসলের গাছ এইরূপে খাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। ভাল বর্ষা হইলে ইহাদের সংখ্যা কমিয়া যায়। তখন ক্ষেতে জল দাঁড়ায় বলিয়া ইহারা থাকিতে পারে না। রবি ফসলেরই ইহারা বেশী ক্ষতি করে। বর্ষাকালে ডাঙ্গা জমিতে যেখানে জল দাঁড়ায় না সেই খানে মাঠ ফড়িঙ সকল আসিয়া জড় হয়।

মাঠ ফড়িঙ হইতে ক্ষতি হইবার বিশেষ কারণ এই যে, যখন লাঙ্গল দিয়া সমস্ত মাঠের ঘাস আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া দিয়া বীজ বোনা হয় তখন ফড়িঙদের কোন খাবার থাকে না, কারণ ইহারা কাঁচা পাতা ছাড়া আর কিছুই খায় না। কাজেই বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর বাহির হয় ইহারা এই অঙ্কুর খাইয়া ফেলে। এক একটা ফড়িঙই অনেক অঙ্কুর খাইয়া ফেলে। এই সময় যদি ঘাস ইত্যাদি ক্ষেতে থাকে তাহা হইলে দুই একটা ফড়িঙ অঙ্কুর খাইতে পারে সকলেই অঙ্কুর খাইয়া ফসল নষ্ট করিয়া দেয় না। যেখানে মাঠ ফড়িঙের বড় উপদ্রব যদি সম্ভব হয় ক্ষেতে বীজ বুনিয়া বীজ হইতে গাছ বাহির হইয়া বড় হইবার পর ঘাস ইত্যাদি নিড়াইয়া দিলে ভাল হয়। তাহা হইলে অধিকাংশ ফড়িঙ অন্য খাবার থাকাতে অঙ্কুরের দিকে নজর দেয় না।

সমস্ত মাঠ না নিড়াইয়া মাঝে মাঝে কতকটা করিয়া ঘাস ইত্যাদি রাখিয়া দিতে হয়। অন্য জায়গায় খাবার না পাইয়া মাঠ ফড়িঙ এই সব ঘাসে আসিয়া জড় হয়। তখন একটু জায়গায় থলেতে করিয়া ইহাদিগকে ধরা সুবিধা।

কিম্বা ফসলের ক্ষেতে পাতলা করিয়া এমন কোন বীজ বুনিতে হয় যাহার গাছ ফসলের একটু আগে জন্মে। ফড়িঙরা এই চারা গাছ পাইয়া ফসলের অঙ্কুরে নজর দেয় না এবং এই গাছ খাইতে খাইতে ফসল বাড়িয়া যায়। তখন এই গাছ উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া চলে। অনেক জায়গায় পোস্ত গাছের ক্ষেতে সরিষা বুনিয়া দেয়, সরিষা একটু আগে জন্মে এবং ফড়িঙরা সরিষার চারা পাইয়া পোস্তর অঙ্কুরে নজর দেয় না এবং সরিষা খাইতে খাইতে পোস্ত বাড়িয়া যায়। তারপর সরিষার গাছ উঠাইয়া ফেলিয়া দেয়।

পোকা ধরা থলে দ্বারা মাঠ কড়িঙদিকে ধরিয়া মারিয়া তার পর ফসল লাগানই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায়। যদিও মাটির উপর সহজে ইহাদিগকে চেনা যায় না কিন্তু যে ক্ষেতে মাঠ ফড়িঙ থাকে সেই ক্ষেতের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইলে আগে আগে মাঠ ফড়িঙ লাফাইয়া লাফাইয়া যায়। ক্ষেতের উপর পোকা ধরা থলে টানিলে যত ফড়িঙ লাফাইয়া লাফাইয়া থলের মধ্যে ধরা পড়ে। এইরূপে ক্ষেতের ও ক্ষেতের পাশের পড়া জমির ফড়িং মারিয়া ফসল বুনিলে আর ক্ষতি হয় না।

মাটি পোকা।

মাঠ ফড়িঙ ছাড়া ৫ম চিত্রপটের ৮ চিত্রে যে কাল রঙের পোকা দেখান হইয়াছে ইহারা এবং আরও অনেক সরু মুখওয়ালা মাটির রঙের বা কাল রঙের কঠিন পক্ষ পতঙ্গ বীজের অঙ্কুর ও চারা গাছ কাটিয়া কাটিয়া খায়। সচরাচর ইহারা দিনের বেলা মাটির ফাটালে বা ঢীলের নীচে লুকাইয়া থাকে। তাহা হইলেও ক্ষেতের মধ্যে দিনের বেলা অনেককে বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা মাটির উপরেই থাকে বলিয়া ইহাদিগকে মাটি পোকা বলে। ইহারা প্রায়ই রাত্রে বাহির হইয়া খাইয়া বেড়ায় এবং গাছ কিছু বড় হইলেও ডাঁটা কাটিয়া গাছকে মারিয়া ফেলিতে পারে।

পোকা ধরা থলেতে ইহারা ধরা পড়ে না। ক্ষেতের মধ্যে ৪।৫ হাত অন্তর কতকগুলি কাঁচা ঘাস বা পাতা ছোট ছোট স্তূপাকারে রাখিলে ইহারা এই ঘাস বা পাতার ভিতর আসিয়া লুকায় এবং দিনের বেলা ইহাদিগকে বাছিয়া মারিতে হয়। রোজ রোজ কাঁচা পাতা বা কাঁচা ঘাস এইরূপে রাখিতে পারিলে অনেক সময় ইহারা এই পাতা বা ঘাস খায় এবং অন্যান্য গাছের দিকে নজর দেয় না। কোথাও কোথাও কাঁচা লাউ ছোট ছোট ফালি করিয়া কাটিয়া ক্ষেতের মাঝে মাঝে এই ফালিগুলি ছড়াইয়া রাখে। মাটি পোকারা অনেকে এই লাউ খাইতেও আসে এবং অনেকেই ফালির নীচে আসিয়া লুকায়। দিনের বেলা ইহাদিগকে ধরিয়া মারে।

যদি পারা যায় ক্ষেতে জল ঢুকাইয়া দিলে মাঠ ফড়িং ও মাটি পোকা অনেকেই ডুবিয়া মরিয়া যায়। অনেকেই ভাসিয়া উঠে তখন বাছিয়া লইতে হয়।

মাজরা।

৫ম চিত্রপটের ১, ২, ও ৩ চিত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ধানের তৃতীয় প্রকারের মাজরাই যব ও গমের মাজরা। ইহা শীত নিদ্রার পর মাঘ ফাল্গুন মাসে প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়াই যব ও গমের উপর ডিম পাড়ে। ধানের মত যব ও গমেরও শীষ শুকাইয়া যায়। গোড়ায় উই ধরিলেও যব গম শুকাইয়া যায়। কিন্তু উইয়ের আক্রমণ কি মাজরার আক্রমণ হইতে গাছ শুকাইয়াছে সহজেই ধরা যায়। যে মাজটীতে মাজরা খাইতেছে সেই মাজটীই শুকায় অন্যান্য পাতা সকল বা ডাল সবুজ থাকে। কিন্তু উই ধরিলে ডাল পাতা সমেত সমস্ত গাছ কিম্বা সমস্ত ঝাড়টীই শুকাইয়া যায়। ক্ষেতের পাশে দাঁড়াইলেই মাজরা ও উই দ্বারা আক্রান্ত সমস্ত গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উইয়ের কথা বলিবার সময় উই ধরিলে কি করা উচিত বলা হইয়াছে। মাজরা দ্বারা আক্রান্ত গাছ দেখিলেই তাহা শিকড় সহিত উঠাইয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। (ধানের মাজরার বিবরণ দেখ)

ধানের গোড়া নষ্ট করিয়া যদি ইহার সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যায় তবে ইহা হইতে যব গমের ক্ষতি কম হইবে। আবার যব গমে যদি ইহার সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যায় তবে ইহা হইতে আকের ক্ষতি কম হইবে। আবার প্রথম হইতে আক্ ও ধানের উপরে নজর রাখিলে ইহা আকের কিম্বা ধানের ক্ষতি করিতে পারিবে না।

জাব পোকা।

৫ম চিত্রপটে বাম ধারে গম গাছের উপর অনেক ছোট ছোট সবুজ পোকা বসিয়া রহিয়াছে। ইহাদের একটীকেই ৯ চিত্রে বড় করিয়া আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। ইহাদের লম্বা লম্বা ছয়টী পা, ছুইটী শুঙ্গ ও গান্ধির মত একটী সরু শুঁড় আছে ও পিছনে ছুই ধারে ছুইটী ছোট নলের মত জিনিস আছে। কোন কোন জাব পোকার রঙ হল্‌দে হয় কিন্তু সকলেরই আকার এই রকম।

ইহারা গাছের পাতায় ও ডাঁটায় শুঁড় ঢুকাইয়া দিয়া রস চুষিয়া খায়। একবার লাগিলে ইহাদের বংশ এত শীঘ্র বাড়িয়া যায় যে গাছ ছাইয়া ফেলে। ছোট বড় সকলেই রস টানিয়া খায় কাজেই গাছ রুগ্ন হইয়া যায়, এবং যেমন ফল হওয়া উচিত তাহা হয় না।

ইহারা দলে দলে এক এক জায়গায় অনেক বসিয়া থাকে; এ সকলেই স্ত্রী জাব পোকা। ইহাদের পুরুষ প্রায় হয় না এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে স্ত্রী ও পুং পোকাতে সঙ্গম না হইলেও ইহাদের ছানা হয়। আরও বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য পোকার মত ইহারা ডিম পাড়ে না একেবারেই মানুষ ও গো মহিষ প্রভৃতির মত জীবন্ত ছানা প্রসব করে। ছানারা জন্মিয়াই খাইতে আরম্ভ করে এবং ৫।৬ দিনের মধ্যেই বড় হইয়া আবার নিজেরা ছানা প্রসব করিতে আরম্ভ করে। একটী জাব পোকা রোজ ২।৫টী করিয়া মোটের উপর ৬০।৬৫টী সন্তান প্রসব করে। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে জাব পোকার সংখ্যা কত শীঘ্র বাড়ে। আর হাওয়া ঠাণ্ডা থাকিলে ইহারা বেশ থাকে এবং ইহাদের বংশ বাড়িয়া যায়। খুব রৌদ্র হইলে কিংবা গরম বাতাস বহিলে ইহাদের সংখ্যা বাড়ে না। এই জন্য ২।৪ দিন মেঘলা থাকিলে ইহাদের সংখ্যা বেশী হয় এবং কৃষকেরা মনে করে মেঘ হওয়াতেই জাব পোকা আপনা আপনিই জন্মিয়াছে।

গাছের রস কমিয়া খাবারের অনাটন হইলে কিম্বা দল খুব বড় হইয়া উঠিলে ইহাদের খোলস ছাড়িয়া ডানা গজায়। তার পর উড়িয়া অপর অপর গাছে বসে এবং ছানা প্রসব করিয়া আবার সেখানে নূতন নূতন দল বাঁধে।

৩২ চিত্র—জাব পোকা।

৩২ চিত্রে নীচের ডান ধারের জাবের অর্দ্ধেক ডানা হইয়াছে। উপরের জাবের সম্পূর্ণ ডানা বিস্তার করিয়া দেখান হইয়াছে।

প্রথমে ক্ষেতের এখানে ওখানে ছুই একটা গাছে জাব লাগে। সেই সময় নজর রাখিয়া গাছ উঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কেরাসিন মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া দিতে হয়। গাছ সাবধানে উঠাইতে হয়। নাড়া পাইলে অনেকেই মাটিতে পড়িয়া যায়। আবার অন্য গাছে উঠে।
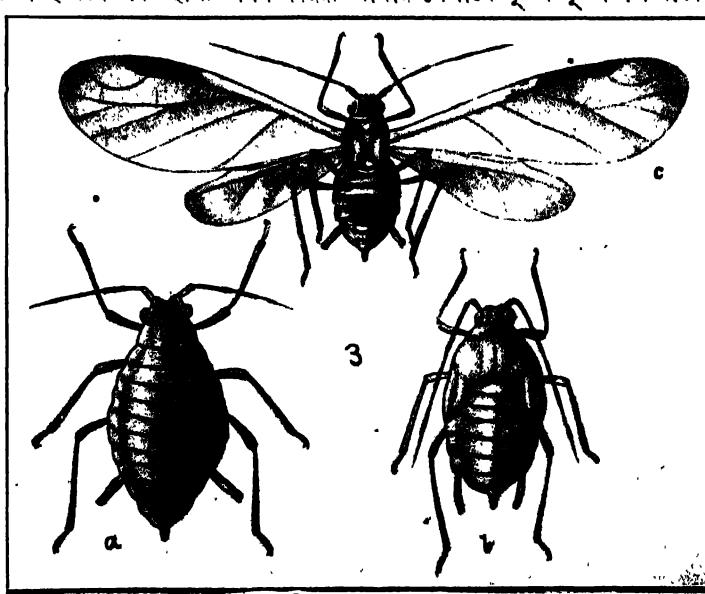
জাব ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়িলে কেরোসিন মিশ্রণ কিম্বা ফিনাইল কিম্বা ক্রুড-অয়িল-ইমলসন্ ছিটাইয়া মারা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

অনেক উপকারী পোকায় জাব পোকা খায়। এই উপকারী পোকাদের বিবরণ পুস্তকের শেষে দেওয়া গেল। পদ্ম পোকা পাইলে, ধরিয়া আনিয়া ইহাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে অনেক উপকার হয়। জাব পোকা বেশী হইলে এই সব উপকারী পোকা আসিয়া আপনা আপনিই জোটে। এই উপকারী পোকাদিগকে ভুল ক্রমে কিছুতেই মারা উচিত নয়।

সরিষা কলাই, কাপাস প্রভৃতি অনেক গাছেই জাব পোকা লাগে। কপি প্রভৃতি বাগানের গাছেও লাগে। বাগানে ফিনাইল বা ক্রুড অয়িল-ইমল্‌সনের জল ঝারি, পিচকারী বা দমকলের দ্বারা ছিটাইয়া ইহাদিগকে মারা উচিত।

ঘাস ফড়িঙ, মাজরা এবং জাব পোকা ছাড়া অন্য পোকায় যব গম ইত্যাদি বড় নষ্ট করে না। তবে কখনও কখনও বিশেষ জলের অভাব হইলে উইয়ের উৎপাত হয়। উই গোড়া খাইয়া এক এক জায়গায় ঝাড়কে ঝাড় শুকাইয়া দেয়। উইয়ের বিবরণ অন্যত্র দেখ।

৬ষ্ঠ চিত্রপট।

পাটের পোকা।

Engraved and Printed by The Calcutta Phototype

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাট ও শণ।

কাতরী পোকা।

(৬ষ্ঠ চিত্রপটের ১ চিত্র)

ছোট পাটে যে সবুজ রঙের পোকা লাগে, তাহাকেই জায়গায় জায়গায় কাতরী পোকা বলে। হুগলী জেলার স্থানে স্থানে ইহার নাম "গোড়ে পোকা", বগুড়া জেলায় ইহার নাম "বেরি।" জলের টান হইলেই প্রায় কাতরী পোকা দেখা যায়। কাতরী পোকা বেশী হইলে পাতা খাইয়া গাছকে ডাঁটা সার করিয়া দেয়, কাজেই গাছ আর বাড়ে না। রকম রকম রঙের কীড়া গাছের পাতার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ চিত্রপটে ২ চিত্র কাতরী পোকার প্রজাপতি। দিনের বেলা প্রজাপতিকে বড় দেখা যায় না; গাছপালার আড়ালে কোন খানে লুকাইয়া থাকে। সন্ধ্যা হইলে বাহির হইয়া পাটের পাতার উপর ডিম পাড়ে; কখন কখনও পাতার নীচেও পাড়ে। এক জায়গায় অনেকগুলি ডিম গাদা করিয়া পাড়িতে দেখা যায় এবং গাদাটা কটা রঙের লোমে ঢাকা থাকে। ইহাতে মনে হয় এই রঙের কতকটা রেশম পাতার উপর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রায়ই ডিমের গাদাগুলি ডগের পাতার উপর থাকে। (ঐ চিত্রপটের ৩ চিত্র) এই সময় পাটের ক্ষেতে যাইয়া গাছের দিকে নজর করিয়া তাকাইলে ডিমের গাদা বা স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী স্তূপে প্রায় ৫০।৬০টী হইতে ২০০ শত পর্য্যন্ত ছোট গোল গোল ডিম থাকে। প্রত্যেক স্ত্রী প্রজাপতি প্রায় ২৫০ শত পর্য্যন্ত ডিম পাড়িতে পারে।

দুই তিন দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া খুব ছোট ছোট সবুজ রঙের কীড়া বাহির হয় এবং ডগের কচি পাতার উপরের পর্দ্দা বা ছাল খাইতে থাকে; কখনও কখনও ডগের পাতাগুলি মুখের লালা দিয়া জড়াইয়া একরূপ বাসা তৈয়ারী করিয়া তাহার ভিতরে থাকে। দুই তিনদিন এইরূপে থাকিয়া তাহার পর ছড়াইয়া পড়ে ও অপর অপর গাছের পাতা খাইতে থাকে। ছোট ছোট গাছের পাতা এই রকমে খাওয়াতে গাছগুলি কম জোর হয় এবং বেশী খাইলে প্রায়ই মরিয়া যায়। কীড়া প্রায় পাতার নীচে থাকিয়া খায় এবং যত বড় হয় গায়ের রঙ পাতার রঙের মত সবুজ হয় ও গায়ে লালচে বা কাল দাগ দেখা যায়। প্রায় সকালে ও সন্ধ্যার সময় কীড়ারা খায়, অপর সময়ে পাতার নীচে বা গাছের তলায় মাটির নীচে লুকাইয়া থাকে। যখন গাছের উপর থাকে কোনরূপ নাড়া পাইলে কেন্নো বা কেন্নাইদের মত পাক খাইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। কীড়ারা প্রায় ১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। তখন মাটির ভিতর ঢুকিয়া পুত্তলি হয়। পুত্তলি দেখিতে ৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রের মত, তবে ছোট। এক সপ্তাহের ভিতর প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং আবার বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে কাতরী পোকা প্রথম দেখিবার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে খুব বেশী হওয়া সম্ভব এবং তজ্জন্য সাবধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক। পাট গাছ একটু বড় হইলে বড় বেশী কিছু করিতে পারে না এবং বর্ষা আসিলে প্রায় পাট ছাড়িয়া আগাছা ও জঙ্গলে চলিয়া যায়। কাতরী পোকা প্রায় সম্বৎসরই, কোন আগাছা বা ফসলে দেখা যায়; কখনও কখনও নটে খাড়া ও মসূরাদি কলাই গাছেও অনেক হয়। মক্কা প্রভৃতিও খাইয়া থাকে।

কাতরী পোকার আচরণ দেখিয়া বোঝা যায় কি উপায় করা উচিত। প্রথমতঃ ক্ষেতে পাটের গাছ জন্মিতে আরম্ভ হইলেই যদি সন্ধ্যার পর প্রতি ৫ বিঘায় এক একটী আগুন জ্বালিতে পারা যায় তাহা হইলে প্রজাপতিরা

ডিম পাড়িবার আগেই আগুনে আসিয়া পুড়িয়া মরে। কতকগুলি কোনরূপে বাঁচিয়া যাওয়াই সম্ভব এবং পাট গাছে ডিম পাড়িতে থাকে; এই সময়ে পাট ক্ষেতে ডিমের গাদা দেখিতে পাওয়া যায়; ছোট ছোট ছেলেদের দ্বারা ডিমসমেত পাতা সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া দেওয়া ভাল। যেগুলি থাকিবে তাহাতে সম্ভবতঃ বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিবে না। যদি কোন বৎসর এই কীড়া বেশী হয়, তাহা হইলে পোকা ধরা থলে দ্বারা সমস্ত ছাঁকিয়া মারিয়া ফেলা উচিত। প্রথম হইতে সাবধান হওয়া উচিত, যেন অপর ক্ষেতে যাইতে না পায়। চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে প্রতীকার করা কঠিন হইয়া পড়ে।

পুষায় দেখা গিয়াছে কাত্রী পোকা পাট ও নীল অপেক্ষা লুসার্ণ বেশী ভালবাসে। যখন পাট ক্ষেতে থাকে তখন যদি লুসারন্ পায় তবে স্ত্রী প্রজাপতি লুসারন্ ছাড়িয়া পাটে ডিম পাড়িতে যায় না। পাট বুনিবার আগে কিছু লুসারন্ জন্মাইতে হয় এবং পাট যত দিন না বড় হয়, ততদিন লুসার্ণ ক্ষেতের মধ্যে রাখিয়া দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে লুসার্ণ হইতে ডিম ও পোকা বাছিয়া নষ্ট করিতে হয়।

ঘোড়া পোকা।

(৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৪ চিত্র)

পাট একটু বড় হইলেই প্রায় এই ঘোড়া পোকা দেখা দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পিঠ কুঁজো করিয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম ঘোড়া পোকা। নানা জায়গায় ইহার নানা নাম। বশিরহাটে ইহাকে “ডক্‌রা”, যশোহরে “ডোরাপোকা”, “জোরাপোকা” ও ঘোড়া পোকা” এবং খুলনায় “তিড়িং” বলে। অন্য অন্য জায়গায় ঘোড়া পোকা নামই চলিত।

পাটগাছের ডগের পাতা খাইয়াছে দেখিলেই বুঝা যায় যে ঘোড়া পোকা দেখা দিয়াছে। গাছের ডগা নষ্ট হওয়াতে ডগার নীচে হইতে নূতন ডাল গজায়, তাহাতে পাটের সূতা বেশী লম্বা হইতে পারে না। সেই জন্য পাটের কম দাম হইয়া থাকে। ঘোড়া পোকার প্রজাপতি ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৫ চিত্রে দেখান হইয়াছে। স্ত্রী প্রজাপতি দিনের বেলায় বাহির হয় না; পাতার নীচে বা অন্য কোথাও লুকাইয়া থাকে। সন্ধ্যা হইলেই উড়িয়া উড়িয়া ডগের কচিপাতায় ডিম পাড়ে। ডিম ছোট ছোট এবং পাতার উপর চেনা বড় কঠিন। একটী স্ত্রী প্রজাপতি প্রায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত ডিম দেয়। ডিম পাড়া শেষ হইলেই প্রজাপতিরা প্রায় মরিয়া যায়। দুই দিন বাদে ডিম হইতে ছোট ছোট সবুজ রঙ্গের খুব সরু কীড়া বাহির হয় এবং ডগের কচি কচি পাতার মধ্যে ছিদ্র করিয়া খাইতে থাকে। ক্রমে যত বড় হয় কীড়ার গায়ে লম্বা লম্বা গাঢ় সবুজ রঙের ডোরা কাটা দাগ দেখা যায় ও অনেক কাল কাল ছোট ছোট ফোঁটা হয়। ডিম হইতে বাহির হওয়া অবধি পিঠ্ কুঁজো করিয়া চলিতে থাকে। কোনরূপে বিরক্ত করিলে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িয়া যায়। এই জন্য কোথাও কোথাও ইহাকে তিড়িং বলে। কিছুক্ষণ বাদে আবার গাছের ডগাতে উঠে ও খাইতে থাকে। গাছের উপর যখন থাকে তখন পাতার রঙের মতন রঙ বলিয়া ইহাকে হঠাৎ চেনা যায় না। একটু ভাল করিয়া দেখিলে তবে নজরে পড়ে। গাছের ধারের পাতা কখনও কদাচ খায়, কিন্তু বেশীরভাগ ডগার সমস্ত কুঁড়ি ও কচি পাতা খাইয়া ফেলে বলিয়া গাছের বাড়িবার শক্তি কমিয়া যায় এবং নীচে হইতে নূতন ডাল বাহির হইতে থাকে। কীড়া সম্পূর্ণ বড় হইতে প্রায় দুই সপ্তাহ বা আরও কিছু বেশী সময় লাগে। সম্পূর্ণ বড় হইলে কীড়া আর খায় না, এবং গাছের তলায় যাইয়া মাটির নীচে পুত্তলি হয়। পুত্তলি ৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রের মত। প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। এইরূপে ৩।৪ বার পাটের উপর বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাকে পাট ছাড়া অন্য কোন ফসল আক্রমণ করিতে দেখা যায় না। পাট ফুরাইলে খুব সম্ভবতঃ ইহা মাটির মধ্যে কীড়া কিম্বা পুত্তলি অবস্থায় নিদ্রিত থাকে, আবার চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়।

যে বৎসর খুব বর্ষা হয় সে বৎসর প্রায় ঘোড়াপোকার দৌরাত্ম্য কম হয়, কারণ অনেকে পুত্তলি অবস্থায় থাকিবার উপযুক্ত জায়গা পায় না এবং সাধারণতঃ রোগ হইয়া মরিয়া যায়। যে বৎসর কম বৃষ্টি হয়, সেই বৎসরই ইহার বেশী অত্যাচার দেখা যায়।

ঘোড়াপোকা পাটে লাগিলে কীড়াদের খাবার কোনরূপে বিস্বাদ করিয়া দিতে হয় অথবা উহাদিগকে কোন উপায়ে ধরিয়া মারিতে হয়। গাছ যখন ছোট থাকে, তখন খুব হাল্কা পোকাধরা থলে যদি গাছের উপর দিয়া তাড়াতাড়ি চালান যায় তাহা হইলে বিশেষ উপকার পাওয়া সম্ভব। এইরূপ সকালে ও সন্ধ্যা বেলায় এক একবার টানিয়া থলের পোকাগুলি মারিয়া ফেলিলে খুব ভাল হয়। পাট যদি বেশী ঘন হইয়া না জন্মে, তাহা হইলে ছোট ছোট ছেলেদের দ্বারা কীড়াদিগকে ধরিয়া মারা যাইতে পারে। একটী হাঁড়িতে ১ ভাগ কেরাসিন ও ১০ ভাগ জল লইয়া যেখানে কীড়াটী বসিয়া থাকে তাহার পাশে রাখিয়া গাছ নাড়া দিলে কীড়া আপনিই লাফাইয়া জলে পড়ে ও শীঘ্র মরিয়া যায়। গাছ বড় হইলে একটা লম্বা দড়া কেরাসিন বা ফিনাইলে ডুবাইয়া যদি গাছের ডগের উপর দিয়া টানা যায়, তাহা হইলে ঐ কেরোসিন বা ফিনাইলের গন্ধ ডগের পাতাতে থাকিয়া যায়। তখন কীড়ারা বড় সুবিধা না দেখিয়া নীচের পাতাই খাইবে। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি না হওয়া সম্ভব। ডগার পাতা না খাইতে পাইলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না।

ঘোড়াপোকা মাটির মধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় অনেক দিন থাকে। অতএব ক্ষেতে বেশ করিয়া লাঙ্গল মই দিয়া মাটি উলটপালট করিয়া দিতে পারিলে অনেক মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

শুঁয়াপোকা।

সময়ে সময়ে পাট গাছে অনেক শুঁয়াপোকা দেখা যায়। পূর্ব্ববাঙ্গালায় ইহাদিগকে বিছা বলে। শুঁয়াপোকা অনেক রকমের আছে, কিন্তু পাটের উপর প্রায় দুই রকম রঙের দেখা যায়; এক হলদে ও অপর কাল। ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৮ চিত্রে প্রথমের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য শুঁয়া পোকা অপেক্ষা ইহাই বিশেষ অনিষ্টকারী। তিল, পাট, রাঙ্গা আলু, মাসকলাই প্রভৃতির অত্যন্ত ক্ষতি করে। পাইলে তামাক, শসা, শিম, রেড়ি প্রভৃতি খাইতে বিরত হয় না। অনেক আগাছাও খায়। ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৯ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে। স্ত্রী প্রজাপতি দিনের বেলা বড় দেখা যায় না। গাছের পাতার নীচে বা কোন লুকান জায়গায় বসিয়া থাকে, সন্ধ্যা হইলেই বাহির হয়। এক একটী স্ত্রী প্রজাপতি প্রায় ৫০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। পাতার কেবল নীচের পীঠেই ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমগুলিকে বেশ সুন্দর ভাবে পাতার উপর গায়ে গায়ে সাজাইয়া রাখে। একটী পাতার উপরেই ৫০০।৭০০ ডিম থাকিতে দেখা যায়। ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৬ চিত্র দেখ। ৩।৪ দিন পরে ডিম ফুটিয়া শুঁয়াপোকা বাহির হয়। ছোট অবস্থায় পোকাগুলির গা অল্প লম্বা লম্বা লোমে ঢাকা থাকে ও মাথাটা কাল রঙের থাকে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যত বড় হয় লোমগুলি বেশ সমস্ত গায়ের উপর সাজান হইতে থাকে (ঐ চিত্রপটে ৭ ও ৮ চিত্র দেখ) এবং রঙ বদলাইয়া পাঁশুটে হইতে থাকে। ডিম হইতে ফুটিয়া ছোট বেলায় একই গাছের উপর পাতার নীচে দলবদ্ধ হইয়া খাইতে থাকে। ছোট বেলায় কেবল পাতার নীচের পর্দ্দা বা ছাল খায়। ইহাতে খাওয়া পাতাগুলি সাদা দেখায়। একটা গাছের কিম্বা কাছাকাছি দুই তিনটা গাছের সমস্ত পাতাই প্রায় এই রকম করিয়া খায়। ক্ষেতের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দুর হইতেই এই রকম খাওয়া পাতা ও গাছ বেশ নজর হয়। এই সময় এই একটা কি দুইটা গাছ তুলিয়া পোকা সমেত মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই বিশেষ সুবিধা নচেৎ শুঁয়াপোকা বড় হইলে আর দলবদ্ধ হইয়া থাকে না। ক্ষেতের মধ্যে বা অন্যান্য ক্ষেতেও ছড়াইয়া পড়ে। তখন ইহাদিগকে আয়ত্ত করা কঠিন হইয়া পড়ে। বড় বেলায় ইহারা সমস্ত পাতা খাইয়া গাছ ডাঁটা সার করিয়া দেয়। একবার ছড়াইয়া পড়িলে বাছিয়া মারা ছাড়া আর উপায় নাই।

প্রায় দুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহ এইরূপ অবিশ্রান্ত খাইয়া ক্ষেতের ধারে ধারে বা জঙ্গলে মাটির ভিতর যাইয়া পুত্তলি হয়। পুত্তলি হইবার আগেই ইহাদের লোমগুলি গা হইতে খসিয়া যায়। গায়ের বড় বড় রোঁয়াগুলিকে মুখের লালার সহিত মিশাইয়া গুটী তৈয়ারী করে এবং এই গুটীর মধ্যেই পুত্তলি হয়। পুত্তলি ৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রের ন্যায়। ৮।১০ দিনের ভিতর প্রজাপতি গুটী কাটিয়া বাহির হয় এবং আবার ডিম পাড়ে।

বিছা বা শুঁয়াপোকা প্রায় সব রকম ফসলেই কম বেশী দেখা যায় এবং যেখানে বেশী হয় সেখানে ফসল প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। তবে ছোট বেলায় নজরে পড়িলে উপরি উক্ত উপায়ে মারিয়া ফসল বাঁচানই প্রকৃষ্ট উপায়। বেশী ঠাণ্ডা হইলে শীতকালে জমিতেই পুত্তলি অবস্থায় নিদ্রিত থাকে। আবার গরম পড়িলেই বাহির হয়। অতএব নিড়ানর মত মাটি উস্কাইয়া দিয়া অনেক পুত্তলি সংগ্রহ করা যায় এবং পাখী প্রভৃতিতে অনেক খাইয়া ফেলে।

শুঁয়া পোকারা সাধারণতঃ বন জঙ্গলের গাছের পাতা খাইয়া থাকে। তিল, পাট, শণ, মুগ কলাই প্রভৃতি যে সকল গাছের শুঁটী হয় সেই জাতীয় শুটীপ্রদ গাছের পাতাই অধিক ভালবাসে। গ্রামের পড়া বা পতিত জমির উপর ইহাদিগকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময় ইহাদিগকে জড় করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলে আর ফসলের ক্ষতি করিতে পারে না। কখনও কখনও দেখা যায় যে ইহাদের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে বনজঙ্গলের পাতায় আর ইহাদের আহার সঙ্কুলান হয় না। তখন খাবার অভাবে দলে দলে আসিয়া ফসলে পড়ে এবং সম্মুখে যাহা পায় তাহাই খাইয়া নিঃশেষ করিয়া দেয়। বর্ষাকালেই ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হয়, কারণ তখন অনেক খাবার পায়। (পরে কীড়াপালের বিবরণ দেখ)

আঁকিপোকা।

কখন কখন পাটগাছের পাতা বা গাছের ডগা শুকাইয়া যাইতে দেখা যায়। এই পোকা লাগিলে পাতাগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া যায় বলিয়া বোধ হয় ইহাদিগকে আঁকা বা আঁকিপোকা বলিয়া থাকে। (৬ষ্ঠ চিত্র পটের ১২ ও ১৩ চিত্র দেখ) এই চিত্রপটের ১০ চিত্রে যে সাদা পোকা দেখান হইয়াছে ইহা ভিতরে থাকিয়া খায় বলিয়া ডগ ও পাতা এইরূপে শুকাইয়া যায়। এই পোকা ঢেলে পোকা জাতীয়। ইহার পূর্ণাবস্থা এই চিত্রপটের ১১ চিত্রে দেখান হইয়াছে। পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পাতার উপর দেখান হইয়াছে সেইরূপে ছিদ্র করিয়া পাতা খায়, তাহাতে অনিষ্ট হয় না। তবে পাতার গোড়ার কীড়া সূতা কাটিয়া দেয় এবং ডগ খাইয়া শুকাইয়া দেয়। ডগ শুকাইলে গাছ আর বাড়ে না। ইহারা বেশী অনিষ্ট করে বলিয়া শুনা যায় নাই। সংখ্যায় বেশী হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা। ইহাকে চিনাইয়া দিবার জন্যই ইহার বিবরণ দেওয়া হইল। পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত পতঙ্গ ডগে বা পাতার গোড়ায় ছোট ছিদ্র করিয়া ছিদ্রের মধ্যে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া কীড়া খাইতে থাকে, তাহাতেই পাতা ও ডগ শুকায়। গাছের মধ্যেই পুত্তলি হয়।

যাহাতে বেশী না হইতে পারে সেই জন্য প্রথম হইতেই শুকান ডগা কাটিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। শুকান পাতা ছিঁড়িয়া লইলে প্রায় কীড়াকে পাওয়া যায় না, কারণ কীড়ারা প্রায় গাছের ছালের মধ্যে থাকে।

শুঁটীর পোকা।

৭ম চিত্রপটের ১ ও ৮ চিত্রে যে কাপাসের গুটীর কীড়া দেখান হইয়াছে ঠিক এই রকমের এক প্রকার কীড়া পাটের শুঁটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বীজ খায়। সংখ্যায় বেশী হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা কিন্তু প্রায় তত বেশী হয় না। ইহার আচরণ কাপাসের গুটীর কাল পোকার আচরণের ন্যায়। ঐ চিত্রপটের ৬ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে।

শণের পোকা।

শণে এক রকম শুঁয়াপোকা লাগে। ইহার রং কাল এবং গায়ে সাদা ও হলদে রঙের ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে। ৩৩ চিত্র দেখ। ৩৪ চিত্র ইহার প্রজাপতি। প্রজাপতির রঙ সাদা এবং ডানায় অনেক লাল লাল ফোঁটা আছে। ইহারা পাটের শুঁয়াপোকার জাতের, সেই রকমেই পাতার উপর ডিম পাড়ে। কীড়ারা সচরাচর পাতা খায়। তবে পাতা খাইয়া তেমন কিছুই লোকসান করিতে পারে না। শুঁটী হইলে কীড়ারা শুঁটীর ভিতর ঢুকিয়া বীজ খায়; বেশী হইলে লোকসান করিতে পারে। খেঁসারীর শুঁটীর পোকাও শণের শুঁটিতে লাগে। পাতার উপর যখন শুঁয়াপোকারা থাকিয়া খায় তখনই ইহাদিকে নষ্ট করা উচিত। তাহা হইলে বীজের ক্ষতি করিতে পারে না। পোকা ধরা শুঁটীতে ছিদ্র দেখা যায়।
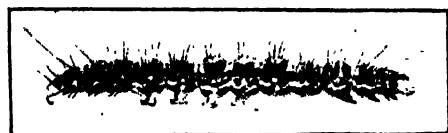
৩৩ চিত্র—শণের শুঁয়াপোকা।

৩৪ চিত্র—শণের শুঁয়াপোকার প্রজাপতি।

শনের ডাঁটায় এক রকম ছোট সুরুয়ের কীড়া হয়। কীড়া যেখানে খায়, সেই স্থানটী ফুলিয়া গিরার মত হয়। ছোট গাছের ডগ খায় এবং সেই জন্য ছোট গাছের ডগে এইরূপ গিরা বা আবের মত ফুলা দেখা যায়। আর গাছ প্রায় বাড়ে না। গিরার মত দেখিলেই গিরার একটু নীচে হইতে কাটিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে ইহা আর সংখ্যায় বাড়িতে পায় না। বড় গাছের ডাঁটার যে কোন স্থানে খাইতে পারে।

———০———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাপাস।

ফন্দেল পোকা বা চুঙ্গি পোকা।

কাপাস গাছের পাতা গুটাইয়া ফন্দেল বা চুঙ্গির মত করিয়া তাহার ভিতর থাকে বলিয়া ইহাকে ফন্দেল পোকা বা চুঙ্গি পোকা বলে। ৩৫ চিত্র দেখ। ইহা এক রকম সুতলী পোকা। ইহার প্রজাপতি ৩৬ চিত্রে দেখান হইয়াছে। দিনের বেলায় প্রজাপতিদিকে ক্ষেতের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা উড়িয়া উড়িয়া দিবারাত্রি সকল সময়েই পাতার উপর ডিম পাড়ে। এক একটী প্রজাপতি ২৫০।৩০০ শত ডিম পাড়ে। দুই তিন দিন পরে ডিম ফুটিলে কীড়ারা প্রথমে পাতার ছাল খায় এবং ৪।৫ দিন মধ্যে একটু বড় হইলে ঐরূপে পাতা গুটাইয়া উহার মধ্যে থাকে

৩৫ চিত্র—চুঙ্গি পোকার চুঙ্গি।

এবং পাতা খায়। পাতার গোড়া কাটিয়া এইরূপে গুটায় যে একটু মাত্র ডাঁটায় লাগিয়া থাকে। ১৬।১৭ দিন এই রূপে খাইয়া ঐ গুটান পাতার ভিতরেই পুত্তলি হয়। কখনও কখনও মাটিতে পড়িয়া শুকান পাতা ইত্যাদির মধ্যে পুত্তলি হয়। ৭।৮ দিন পরে প্রজাপতি বাহির হয়। শীতকালে ইহাদের বংশ বাড়ে না। আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন চৈত্র পর্য্যন্ত কীড়া অবস্থায় মাটির একটু নীচে বা পতিত শুকান পাতা ইত্যাদির ভিতর নিদ্রিত থাকে। কেহ কেহ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এইরূপে নিদ্রিত থাকে। শীত নিদ্রার পর শত্রু ইত্যাদির হাত এড়াইয়া সামান্যই প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং ডিম পাড়ে। এখন হইতে প্রায় এক মাস অন্তর অন্তর নূতন নূতন বংশ হয়। এইরূপে ভাদ্র আশ্বিন মাসে ইহাদের সংখ্যা খুব বাড়িয়া যায়।

৩৬ চিত্র—চুঙ্গি পোকার প্রজাপতি।
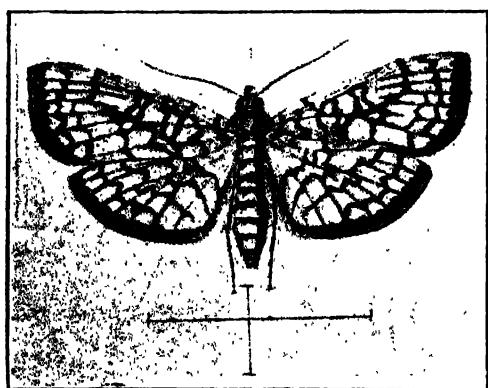
যখন গাছের পাতা চুঙ্গির মত হইতে দেখা যায় প্রথম হইতেই যদি এই চুঙ্গিগুলিকে ছিঁড়িয়া মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পোকার সংখ্যা বাড়িতে পায় না। চুঙ্গিগুলিকে হাঁড়িতে কিম্বা কাপড়ের থলেতে জড় করিতে হয়। ঝুড়িতে রাখিলে কীড়ারা ছিদ্রের ভিতর দিয়া পলাইতে পারে। ইহারা কাপাস ছাড়া ঢেঁড়স ও আরও অনেক জঙ্গলের গাছের পাতা খায়। যে গাছেই থাকে চুঙ্গির মত পাতা গুটাইয়া তাহার ভিতর থাকিয়া খায়।

কয়েক প্রকারের পরবাসী পোকা চুঙ্গি পোকাকে নষ্ট করে। যখন চুঙ্গি সমেত চুঙ্গি পোকা সংগ্রহ করা হয় সেই সঙ্গে অনেক পরবাসী পোকা ধরা পড়ে। যদি সুবিধা হয় তবে চুঙ্গিগুলিকে না পুঁতিয়া হাঁড়িতে রাখিয়া হাঁড়ির মুখটা মিহি জাল কিম্বা জালের মত কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলে প্রজাপতিরা ধরা থাকে কিন্তু পরবাসী পোকারা বাহির হইয়া যায় এবং আবার অনেক পোকা ধ্বংস করে।

শীতকালে ক্ষেতের সমস্ত শুকান পাতা ইত্যাদি জড় করিয়া পুড়াইয়া দিতে হয়। আর বেশ করিয়া লাঙ্গল মই দিয়া মাটি উলট পালট করিয়া দিতে হয়।

জাব পোকা।

গমে যেমন জাব পোকা লাগে কাপাসেও তেমনি জাব পোকা লাগে। পাতা ও কচি ডাঁটার উপর দলে দলে থাকিয়া রস চুষিয়া খায়। কাজে কাজেই গাছ রুগ্ন ও বেঁটে হইয়া যায় এবং গাছে যেমন কাপাস হওয়া উচিত তাহা হয় না। জাব পোকার বিস্তৃত বিবরণ সব গমের কথা বলিবার সময় দেওয়া হইয়াছে।

কাপাসী পোকা বা ঝাঙ্গা পোকা।

যাহারা কাপাস চাষ করে সকলেই এই পোকাকে চেনে। ইহারা গান্ধির জাতের পোকা। গান্ধির মত ইহারাও কাপাসের গুটীর ভিতর শুঁড় ঢুকাইয়া দিয়া গুটীর ভিতরের বীজের রস চুষিয়া খায়। গুটী না পাইলে পাতার ও কচি ডাঁটার রস খাইয়াও বাঁচিতে পারে। ছোট বেলায় যখন ডানা থাকে না তখন রং লাল এবং পীঠে সাদা সাদা ও বড় বড় ফোঁটা থাকে। বড় ঝাঙ্গারও রঙ লাল এবং পীঠে একটা ত্রিকোণ কাল দাগ থাকে ও পেটে সাদা সাদা দাগ থাকে। ৩৭চিত্রে ঝাঙ্গা পোকা কাপাসের গুটীর উপর রহিয়াছে দেখান হইয়াছে। ঝাঙ্গা পোকা কাপাস গাছের নীচে মাটিতে ৭০।৮০টা ডিম এক সঙ্গে পাড়ে। এক একটী ডিম দেখিতে ক্ষুদ্র হাঁসের ডিমের মত; রঙ প্রথমে সাদা থাকে, ফুটিবার সময় হল্‌দে হয়। এক একটী ঝাঙ্গা ৬০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ৬।৭ দিন পরে ডিম ফোটে। ছানা ঝাঙ্গারাও রস চুষিয়া খায়। ঝাঙ্গাদের ডানা সম্পূর্ণ বড় হইতে দেড় মাস হইতে আড়াই মাস সময় লাগে।

৩৭ চিত্র—কাপাসী পোকা বা ঝাঙ্গা পোকা।

গাছে যখন গুটী ধরে সেই সময়ে ঝাঙ্গারা খুব খাবার পায় এবং ইহাদের বংশ খুব বাড়িয়া যায়। কাপাস ছাড়া ইহারা শিমুল ও ঢেঁড়স খুব খায়। সাধারণতঃ বন জঙ্গলে থাকে, এবং কাপাস হইলে কাপাসের ক্ষেতে দেখা দেয়। ঝাঙ্গা পোকা পাতা কিম্বা ডাঁটা কাটিয়া খায় না। চাষীরা বুঝিতে পারে না কিসে ইহারা ক্ষতি করে।

(১) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহারা কাঁচা গুটীর বীজের রস চুষিয়া খায়। তুলা বীজের আঁস; অতএব বীজের রস খাইয়া দিলে কেমন করিয়া তাহার আঁস ভাল হইবে? (২) যে সমস্ত বীজের রস খাইয়া দেয় তাহা হইতে আর গাছ হয় না। কাপাসের বীজ হইতে এক রকম তেল বাহির হয় এবং তেল লইবার পর বীজের খৈল উত্তম সার হয়। ঝাঙ্গা যে বীজ চুষিয়াছে তাহা হইতে আর তেল পাওয়া যায় না। (৩) গুটী পাকিয়া ফাটিয়া যাইবার পরেও ঝাঙ্গা পোকারা ইহার উপরে থাকে এবং পাতলা বিষ্ঠার দ্বারা তুলাতে দাগ ধরাইয়া দেয়।

(৪) পাকা গুটী যখন ক্ষেত হইতে তোলা হয়, ইহাতে অনেক ঝাঙ্গার ছানা থাকিয়া যায়। পরে ছানারা চাপ পাইয়া মরিয়া যায় এবং ইহাদের রসেও তুলায় দাগ ধরে।

ঝাঙ্গাদের ডানা হইলেও প্রায় উড়ে না, কেবল চলিয়া বেড়ায়। গাছ নাড়া দিলে সমস্ত ঝাঙ্গা মাটিতে পড়িয়া যায়। ঝাঙ্গা পোকা লাগিলে একটা ছোট ঝুড়ি ও টিন বা হাঁড়িতে একটু কেরোসিন মিশ্রিত জল লইয়া ক্ষেতে যাইতে হয়। ঝুড়িটী গাছের নীচে রাখিয়া গাছ নাড়িয়া দিলে সমস্ত ঝাঙ্গা ঝুড়িতে পড়ে। তার পর ইহাদিগকে ঐ জলে ফেলিয়া মারিতে হয়।

গুটীর পোকা।

কাপাস গাছে গুটী ধরিলে গুটীর ভিতর দুই রকমের পোকা হয়। ইহারা দুইই সুতলী পোকা। একের রঙ কতকটা করিয়া কাল, সাদা ও হলদে দ্বারা চিত্রিত এবং গায়ে ছোট ছোট কাঁটা আছে। ৭ম চিত্রপটের ১ ও ৮ চিত্রে ইহাকে আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। এই চিত্রপটের ৪, ৫ ও ৭ চিত্রে ইহার প্রজাপতি আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। কোন প্রজাপতির রং সমস্তটাই সবুজ এবং কাহারও রঙ সাদা ও দুই ধারে দুইটী সবুজের ডোরা আছে। প্র াপতিরা দিনের বেলা গাছপাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকে; রাত্রে বাহির হইয়া গুটীর ও পাতার উপর এখানে ওখানে এক একটী করিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। ৪।৫ দিন পরে ডিম ফুটিলে কীড়ারা গুটী কিম্বা ফুলের কুঁড়ি পাইলে তাহার ভিতর ঢুকিয়া খায়। একটী গুটী হইতে বাহির হইয়া অপর অপর গুটীর ভিতর ঢোকে। বড় কীড়া গুটীর মধ্যে ঢুকিলে গুটির উপর একটা ছিদ্র দেখা যায় এবং প্রায় ভিতর হইতে কতকটা দানা দানা পোকার বিষ্ঠা বাহির হইয়া থাকে; এই চিত্রপটে ২য় চিত্র দেখ। যদি গুটী কিম্বা ফুলের কুঁড়ি না পায় তবে ডগের কচি ডাঁটার ভিতর ফুকর করিয়া ঢোকে ও খায়। ইহাতে ডগটা শুকাইয়া যায় (ঐ চিত্রপটের ৩ চিত্র দেখ)। সে গাছ আর বাড়ে না, আবার নীচে হইতে ডাল বাহির হয়। এই কীড়ারা ঢেঁড়সের ফল, ডাঁটা ও ফুলের কুঁড়ি ঠিক এইরূপে খায়। পেটারি প্রভৃতি ২।১টা জঙ্গলের গাছের ফলও খায়। ১৩।১৪ দিন খাইয়া বড় হইলে গাছের উপরেই হউক কি মাটিতেই হউক একটু লুকান জায়গায় গুটী প্রস্তত করিয়া তাহার ভিতর পুত্তলি হয়। ১০।১২ দিন পরে আবার প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়।

দ্বিতীয় পোকা লাল রঙের (৩৮ চিত্রের বাঁধারের ও নীচের চিত্র দেখ) ইহার প্রজাপতি ঐ চিত্রে উপরে ডানা ছড়াইয়া বড় করিয়া আঁকিয়া দেখান হইয়াছে, ইহা অনেকটা সুরুয়ের মত। এই পোকা কেবল কাপাসের গুটীর মধ্যে ফুকর করিয়া খায়; এবং গুটীর মধ্যেই পুত্তলি হইয়া থাকে। ইহারও ডিম, কীড়া ও পুত্তলি অবস্থার কাল প্রায় প্রথম পোকার সমান। দুই পোকাই কাপাসের গুটীর ভিতরের বীজ খায়। একটীর পর একটী করিয়া সব বীজগুলিই খায়। ইহাতে সমস্ত গুটীটাতেই ছিদ্র করিয়া দেয়। ছোট গুটী হইলে শুকাইয়া পড়িয়া যায়। বড় গুটী হইলে না পড়িতে পারে তবে তাহা হইতে প্রায় তুলা পাওয়া যায় না।

৩৮ চিত্র—কাপাস গুটীর লাল পোকা।

দুই পোকাই শীতকালে ফাল্গুন চৈত্র কিম্বা কখনও কখনও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকে। শীত নিদ্রার পর বাহির হইয়া ঢেড়স বা কোন আগাছার উপর সময় কাটাইয়া কাপাস হইলে তাহাকে

৭ম চিত্র পট।

কাপাসের গুটির পোকা।
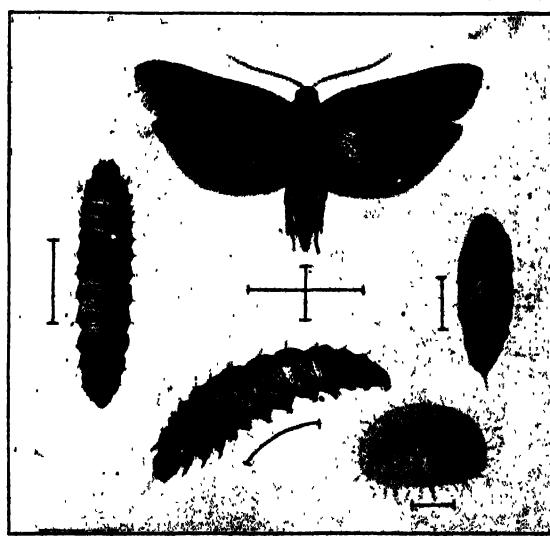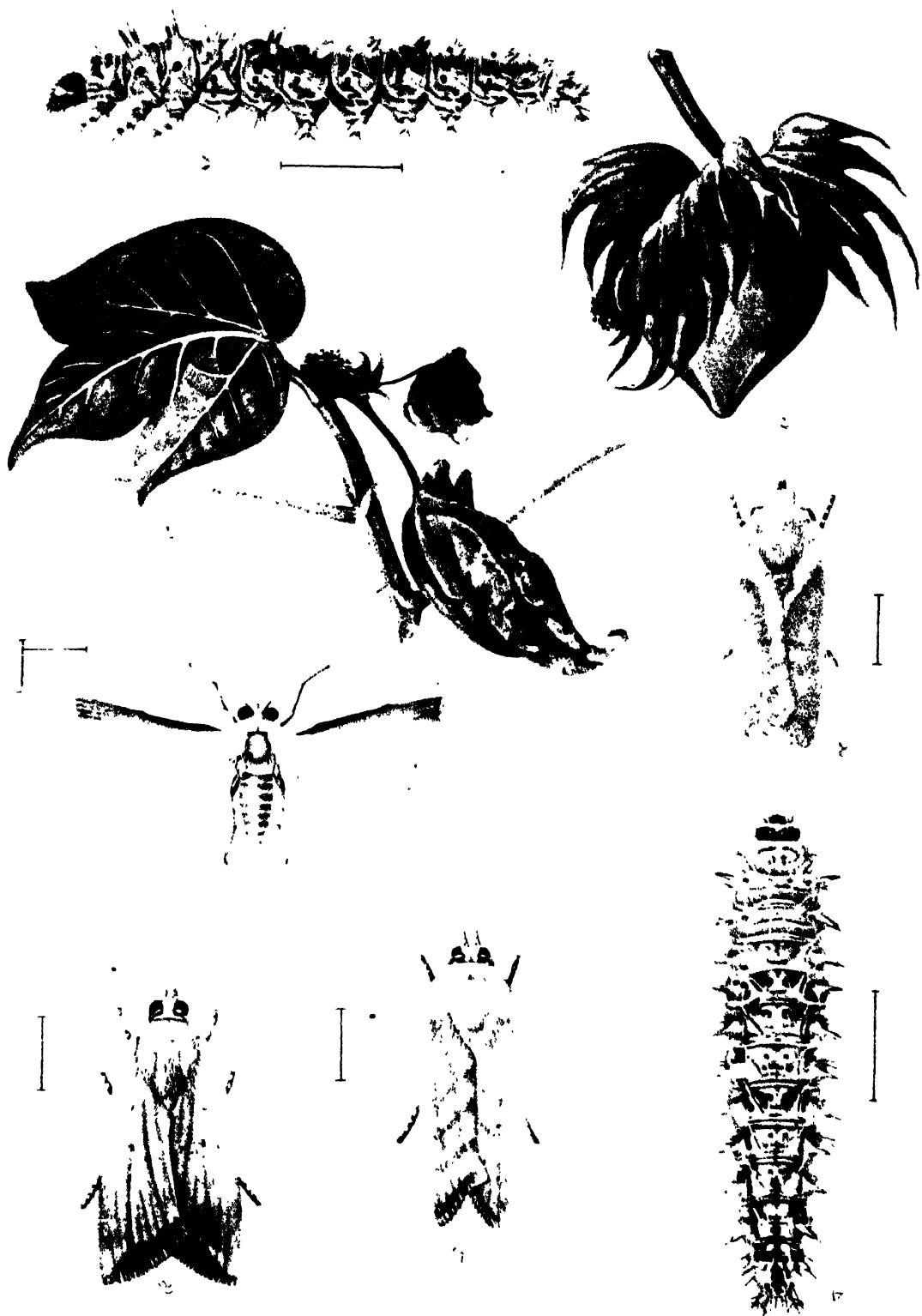
খাইয়া পড়ে। প্রথম কাল পোকা মাটিতে কিম্বা কোন লুকান জায়গায় শীতকাল কাটায় এবং লাল রঙের পোকা তুলার বীজের মধ্যে কীড়া অবস্থায় থাকে।

কাপাসের গাছের ডগ শুকাইতে আরম্ভ হইলে একটু নীচে হইতে ডগগুলি কাটিয়া পুড়াইয়া দিলে পোকার বংশ বাড়িতে পায় না। গাছের উপরে যে গুটী শুকাইয়া যাইতেছে কিম্বা যে গুটী মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত গুটীতে ছোট কিম্বা বড় যেমনই হোক ছিদ্র দেখা যায়, এই সমস্ত গুটী এবং ক্ষেতের শুকান পাতা ইত্যাদি উঠাইয়া মধ্যে মধ্যে জ্বালাইয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ করিলে পোকার সংখ্যা বাড়িতে পায় না এবং সামান্যই ক্ষতি হওয়ার সম্ভব। টেঁড়সের ফলে ও ডাঁটায় পোকা লাগিলে এইরূপে নষ্ট করা উচিত। শীতকালের পর যাহাতে আর তুলা হইবে না এমন পুরাতন কাপাস বা টেঁড়সের গাছ থাকিতে দিতে নাই। উঠাইয়া পুড়াইয়া দিতে হয়।

লাল রঙের পোকা শীত নিদ্রার সময় বীজের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে প্রায় পর বৎসর চাষের জন্য যে বীজ আবশ্যক হয় তাহাই রাখিয়া বাকী বীজ সার ডোবায় কিম্বা কোন জায়গায় ফেলিয়া দেয়। যে বীজ ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা মাটির মধ্যে পুঁতিয়া দেওয়া উচিত। পর বৎসর চাষের জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে বীজ বাছিয়া লওয়া উচিত।

মাটি ও গোবর সমান সমান মিশাইয়া জল দিয়া পাতলা কাদার মত করিয়া লও। এই কাদা বীজে মাখাইয়া হাত দিয়া ঘষিয়া দাও, যাহাতে বীজের তুলা সমস্ত বসিয়া যায়। এই বীজকে রোদ্রে না দিয়া ঠাণ্ডা জায়গায় শুকাও। শুকাইলে বালতীতে জল রাখিয়া এই জলে ফেলিয়া দাও। যে বীজ ডুবিয়া যাইবে তাহা ভাল। যাহা ভাসিবে তাহা খারাপ এবং ফেলিয়া দেওয়া উচিত। এই ভাল বীজ পুনরায় শুকাইয়া রাখিলে পর বৎসর পর্য্যন্ত বেশ থাকে। আর ইহাতে পোকাও থাকিতে পায় না।

ডাঁটার পোকা।

কখন কখনও ক্ষেতের মধ্যে কোন কোন গাছ একবারে শুকাইয়া যায়। এই শুকান গাছের ডাঁটা কাটিয়া দেখিলে ইহার ভিতর ৩৯ চিত্রে যে কীড়া বড় করিয়া দেখান হইয়াছে এই রকম সাদা কীড়া বরাবর কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে দেখা যাইবে। এই জন্যই গাছ শুকাইয়া যায়। কীড়া খাইয়া বড় হইলে ডাঁটার ভিতরেই পুত্তলি হয়।
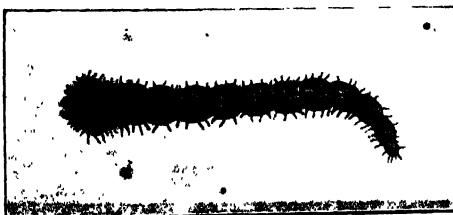
৩৯ চিত্র—কাপাস ডাঁটার কীড়া।

৪০ চিত্র—

৪১ চিত্র—

৪০ চিত্রে পুত্তলি বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। তার পর একটা ছিদ্র করিয়া পতঙ্গ হইয়া বাহির হয়। ৪১ চিত্রে পতঙ্গ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। পতঙ্গের রং চক্‌চকে তামার মত। পতঙ্গও পাতা খায়। তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয় না। কীড়াই গাছ মারিয়া দেয়।

এই রকম গাছ শুকাইলে চাষীরা হয়ত শুকান গাছ ক্ষেতেই রাখিয়া দেয় কিম্বা উঠাইয়া ক্ষেতের পাশে ফেলিয়া রাখে। ইহাতে আবার পতঙ্গেরা বাহির হইয়া অপর অপর গাছে ডিম পাড়ে। ক্ষেতের গাছ শুকাইলেই সেই গাছ শিকড় সহিত উঠাইয়া জ্বালাইয়া দিলে এই পোকার বংশ একবারে বাড়িতেই পায় না।

৪২ চিত্র—

বোম্বাই ও পঞ্জাব এবং ইজিপ্ট দেশীয় কাপাস গাছের ডাঁটায় ও ডালে এক রকম ছোট ছোট সাদা পোকা দেখা যায়। তাহারাও ডাঁটা কুরিয়া কুরিয়া খায়। যেখানে এই কীড়ারা খায় ডাঁটার সেই স্থানটী একটা বড় গিরার মত হইয়া ফুলিয়া উঠে। বেশী ঝড় হইলে এই গিরায় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেশী কাপাসের গাছে এই কীড়া প্রায় দেখা যায় না। পোকা লাগিলে যাহাতে ইহাদের বংশ না বাড়িতে পায় তাহাই করা উচিত। ৪২ চিত্রে এই কীড়ার পতঙ্গ দেখান হইয়াছে।

———o———

৮ম চিত্রপট।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ছোলা মসুর ইত্যাদি।

মাঠফড়িঙ।

বীজ হইতে আঁকুর বাহির হইলেই অনেক সময় মেটে ফড়িং বা মাঠফড়িঙ আঁকুর ও কচি কচি গাছ খাইয়া ক্ষেত উজাড় করিয়া দেয়, আবার নূতন করিয়া বীজ বুনিতে হয়। মাঠফড়িঙের কথা গমের পোকার বিবরণ দিবার সময় বলা হইয়াছে।

চোরা পোকা বা কাটুই।

বর্ষাকালে যে ক্ষেত জলে ডুবিয়া থাকে সেই ক্ষেতে প্রায় এই পোকার উপদ্রব বেশী দেখা যায়। এই পোকা যে ক্ষেতে লাগে সেই ক্ষেতের গাছগুলি হঠাৎ শুকাইতে দেখা যায়। কতক গাছ কাটা হইয়া হেলিয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে। কাটা ও খাওয়া পাতা এখানে ওখানে পড়িয়া থাকে, কখনও কখনও গাছ বা ডাল মাটির নীচে পোঁতা থাকিতেও দেখা যায়। এই কাটা শুকান গাছের গোড়ায় বা যেখানে গাছ কিম্বা ডাল পোঁতা থাকে সেই স্থানের মাটি উল্টাইলে ৮ম চিত্রপটের ১ চিত্রে যে সুতলী পোকা দেখান হইয়াছে এই রকম পোকা মাটির নীচে পাওয়া যায়। ইহাকে একটু নাড়া দিলে কেন্নো বা কেন্নাইয়ের মত কুণ্ডলি হইয়া পড়িয়া থাকে। এই পোকাই এই রকমে গাছ কাটিয়া নষ্ট করে। ইহাকে চোরাপাকা বা কাটুই বলে। ইহারা গাছের পাতা খায়; কিন্তু কেবল পাতা নষ্ট না করিয়া একেবারে গাছের গোড়া কাটিয়া দেয় বলিয়া অনিষ্ট খুব বেশী হয়। ঐ চিত্রপটের ৩ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে।

চোরা পোকা বর্ষার পরে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সচরাচর দেখা যায়। ইহারা সমস্ত রবি ফসলই এইরূপে নষ্ট করিতে পারে। স্ত্রী প্রজাপতি মাটির কাছের পাতা কিম্বা ডাঁটার উপর ডিম পাড়ে। ডিম ছোট ছোট পোস্তদানার মত। এক স্থানেই ৩০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়িতে দেখা যায়। একটী প্রজাপতি ৪০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। গরমের সময় ২।৩ দিন, শীতের সময় ৭।৮ দিন পরে ডিম ফুটিলে ছোট ছোট কীড়ারা পাতা খাইতে থাকে কিন্তু হাওয়াতে কিম্বা কোন রকমে গাছ নড়িলে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় এবং মাটিতে পড়িয়া আছে এমন কাঁচাই হউক আর শুকানই হউক পাতার নীচে লুকাইয়া থাকে। এই রকম পাতা খাইয়াই বাড়িতে থাকে। ১০।১২ দিন খাইয়া প্রায় ৷ ইঞ্চি হয়। তখন ইহারা দিনের বেলা মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া লুকাইয়া থাকে ও রাত্রে বাহির হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যাহা সম্মুখে পায় তাহাই খায়। তার পর যত বড় হয় উল্লিখিত ভাবে গাছ কাটিয়া দেয়। অনেক সময়েই কাটা গাছ গর্ত্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইয়া খায়। এই রকম গাছ মাটিতে পোঁতা বলিয়া মনে হয়। গাছের ডাঁটা মাটির নীচেও কাটে এবং মাটির উপরেও কাটে। মাটির নীচে কাটিলে প্রায়ই গাছ খাড়া থাকে ও শুকাইয়া যায়। দিনের বেলায় বাহিরে আসিলে শালিক্, কাক্ প্রভৃতি পাখীতে ধরিয়া খাইয়া ফেলে এই জন্যই বোধ হয় ইহারা মাটির নীচে লুকাইয়া থাকে। সাধারণ পাতা খাওয়া পোকার মত ইহারা গাছের উপর চলাফেরা করিতে পারে না। গরমের সময় প্রায় এক মাস এবং শীতের সময় প্রায় দেড় মাস খাইয়া কীড়া সম্পূর্ণ বড় হয়। তখন প্রায় ১৷৹ ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হয়; তখন মাটির কিছু নীচে যাইয়া পুত্তলি হয়। ৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে। গরমের সময় ১০।১২ দিন এবং শীতের সময় প্রায় ২০ দিন পরে পুত্তলি হইতে প্রজাপতিরূপে বাহির হয়। এ পর্য্যন্ত এই

পোকাকে পোস্ত, ছোলা, তামাক, আলু, বেগুন, কপি, মুলো, কাপাস ইত্যাদি ও অনেক শাক্ সবজী খাইতে দেখা গিয়াছে। কীড়ারা জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না সেইজন্য বর্ষাকালের ফসলে দেখা যায় না! তখন জঙ্গলাদির অগাছা খাইয়া জীবিত থাকে।

প্রথমেই যখন চোরা পোকা লাগিয়াছে দেখা যায় কাটা গাছের গোড়ার মাটি উল্টাইয়া কীড়াকে বাহির করিতে হয় এবং কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। ক্ষেত নিড়াইতে নিড়াইতে যখন মাটি উল্টান যায় কীড়ারা বাহির হইয়া পড়ে। কপি আলু প্রভৃতির ক্ষেত হইতে ইহাদিগকে এইরূপে বাছিয়া মারাই সহজ।

ক্ষেতে যদি জল ঢুকাইয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে কীড়ারা গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। তখন পাখীতেও অনেক খাইয়া ফেলে এবং ছোট ছোট ছেলেরা হাতে করিয়া বাছিয়া লইতে পারে।

কিম্বা নিম্নলিখিত উপায়ে বিষ খাওয়াইয়া চোরা পোকাদিগকে মারা যায়। সেঁকো বিষ অর্দ্ধসের এবং গুড় একসের আন্দাজ ৭ সের জলে একসঙ্গে গুলিতে হয়। এই জলে ১০ সের ভুসি বেশ করিয়া মাখাইতে হয়। এই বিষাক্ত ভুসির ছোট ছোট ডেলা পাকাইয়া ৫।৬ হাত অন্তর অন্তর ক্ষেতে রাখিতে হয়। বিষাক্ত ভুসি খাইয়া পোকারা মরে। এই পরিমাণ ভুসি ৪ বিঘা জমিতে দিতে কুলায়। রবিফসলের সময়েই কাটুই দেখা দেয়। অন্য সময় পড়া পতিতের উপর আগাছা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। যে পড়া পতিতের উপর ছোট ছোট আগাছা নাই সেখানে প্রায় কাটুইএর কীড়া থাকে না। কারণ শক্ত মোটা ডাঁটা ওয়ালা বড় গাছ হইলে ইহারা তাহাদের ডাঁটা কাটিয়া আহার সংগ্রহ করিতে পারে না। কয়েক প্রকারের কাটুই পোকা দেখা যায়। উপরে যাহার কথা বলা হইয়াছে ইহাই অপর সকলের অপেক্ষা বেশী ক্ষতি করে।

রবি ফসল বুনিবার পূর্ব্বে যদি ক্ষেতে আগাছা ঘাস ইত্যাদি হইয়া থাকে তবে তাহাতেও কাটুই লাগিতে পারে। যদি কোন ক্ষেতে কাটুই আছে জানা যায় তবে উহাতে ফসল লাগাইবার আগে কাটুইকে ধ্বংস করিতে হয়: ক্ষেতের সমস্ত আগাছা ঘাস ইত্যাদি উঠাইয়া ফেলিয়া দিয়া উপরি উক্ত উপায়ে ২।৩ দিন সেঁকো বিষ প্রয়োগ করিতে হয়। অন্য খাবার না পাইয়া সকলেই বিষ খাইয়া মরিয়া যাইবে। ভুসির বদলে কোন রকম ছোট ও নরম পাতা ওয়ালা গাছের ছোট ছোট ডাল পাতা সমেত সেঁকো বিষের জলে ডুবাইয়া দিতে পারা যায়।

কাতরী পোকা।

পাটে যে কাতরী পোকা লাগে তাহারা ফুল ধরিবার সময় মসুর ও খেসারী আক্রমণ করে। বেশী হইলে সমস্ত ফুল খাইয়া পাতাও খাইতে আরম্ভ করে। ছোলাতে প্রায় ইহাদিগকে দেখা যায় না। ইহাদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাছাড়া ফুল ধরিবার ৮।১০ দিন আগে হইতে রোজ রোজ ক্ষেতের মাঝে মাঝে আগুন জ্বালাইতে পারিলে অধিকাংশ প্রজাপতি আগুনে আসিয়া পুড়িয়া মরিবে। শীতকালে ক্ষেতের কাছে আগুন পোয়াইলে মন্দ হয় না। দুই কাজই হয়।

লেদা পোকা।

ছোলার শুঁটী হইলে ৮ম চিত্রপটের ৪ চিত্রের মত পোকা শুঁটীর ভিতর মুখ ঢুকাইয়া ভিতরের দানা খাইয়া দেয়। ইহা মটর, খেসারী ও অড়হরের শুঁটীও এইরূপে খায়। ইহাকে লেদা পোকা বলে। ঐ চিত্রপটের ৫ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে। অন্যান্য নিশাচর প্রজাপতির ন্যায় এই প্রজাপতি রাত্রে পাতার ও ফুলের এবং শুঁটীর উপর ২।১টা করিয়া প্রায় ৩০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ৩।৪ দিনের ভিতরে ডিম ফুটিলে ছোট কীড়ারা কচি কচি পাতা ও ফুল খায় কিম্বা কচি শুঁটীর ভিতর ঢুকিয়া দানা খায়। বড় হইলে কেবল শুঁটীর ভিতরের দানা

খায়। একটা পোকাতেই অনেক ছোলা নষ্ট করে। ২৫।৩০ দিন খাইয়া মাটীর ভিতর যাইয়া পুত্তলি হয়। আবার ১০।১২ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়।

ক্ষেতের ভিতর নজর রাখিয়া যাইতে যাইতে লেদা পোকা বেশ দেখা যায়; ইহাদিগকে ধরিয়া মারাই সহজ। অনেক সময় ছোলা গম তিসি প্রভৃতি প্রায় এক সঙ্গে রোয়া হয়। ছোলা গাছ দূরে দূরে থাকে। লেদা পোকা এক গাছের কাছেই অন্য গাছ পায় না। ইহাতে ক্ষতি কম হয়। আর অনেক গাছের মাঝে থাকে বলিয়া প্রজাপতিও খুঁজিয়া খুঁজিয়া সব গাছে ডিম পাড়িবার সুবিধা পায় না।

শুঁটীর পোকা।

লেদা পোকা একটু বড় হইলে আর শুঁটীর ভিতর না ঢুকিয়া কেবল মুখ ঢুকাইয়া দিয়াই বীজ খায়। ৮ম চিত্রপটের ৭ ও ৮ চিত্রে যে দুই রকমের প্রজাপতি দেখান হইয়াছে ইহাদের কীড়ারা লেদা পোকা অপেক্ষা ছোট ছোট সুতুলী পোকা। ৮চিত্রের প্রজাপতির কীড়া মুগ, বরবটী ও মটরের শুঁটীর ভিতর ঢুকিয়া যায় ও ভিতরে থাকিয়া সমস্ত বীজ খাইয়া ফেলে। যে শুঁটীতে পোকা ঢুকিয়াছে তাহার উপর একটা ছিদ্র দেখা যায় এবং এই ছিদ্র হইতে কতকটা পোকার বিষ্ঠা বাহির হইয়া শুঁটীর উপরেই লাগিয়া থাকে। কীড়া বড় হইয়া শুঁটীর ভিতরেই পুত্তলি হয়। প্রজাপতি দিনের বেলা ক্ষেতের মধ্যে উড়িয়া বেড়ায় এবং ক্ষেতে যাইলেই নজরে পড়ে। হাতজালে প্রজাপতি ধরিয়া মারা এবং যে শুঁটীতে কীড়া ঢুকিয়াছে সেই সমস্ত শুঁটী তুলিয়া পুড়াইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারা যায় না।

তেওড়া বা খেঁসারী কলাইএর পোকা সকলেই দেখিয়া থাকিবে। ৮ম চিত্রপটের ৭ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে এবং ৬ চিত্রে কি রকম করিয়া পোকা শুঁটীর ভিতর থাকে ও বীজ খায় দেখান হইয়াছে। প্রজাপতি দিনের বেলা প্রায় বাহির হয় না। রাত্রিতে শুঁটীর উপর ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়াই কীড়ারা শুঁটীর ভিতর ঢুকিয়া যায়। কীড়ারা তখন এত ছোট এবং যে ছিদ্র করিয়া ঢোকে তাহা এত সরু যে ছিদ্র নজরে পড়ে না। আর কিছুদিন পরেই ছিদ্র বুজিয়া যায়। সেই জন্যই মনে হয় শুঁটীর ভিতর পোকা কোথা হইতে আসিল। পোকা বড় হইয়া শুঁটীর ভিতরেই পুত্তলি হয়; এবং পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। এই পোকা মটর শুঁটী এবং শণের শুঁটীরও ভিতর ঢুকিয়া বীজ খায়।

তেওড়ার ফুল হইবার পর হইতে মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে আগুন জ্বালিলে অনেক প্রজাপতি পুড়িয়া মরে। ইহা ছাড়া অপর উপায় প্রায় কিছুই নাই।

পাতার পোকা।

৮ম চিত্রপটের ৯ চিত্রে পীঠে সাদা ডোরা কাটা, সবুজ রঙের, মাথার দিকে সরু যে কীড়া রহিয়াছে ইহারা মটর, খেঁসারীর পাতা, শালগম ও কপির পাতা, তিসির পাতা প্রভৃতি অনেক গাছের পাতা খায়। এক এক সময় ইহাদের সংখ্যা বড় বেশী হয় এবং পাতা খাইয়া অনিষ্ট করে। ইহাদের প্রজাপতি দুই রকমের হয়। এই চিত্রপটের ১০ ও ১১ চিত্রে দেখান হইয়াছে। প্রজাপতিরা সন্ধ্যার পর বাহির হয় এবং পাতার উপর এখানে ওখানে ডিম পাড়িয়া বেড়ায়। এক একটী প্রজাপতি ৪০০।৫০০ ডিম পাড়ে। শীতের সময় ৮ দিন ও গরমের সময় ৩ দিন পরে ডিম ফোটে। কীড়া কেবল পাতা খায় এবং শীতের সময় ৩০ দিন ও গরমের সময় ২০।২১ দিনে বড় হইয়া মুখের লালার দ্বারা পাতা জড়াইয়া এই পাতার মধ্যে পুত্তলি হয়। তার পর শীতের সময় ১৬ দিন ও গরমের সময় ৮ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়।

গাছ হইতে হাতে করিয়া বাছিয়া মারা ছাড়া আর অপর উপায় নাই।

ডাঁটার পোকা।

কখনও কখনও মটর গাছ, বিশেষতঃ ছোটবেলায়, একবারে শুকাইয়া যাইতে দেখা যায়। এক রকম ছোট মাছির কৃমি মাটির কাছে কিম্বা মাটির একটু নীচে ডাঁটার ভিতর সুরুঙ্গ কাটিয়া খায় বলিয়া গাছ শুকাইয়া যায়। এই মাছি ধরিলে প্রায় কিছুই করিতে পারা যায় না। গাছের গোড়ায় বেশী করিয়া মাটি দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে আবার গাছ তেজ করিয়া উঠে এবং শুঁটীও হয়। এই মাছিরা কেবল একবার মাত্র মটর আক্রমণ করে। মটর হইতে বাহির হইয়া আর মটরে লাগে না; অতএব শুকান বা অর্দ্ধ শুকান গাছ উঠাইয়া পুড়াইলে কোন ফল নাই। শুকাইবার পূর্ব্বে গাছের পাত হলদে হয়। যে সময়ে পাতা হলদে হইতে আরম্ভ করে, সেই সময় গাছ উঠাইয়া দেখিলে মাছির কীড়া বা পুত্তলি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আচরণ ধানের মাজরা মাছির আচরণের ন্যায়। যেখানে ইহার অত্যন্ত উপদ্রব, সেখানে আসল ফসলের পূর্ব্বে ফাঁদ-ফসলরূপে কিছু মটর জন্মাইতে হয়। মাছি লাগিলে পাতা হলদে হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিকড় সহিত উঠাইয়া ফাঁদফসল পুড়াইতে হয়। তাহা হইলে আসল ফসলের ক্ষতি হয় না। আবার দেখা গিয়াছে ইহারা প্রায় ছোট মটরের গাছ আক্রমণ করে না। বড় মটর বা কাবলী মটরের গাছ পাইলে কেবল ইহাই আক্রমণ করে।

৯ম চিত্রপট।

আকের পোকা।

Engraved and Printed
by The Calcutta Phototype

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আক্ বা ইক্ষু।

মাজরা।

মাজরা বা টোটা লাগিলে ধান, যব ও গমের যেমন গর্ভশীষটী শুকাইয়া যায়, আকেরও তেমনই ডগের মাজপাতাটী শুকাইয়া যায়। ইহা দেখিয়াই বলা যায় যে আকে টোটা, ধসা বা মাজরা লাগিয়াছে। এইরূপ শুকান মাজপাতা সহজেই টানিয়া উঠাইয়া লওয়া যায়। দেখা যায় থোড়টী পচিয়া গিয়াছে এবং নাকের কাছে ধরিলে ইহাতে একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। প্রায়ই এই পচাথোড়ে অনেক ছোট ছোট সাদা মাছির কীড়া থাকে। অনেকেই মনে করে এই কীড়াতে মাজপাতা শুকাইয়া দিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কয়েক প্রকারের প্রজাপতির কীড়া এইরূপে মাজপাতা খায় এবং তাহারা খাওয়াতে যখন থোড় পচিয়া যায় তখন মাছিরা ইহাতে ডিম পাড়ে। ছোট বেলায় মাজরা দ্বারা আক্রান্ত হইলে আক একেবারে মরিয়া যায় এবং তাহার নীচে হইতে চারিধারে আবার নূতন করিয়া গজা উঠে। ৯ম চিত্রপটে বাঁধারে ছোট আকের চিত্র দেখ। আক বড় হইলে যদি মাজরা লাগে তবে সে আক আর বাড়ে না এবং ডগের নীচে হইতে এক দুই বা ততোধিক নূতন ডাল বাহির হয়। ইহাতে আকের মাথায় ঝাড় হয়। ৯ম চিত্রপটে বড় আকের চিত্র দেখ। যাঁহারা আক্ চাষ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

কয়েক প্রকার প্রজাপতির কীড়াতেই এইরূপে আকের ক্ষতি করে। ইহারা কীড়া অবস্থাতে সকলেই সুতলী পোকা। ইহাদের জীবন বৃত্তান্ত ও আচরণ বিহার অঞ্চলে যেমন দেখা যায় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১ম—প্রথম মাজরার প্রজাপতি ৯ম চিত্রপটের ২ চিত্রে দেখান হইয়াছে। স্ত্রী প্রজাপতি কিরূপে আকের পাতার উপর ডিম পাড়ে ঐ চিত্রপটের ১ চিত্রে দেওয়া হইয়াছে। এক একটী এইরূপ ডিমের স্তূপে ৮০।৯০টী ডিম থাকে। এক একটী ডিম পোস্তদানার মত। ডিমের স্তূপটী কটা রঙের লোমে ঢাকা থাকে। ১০।১২ দিন মধ্যে ডিম ফোটে। ক্ষুদ্র কীড়ারা ডিম হইতে বাহির হইয়া আকের মাজপাতাটীর মধ্যে দিয়া খাইতে খাইতে ডাঁটার অগ্রভাগে ফুকর করিয়া প্রবেশ করে। ২১।২২ দিন এইরূপে খাইয়া প্রায় পৌনে ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহার রং সাদা। তারপর ১০।১২ দিন ঐ ফুকরের মধ্যেই পুত্তলি হইয়া থাকিয়া প্রজাপতিরূপে বাহির হয়। ঐ চিত্রপটের ৫ চিত্রে পুত্তলি রহিয়াছে। আবার দুই তিন দিনের মধ্যেই ডিম পাড়ে। ধানের মাজরার মত ইহাও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আকের অগ্রভাগে ফুকরের মধ্যে কীড়া অবস্থায় শীতনিদ্রায় কাটায়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে আক ছোট থাকে এবং শীতনিদ্রা হইতে বাহির হইয়াই তাহার উপর ডিম পাড়ে।

২য়—ধানের দ্বিতীয় মাজরাই আকের দ্বিতীয় মাজরা। শীতনিদ্রা হইতে বাহির হইয়া ফাল্গুন চৈত্র মাসে ছোট আকের উপর ডিম পাড়ে। ৯ম চিত্রপটের ৬ চিত্রে ইহার ডিমের সারি ও ৪ চিত্রে কীড়া এবং ৭ চিত্রে প্রজাপতি দেখান হইয়াছে। ইহার আক্রমণের ফলেও প্রথম মাজরার মত মাজটী শুকাইয়া যায়। আক বড় হইলে ইহা আর ডগের মাজপাতাটী খায় না। তখন কাণ্ডের মধ্যে ফুকর করিয়া খাইতে থাকে। ইক্ষু অপেক্ষা মক্কা ইহার প্রিয়তর খাদ্য। মক্কা পাইলে প্রায় আক আক্রমণ করিতে দেখা যায় না। বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই মক্কা জোয়ার প্রভৃতির চাষ নাই। যেখানে আছে সেখানেও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের পূর্ব্বে জন্মে না। অতএব বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ইহা কেবল আকই খাইতে থাকে। তারপর আক ছাড়া ধান, মক্কা জোয়ার প্রভৃতি আক্রমণ করে।

৩য়—ধানের তৃতীয় মাজরা আকেরও তৃতীয় মাজরা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহা যব গমেরও মাজরা। ৫ম চিত্রপটের ২ চিত্রে ইহার কীড়া, ৩ চিত্রে ইহার পুত্তলি এবং ১ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে। ইহা পাশ দিয়া ফুকর করিয়া আকে প্রবেশ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় মাজরার মত ইহারও আক্রমণের ফলে ছোট আকের মাজপত্রটী শুকাইয়া যায়। আক বড় হইলে দ্বিতীয় মাজরার মত ইহা কেবল কাণ্ডের মধ্যেই ফুকর করিয়া খাইতে থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যব গম ফুরাইলে ইহা ইক্ষু আক্রমণ করে।

৪র্থ—৯ম চিত্রপটের ৩ চিত্রে যে কীড়া দেখান হইয়াছে এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট নীল রঙের এক কীড়া আকের চতুর্থ মাজরা। ইহার প্রজাপতি দেখিতে দ্বিতীয় মাজরার প্রজাপতির মত। ইহার রং নীল বলিয়া সহজেই অন্যান্য মাজরা হইতে পৃথক্ করা যায়। ইহা ফাল্গুন চৈত্র মাসে প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়া আক আক্রমণ করে এবং প্রায় জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত আক খায়। তখন আক বড় হইয়া যায় এবং তখন হইতে এই ৪র্থ মাজরা আবার ফাল্গুন চৈত্র পর্য্যন্ত প্রায় ৯ মাস কীড়া অবস্থায় নিদ্রিত থাকে। আকের কাণ্ডের মধ্যেই প্রায় নিদ্রিতাবস্থা কাটায়।

৫ম—৯ম চিত্রপটের ৩ চিত্রে ছোট আকের কাণ্ডের মধ্যে যে কীড়া দেখান হইয়াছে ইহাকে প্রকৃত পক্ষে মাজরা না বলিয়া "ধসা" বলা যাইতে পারে। উপরি লিখিত চারি প্রকার কীড়ার আক্রমণ জন্য আকের মাজপত্রটী শুকাইয়া যায়। কিন্তু ইহার আক্রমণে সমস্ত আকটীই শুকাইয়া বা ধ্বসিয়া যায়। ডিম হইতে বাহির হইয়া প্রায় মাটির কাছে পাশে ফুকর করিয়া আকের গজায় বা কাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে এবং খাইয়া খাইয়া নীচে দিকে মূল পর্য্যন্ত যায়। ইহা মূলই খায় এবং মূলেই থাকে। ইহার আক্রমণ জন্য কখন কখনও আক একেবারে না শুকাইয়া রুগ্ন ও ক্ষীণ ও খর্ব্বাকৃতি থাকিয়া যায়। ইহাও প্রথম তিন প্রকার মাজরার মত কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন চৈত্র পর্য্যন্ত মূলের মধ্যেই শীতনিদ্রায় কাটায়। বৎসরের অবশিষ্ট কয় মাস এইরূপে আকের অনিষ্ট করে। গোড়ায় উই লাগিলেও সমস্ত গাছ শুকাইয়া যায়। গোড়া হইতে একটু মাটী সরাইয়া দিলে উইএর খাওয়া দেখা যায়। এখন মাজরা ও ধসার আচরণ দেখিয়া কি করিলে তাহাদের সংখ্যা কমান যাইতে পারে, সহজেই অনুমান করা যায়।

তৃতীয় মাজরাকে যব গমের সহিত বিনাশ করা উচিত। তাহা হইলে আকে তাহাদের সংখ্যা কম হইবে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে সকলেই আক আক্রমণ করে। সেই সময় আকের উপর বিশেষ নজর রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম মাজরার ডিম ও প্রজাপতি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বেশ দেখা যায়। ২৩ চিত্রে যে হাত জালের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা একটী বালক অনায়াসেই এই প্রজাপতিকে ধরিয়া মারিতে পারে এবং পাতার উপর ডিম খুঁজিয়া একটু পাতা সমেত ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া দিতে পারে। প্রথম ডিম পাড়িবার প্রায় ১৫ দিন পরে আক্রান্ত আকের মাজপাতা শুকাইতে দেখা যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ছোট বেলায় মাজপাতা শুকাইলে আর আক বাড়ে না, মরিয়া যায় এবং তাহার নীচে হইতে নূতন করিয়া গজা উঠে। যাহার মাজপাতাটী শুকাইয়া গিয়াছে এমন আক কাটিয়া দিলেও সেই রকমই নূতন গজা হইবে। অতএব যেমন মাজপাতা শুকাইতে দেখা যায় তখনই গোড়া হইতে কাটিয়া পুড়াইয়া দিতে হয় তাহা হইলে মাজারার ধ্বংস হয়। আক যখন বড় হইয়া উঠে তখন আর ডিম সংগ্রহ করার সুবিধা হয় না। কিন্তু তখনও মাজপাতা শুকাইতে দেখিলে সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া পুড়াইয়া দিতে হয়। কত নীচে কাটিয়া পুড়াইলে মাজরার ধ্বংস হয় জানিবার এক উপায় আছে। ডগের কতক অংশ কাটিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যদি পোকা খাওয়ার দাগ দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে মাজরা আকেই থাকিয়া গিয়াছে। তখন আরও একটু নীচে কাটিতে হইবে। হাতোয়ার শ্রীযুক্ত মেকেঞ্জি সাহেব একটী বালক রাখিয়া ছয় বিঘা আকের এইরূপে তদ্বির করিয়া দেখিয়াছিলেন। যে ক্ষেতের তদ্বির করা হয় নাই তাহা অপেক্ষা এই ক্ষেতে দেড় গুণ বেশী আক পাইয়াছিলেন।

আক ও ধানের দ্বিতীয় মাজরা আক অপেক্ষা মক্কা বেশী ভালবাসে। অতএব আকের মাঝে মাঝে যদি মক্কা লাগান যায় ইহা প্রায় আক ছাড়িয়া মক্কা আক্রমণ করিবে। কিন্তু যখনই মক্কার গাছে কীড়া দেখা যাইবে সঙ্গে সঙ্গে গাছ কাটিয়া পুঁতিয়া কিম্বা পুড়াইয়া নষ্ট করিতে হইবে। এইরূপ না করিলে ফল বিপরীত হইবে এবং মাজরা সংখ্যায় বেশী হইয়া আক আক্রমণ করিবে।

আক যখন বড় হয় তখন কেবল যাহার মাজপাতা শুকাইয়া গিয়াছে এমন ডগা কাটিয়া পুড়ান ছাড়া আর কিছুই করিতে পারা যায় না। ক্ষেত হইতে আক কাটিয়া লইবার সময় নিম্ন লিখিত কয়টী বিষয়ে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। শীতকালেই প্রায় সর্ব্বত্র আক কাটা হয়। সেই সময় মাজরা ও ধসা শীত-নিদ্রায় অভিভূত থাকে। (১) আক কাটিতে কাটিতে যে সমস্ত আকের মাথায় ঝাড় হইয়াছে দেখা যাইবে সেই ঝাড় কাটিয়া ধ্বংস করা উচিত। ইহাতে অনেক মাজরা মরিবে। কোন কোন স্থানে রাত্রিতে আক কাটা হয় এবং ক্ষেতের মাঝে মাঝে আগুন জ্বালিয়া যেমন কাটা হয় সঙ্গে সঙ্গেই আকের পাতা ও পরিত্যক্ত আক ডগা ইত্যাদি পুড়াইয়া দেওয়া হয়। এই প্রথা অতি সুন্দর। সেই সময় লক্ষ্য করিয়া মাজরা দ্বারা আক্রান্ত ডগা সমস্ত পুড়াইয়া ফেলা উচিত। (২) ক্ষেতে পরিত্যক্ত আক কি আকের টুকরা ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। (৩) আক কাটিয়া লইবার পরেই জমিতে চাষ দিয়া শিকড় সমেত আকের গোড়া উঠাইয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা ধসার বিনাশ সাধন করা হইবে। (ধানের মাজরার বিবরণ দেখ)।

কোথাও কোথাও আকের কাণ্ড কাটিয়া পুঁতিয়া আকের চাষ করা হয় এবং কোথাও কোথাও আকের ডগা হইতে চাষ করা হয়। যাহাই হউক পোকা লাগা ডগা কিম্বা আক পুঁতিয়া চাষ করা উচিত নয়। (ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠকগণ "এগ্রিকালচারেল জারনেল অব ইণ্ডিয়া" প্রথম ভাগ ২য় সংখ্যা এবং তৃতীয় ভাগ ২য় সংখ্যায় আকের ধসা ও মাজরা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাইবেন)।

উই ও অন্যান্য পোকা।

মাজরা ছাড়া উই অনেক আক নষ্ট করে। উই লাগা গাছ একেবারে গোড়া হইতে শুকাইয়া যায়। মাজরা লাগিলে আকের আবার নূতন গজা বাহির হইতে পারে; কিন্তু উই লাগিলে গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়। উড়িষ্যা অঞ্চলে উইয়ের বড় বেশী উপদ্রব; উঁচু জমিতে কিছুতেই আক হইতে দেয় না; খুব বিশেষ জলাভাব না হইলে উই হইতে আকের লোকসান হইতে পায় না। রোপণের সময় যদি অর্দ্ধসের আন্দাজ তুঁতে গুঁড়াইয়া ১ সের জলে গুলিয়া ডগা ও টিকলি এই জলে ডুবাইয়া রোয়া যায় তাহা হইলে এই ডগা বা টিক্‌লিতে প্রায় উই লাগে না। তুঁতের জল সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, একদিন পরে ইহার আর তেজ থাকে না। উইয়ের বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেখ। আকের উপর আরও অনেক পোকা দেখা যায় কিন্তু তাহা হইতে কোনরূপ ক্ষতি শুনা যায় না। দুই এক রকম শুঁয়াপোকা আছে যাহা আকের পাতা খায়। গান্ধির জাতের দুই রকম পোক আকের রস খায়। এক প্রকার পোকা ৪৩ চিত্রে ডানা ছড়াইয়া দেখান হইয়াছে; ইহার

৪৩ চিত্র—আকের পাতার শোষক পোকা।

রঙ শুকান খড়ের মত এবং মাথা শুঁড়ের মত লম্বা। ৪৪ চিত্রে ইহার ছানা দেখান হইয়াছে। অপর পোকা ৪৫ চিত্রে দেখান হইয়াছে।
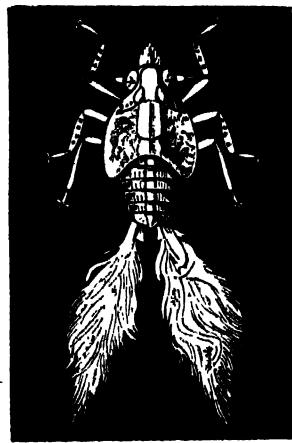
৪৪ চিত্র—আকের পাতার শোষক পোকা।
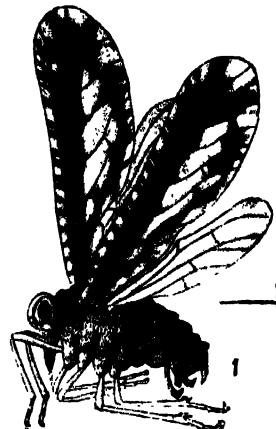
৪৫ চিত্র—আকের পাতার শোষক পোকা।

বাঙ্গালা দেশে খুব অল্পই মক্কা, জোয়ার প্রভৃতির চাষ হয়। ইহার চাষ বেশীর ভাগ উত্তর পশ্চিম ও বেহার অঞ্চলে দেখা যায়। এখানে ইহার এত অল্প চাষ যে ইহাতে পোকা লাগিলেও লোক নজর করে না।

আকের ও ধানের ২য় ও ৩য় মাজরা পোকা প্রায় মক্কা জোয়ারে লাগে এবং মক্কা গাছ পাইলে আকের অনিষ্ট কম হইতে পারে। ইহা ছাড়া মক্কাতে পাতা খাওয়া পোকাও দেখা যায়; কিন্তু তাহা হইতে বিশেষ ক্ষতি দেখা যায় না। এই পাতা খাওয়া পোকা পাতা উল্টাইয়া তাহার ভিতর থাকে ও বেশীর ভাগ পাতার পর্দ্দা খায়। এই রকম পোকা কখনও কখনও আকের পাতাতেও দেখা যায়।

আঁইস পোকা।

আকের পাতায় কখনও কখনও কাল কাল ডিম্বাকৃতি অনেক ছোট ছোট আঁইসের মত ফোঁটা দেখা যায়। ইহারা এক রকম পোকা এবং ইহাদিকে আঁইস পোকা বলা যায়। ৪৬ চিত্রের নীচে ডানধারে এই রকম একটী ফোঁটা আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। যদি ভাল করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে ইহার চারিধারে সাদা ঝালর আছে দেখা যাইবে। ঐ চিত্রের নীচে, বাঁধারে এবং উপরে ডানধারে ঝালর ওয়ালা ফোঁটা বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ৪৭ চিত্রে অনেক এই রকম ফোঁটা পাতার উপর রহিয়াছে। যদি কেহ লক্ষ্য করিয়া দেখে, তবে দেখিবে যে এই আঁইসের

৪৬ চিত্র—আকের পাতার আঁইস পোকা।

মত ফোঁটার ভিতর হইতে খুব ছোট প্রজাপতির মত চারিটী ডানা ওয়ালা পতঙ্গ বাহির হয়। এই রকম

৪৭ চিত্র—আঁইস পোকা।
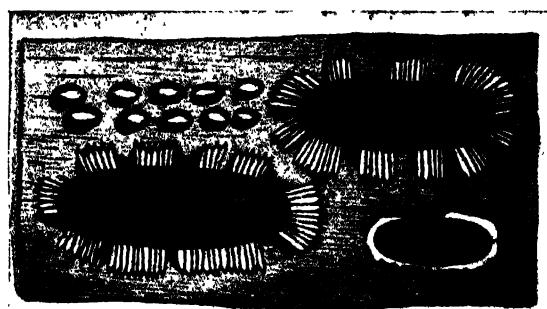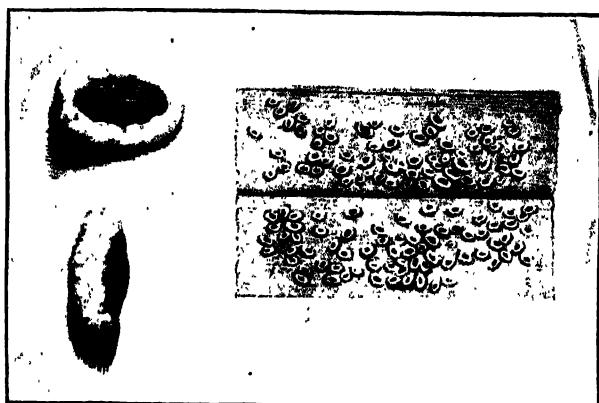
এক প্রকার পতঙ্গ ৪৮ চিত্রে বড় করিয়া আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। এই রকম পতঙ্গ এই সমস্ত আঁইসের সঙ্গে পাতার উপর বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহারা একটু একটু উড়িয়া পাতার এখানে ওখানে বসে কিম্বা অন্য পাতায় বা কাছের গাছের পাতায় বসে। এই পতঙ্গের গান্ধির মত একটা ছোট শুঁড় আছে। ইহারা গান্ধির জাতের এবং পাতার রস চুষিয়া খায়। পতঙ্গেরা পাতার উপর ছোট ছোট অনেক ডিম এক সঙ্গে পাড়ে। ডিম এত ছোট যে শুধু চোখে দেখা যায় না। ডিম হইতে ছোট ছাতরা পোকার মত পোকা বাহির হয়। ইহাদেরও একটী সরু শুঁড় আছে। ডিম হইতে বাহির হইয়া ইহারা পাতার ভিতর এই শুঁড় ঢুকাইয়া দেয় এবং এক জায়গায় বসিয়া রস চুষিয়া খাইতে থাকে। একটু বড় হইলেই ইহারা পাতার উপর কাল কাল ছোট আঁইসের মত বোধ হয়।
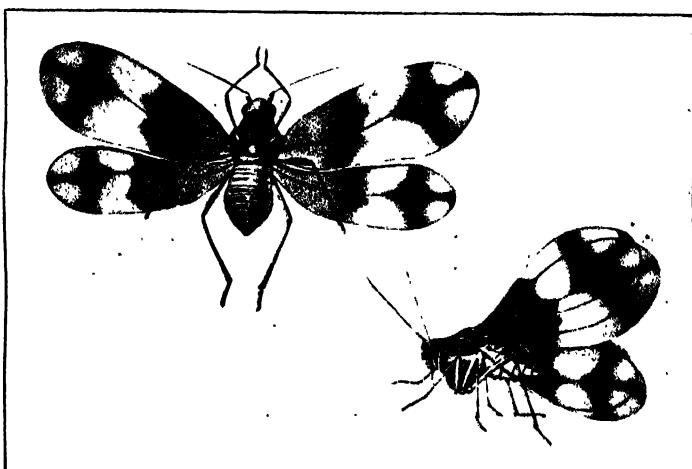
৪৮ চিত্র—আঁইস পোকার পতঙ্গ।

আঁইস পোকা পাতায় দুই দশটা হইলে কোন ক্ষতি নাই। ইহারা খুব ছোট এবং খুব কমই রস খাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের শীঘ্র শীঘ্র বংশ বাড়ে এবং একবার হইলে কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত গাছের সমস্ত পাতা ছাইয়া ফেলে। কাজে.কাজেই গাছ কম তেজী হইয়া যায় এবং কখনও কখনও পাতা শুকাইয়া যায়। যে পাতায় আঁইস পোকা লাগে সেই পাতা প্রথম হইতেই যদি নজর রাখিয়া কাটিয়া পুড়াইয়া দেওয়া হয় তবে ইহাদের বংশ বাড়ে না। ইহারা একবারে সমস্ত ক্ষেতে লাগে না ; কিন্তু যদি প্রথম হইতেই নজর না রাখা যায় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ক্ষেত ছাইয়া ফেলে। তখন ক্ষেতের সমস্ত পাতা কাটিয়া পুড়ান ছাড়া আর উপায় থাকে না।

তামাক ও রেড়ির পাতার নীচে পীঠে একরকম হলদে রঙের আঁইস পোকা হয়। বেশী হইলে পাতা শুকাইয়া পড়িয়া যায়। প্রথমে দুই একটা গাছের পাতায় লাগিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু প্রথম হইতে নজর রাখিয়া এই পাতা কাটিয়া পুড়াইলে ভয় থাকে না।

আঁইস পোকারা পাতার রস চুষিয়া খায় এবং ইহাদের শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু একরকম মধু বাহির হয়। অনেক ছোট ছোট পিঁপড়ে এই মধুর লোভে ইহাদের কাছে আসে। পাতার উপরে এই মধু পড়িলে ইহার উপর এক রকম কাল কাল ছাতা বা ঝাপুন্দা ধরে। অনেকে এই ছাতাকে পাতার রোগ মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক এই ছাতা হইতে পাতার প্রায় কিছুই ক্ষতি হয় না।

ছাতরার মত কেরাসিন মিশ্রণ কিম্বা ক্রুড্ আয়িল ইমল্সন বা স্যানিটারী ফ্লুইডের জলে ঝারি পিচকারী বা দমকলের দ্বারা আঁইস পোকার গা ভিজাইয়া দিতে পারিলে আঁইস পোকা মরিয়া যায়।

ছাত্‌রা।

আক গাছের ডাঁটার উপর এক এক সময় জল মিশান ফিকে আল্‌তার রঙের মত রঙওয়ালা ছোট ছোট নরম পোকা এক জায়গায় দলে দলে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। পাতার খোলের ভিতর অনেক এই রকম পোকা ঢাকা থাকে। বর্ষাকালে অনেক জিনিষে যেমন ছাতা বা ভাপুন্দা প'ড়ে ইহাদের দেহ সেই রকম সাদা গুঁড়া জিনিষে ঢাকা থাকে। সেই জন্য ইহাদিকে ছাতরা পোকা বলা যায়। অনেক ছাতরা পোকার গায়ে এত বেশী এই সাদা গুঁড়া থাকে যে হঠাৎ দেখিলে ইহাদিগকে কতকটা সাদা তুলা বলিয়া বোধ হয়।

ছাতরা পোকাদের একটী খুব সরু শুঁড় আছে। এই শুঁড় পাতার বা ডাঁটার ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া এক জায়গায় বসিয়া রস চুষিয়া খায়। ইহাদের ছয়টী ছোট ছোট পা আছে। কখনও কখনও এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় সরিয়া বসে। যে খানেই বসুক রস চুষিয়া খায়।

স্ত্রী ছাতরার কখনও ডানা হয় না এবং চেহারা বদলায় না। পুং ছাতরা ডিম হইতে ফুটিয়া কিছুদিন স্ত্রী ছাতরার মতই থাকে। তার পর পুত্তলি হয়। তখন ইহার চেহারা বদলাইয়া যায়। পরে দুইটী ডানাওয়ালা পতঙ্গ হইয়া বাহির হয়। ইহারা স্ত্রী ছাতরার মধ্যে উড়িয়া বেড়ায় ও সঙ্গম করে, তার পর মরিয়া যায়। সঙ্গমের পর স্ত্রী ছাতরা যেখানে বসিয়া থাকে সেই খানেই এক রাশি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি প্রায় তুলার মত জিনিষে ঢাকা থাকে। এক একটী স্ত্রী ছাতরা ৫০০।৭০০ কিম্বা হাজারেরও বেশী ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে ছানা ছাতরারা অন্য অন্য স্থানে সরিয়া বসে ও রস টানিয়া খাইতে থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রায় একমাস হইতে দেড়মাস পরে পরে ইহাদের বংশ বাড়ে।

আক রোপণের সময় ছাতরা ধরা ডগা ও টিকলি বাদ দিয়া রোপণ করিলে প্রায় ছাতরা হয় না।

———o———

৪৯ চিত্র—ছাতরা।

৪৯ চিত্রে পাতার উপর এক রকম ছাতরা দেখান হইয়াছে। অনেক দেশী কাপাস গাছের ডগে এক রকম ছাতরা হয় এবং এই জন্য ডগের পাতা কোঁকড়াইয়া জড় সড় হইয়া যায়। প্রথম হইতে নজর রাখিয়া ছাতরার সহিত এই ডগগুলি কাটিয়া পুড়াইয়া দিতে পারিলে অন্য গাছে ধরিতে পায় না এবং ক্ষতি করিতে পারে না।

তুঁত গাছের ডগেও এই রকমের ছাত্‌রা হয়। লোকে ইহাকে "টুক্‌রা" "কোকড়া মারা" বা "কোঁকড়া ধরা" বলে। ইহাকেও কাপাসের ন্যায় প্রথম হইতে কাটিয়া পুড়ান উচিত।

ঘরে যে গোল আলু রাখা হয় তাহাতে এক রকম ছাত্‌রা লাগে। আলুর চোকে ও আঁকুরের উপর সাদা তুলার মত হইয়া বসিয়া থাকে। আলুর কথা বলিবার সময় ছাতরা লাগিলে কি করা উচিত বলা হইয়াছে।

বাগানের শীম বেগুন প্রভৃতি এবং নানা রকমের ফুল গাছেও অনেক সময় ছাত্‌রা লাগে। কখনও কখনও এত বেশী হয় যে সমস্ত ডাঁটা ও পাতা ছাইয়া ফেলে এবং সমস্তই সাদা তুলা ঢাকা বলিয়া বোধ হয়। ফলে গাছ শুকাইয়া যায়। প্রথমে পাতায় বা ডাঁটায় দুই একটা ছাত্‌রা আসিয়া বসে। ক্রমে বাড়িয়া গাছ ঢাকিয়া ফেলে। নজর রাখিয়া যেমন দুই একটা হয় মারা উচিত।

কেরাসিন মিশ্রণ, ক্রুড্ অয়িল ইমলসন বা ফিনাইলের জল দিয়া ধুইয়া দিলে ছাত্‌রা মরিয়া যায়। ঝারি পিচ্‌কারী বা দমকল দ্বারা এত জোরে এই সমস্ত ছিটাইতে হয় যেন তুলার মত আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের গায়ে লাগে। কিম্বা এই জলে কাপড় ভিজাইয়া ধুইয়া দিলেও হয়।

---o---

এক রকমের ছাত্‌রা আছে যাহাদের গা তুলার মত জিনিষে ঢাকা থাকে না। ইহাদের উপরকার

৫০ চিত্র—ঝিনুক ছাতরা।

আবরণ কিছু শক্ত। ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন ছোট ঝিনুকের এক একটী খোলা উবুড় করিয়া ডালে ও পাতায় বসাইয়া দিয়াছে। ইহাকে "ঝিনুক ছাত্‌রা" বলা যায়। ৫০ চিত্রে এই রকম ছাত্‌রা দেখান হইয়াছে। ইহাদেরও আচরণ পূর্ব্বোক্ত ছাত্‌রার মত। কেরাসিন্ মিশ্রণ প্রভৃতির জলে ধুইয়া দিলে ইহারাও মরিয়া যায়।

---o---

নবম পরিচ্ছেদ।

সরিষা ও তিল।

মেড়ি।

বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় চাষীদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় সরিষা গাছে কি পোকা লাগে তাহারা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় মেড়ির মত সরিষার শত্রু আর নাই। মাজরা প্রভৃতির ন্যায় মেড়ি এক প্রকার প্রজাপতির কীড়া। এই প্রজাপতিকে দিনের বেলাতেও ক্ষেতে উড়িয়া বেড়াইতে ও গাছের উপর বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রজাপতি পাতার উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে কীড়ারা ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৭চিত্রের ন্যায় পাতার ছাল খাইয়া পাতা সাদা করিয়া দেয়। অনেক সময় পাতা জড়াইয়া তাহার ভিতর থাকে। গাছে যখন ফুল ও শুঁটী ধরে তখনই ইহারা বিশেষ ক্ষতি করে। সমস্ত ফুল মুখের লালার দ্বারা জড়াইয়া তাহার মধ্যে থাকে এবং ফুল খাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। শুঁটী হইলে শুঁটীর ভিতর ঢুকিয়া সমস্ত দানা খাইয়া দেয়। এই রকম শুঁটীতে ছিদ্র দেখা যায়। মেড়ি লাগা ক্ষেতে যাইলেই এই সমস্ত নজরে পড়ে। প্রায় অনেক কীড়াকেই এক জায়গায় থাকিতে দেখা যায়। অধিকাংশ কীড়াই জড়ান পাতা বা ফুলের মধ্যে পুত্তলি হয়। তার পর প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং আবার ডিম পাড়ে।

প্রথম হইতে নজর রাখিয়া গুটান পাতা বা গাছের মাথার জড়ান পাতা কিম্বা জড়ান ফুল দেখিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহা কাটিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে ইহাদের বংশ বাড়িতে পাইবে না এবং ফসল বাঁচিয়া যাইবে।

কাল মেড়ি।

কখনও কখনও ১৫শ চিত্রপটের ১১ চিত্রের ন্যায় কাল কাল কীড়াকে সরিষার পাতা খাইতে দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই পাতার নীচে থাকিয়া বড় বড় ছিদ্র করিয়া খায়। ইহাদিকে কাল মেড়ি বলিয়া থাকে। ইহারা ১৫শ চিত্রপটের ১২ চিত্রের বোলতার জাতের পতঙ্গের কীড়া। পতঙ্গ দিনের বেলা ক্ষেতে থাকে এবং সরিষা পাতার ভিতর ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া তাহাতে ডিম পাড়ে। ৪।৫ দিন পরে ডিম ফুটিলে কীড়ারা বাহির হইয়া পাতা খাইতে থাকে। ১২।১৪ দিন খাইয়া পাতার উপরেই হোক আর মাটির নীচেই হোক পুত্তলি হয়। ৫।৭ দিন পরে পতঙ্গ বাহির হইয়া আবার ডিম পাড়ে।

গাছ নাড়া দিলেই কাল মেড়ির কীড়ারা গাছ হইতে মাটিতে পড়িয়া যায়। একটা মালসায় কেরাসিন মিশ্রিত জলে ইহাদিগকে এইরূপে নাড়া দিয়া ফেলিয়া মারিতে হয়। ইহাই সহজ উপায়। পতঙ্গদিগকে সহজেই হাত জালে ধরা যায়। ৫ সের আন্দাজ গুঁড়া চুণে ১ পোয়া কেরাসিন তেল মিশাইয়া পাতার উপর ছিটাইয়া দিলে আর কাল মেড়ি পাতা খায় না।

মেড়ি ও কাল মেড়ি মূলা, কপি, শালগম প্রভৃতিতেও লাগিয়া থাকে। সরিষাতে কখনও কখনও আর পোকা

৪১ চিত্র—তিলের পোকা।

১০ম চিত্র পট।

ঢেঁড়সের পোকা।

লাগে। তার পোকার বিবরণ যব গমে দেওয়া হইয়াছে। পাটে যে-শুঁয়া পোকা লাগে, তাহা তিলেও লাগে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাটে দেখ।

তিলের পাতা খাওয়া পোকা।

৫১ চিত্রে যে প্রকাণ্ড লেজওয়ালা কীড়া দেখান হইয়াছে ইহা অনেক সময় তিল ও রাঙ্গা আলুর পাতা খায়। ইহাকে দেখিয়া অনেকে ভয় পায়। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই; অনায়াসে ইহাকে হাতে করা যায়। ইহার রঙ সবুজ এবং পীঠের দুই ধারে সাদা দাগ আছে। ৫২ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে এবং ঐ চিত্রের নীচে যে পুত্তলি হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়াছে সেই শূন্য পুত্তলি-কোষদেখান হইয়াছে। পুত্তলির রঙ লাল। কীড়া খাইয়া বড় হইলে মাটির নীচে যাইয়া পুত্তলি হয়। প্রজাপতির রঙ কাল এবং ডানায় সাদা দাগ আছে। প্রজাপতি অনেক সময় ঘরে আলোর কাছে উড়িয়া আসে এবং গায়ে হাত দিলে বা ধরিলে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ করে। প্রজাপতি নিশাচর এবং রাত্রে পাতার উপর গোল গোল ডিম পাড়ে। এই পোকা হইতে এখন পর্য্যন্ত বশী ক্ষেতি হয় বলিয়া শুনা যায় নাই। ক্ষেতের মধ্যে সহজেই পোকা নজরে পড়ে। যাহাতে বংশ না বাড়ে সেই জন্য প্রথম হইতেই বাছিয়া মারা উচিত।
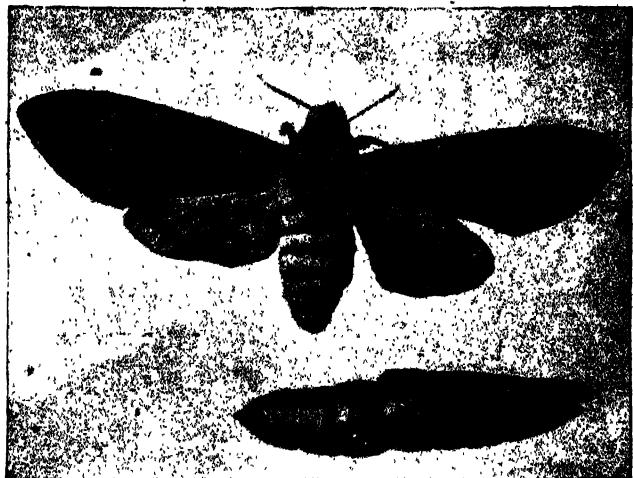
৫২ চিত্র—৫১ চিত্রের পোকার প্রজাপতি।

তিলের জটা পোকা।

(১০ম চিত্রপট।)

১০ম চিত্রপটের ১ ও ৩ চিত্রে যেমন তিল গাছের ডগের পাতা জটা পাকান হইয়া রহিয়াছে ক্ষেতের সমস্ত তিলগাছের ডগের পাতা এক এক সময় এইরূপে জটা পাকাইয়া যায়। ২ চিত্রে যে কীড়া বড় করিয়া দেখান হইয়াছে এই কীড়া মুখের লালার দ্বারা পাতা বাঁধিয়া এইরূপে জটা পাকায়। নিজে ভিতরে থাকে এবং খায়। এইরূপে জটা পাকাইয়া দিলে সে গাছ আর বাড়ে না। জটা নাড়া দিলে অনেক সময় কীড়া ৩ চিত্রের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে। ৬ চিত্রে প্রজাপতি বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। প্রজাপতিকে দিনের বেলা ক্ষেতের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে এবং ৩ চিত্রের মত পাতার উপর বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া এগাছ ওগাছ করিয়া পাতার উপর এখানে ওখানে প্রায় ১০০ শতেরও অধিক ডিম পাড়ে। ৭, ৮ ও ৯ চিত্রে পাতার উপর ও পৃথক ভাবে ডিম বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু শুধু চোখে ডিম দেখা যায় না। ৪।৫ দিন পরে ডিম ফুটিলে ছোট কীড়ারা ১০ চিত্রের ন্যায় পাতার দুই পর্দ্দার ভিতর ঢুকিয়া খায়। তার পর একটু বড় হইলে ডগের পাতা লইয়া জটা বাঁধে। অনেক সময় ডগে জটা না বাঁধিয়া কোন পাতা গুটাইয়া তাহার মধ্যে থাকে। ২০।২৫ দিন খাইয়া বড় হইলে এই জটা কিম্বা পাতার ভিতরেই একটী পাতলা জালের গুটী করিয়া (৫ চিত্র) পুত্তলি হয়। ৪ চিত্রে পুত্তলি বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। তার পর প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়া আবার ডিম পাড়ে।

প্রথম হইতে নজর রাখিয়া যেমন গুটান পাতা দেখা যায় কিম্বা গাছের মাথায় জটা দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গে জটা ও গুটান পাতা কাটিয়া পুড়াইয়া কিম্বা মাটিতে পুঁতিয়া নষ্ট করিতে হয়। তাহা হইলে ইহাদের বংশ বাড়িতে পায় না এবং আদত ফসলের ক্ষতি হয় না।

তিল পোকা।

তিল কাটিয়া আনিয়া ঝাড়াই করিবার জন্য যখন ঘরে বা খামারে রাখা হয় তখন ইহাতে অসংখ্য পোকা হয়। তিলের বোঝা নাড়া দিলে পোকারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। চাষী মাত্রেই ইহাকে জানে এবং তিল পোকা বলে। ইহারা গান্ধির জাতের পোকা এবং তিল হইতে রস চুষিয়া খায়। কাজে কাজেই অনেক তিল ভুয়া হইয়া যায়। ইহারা কামড়াইয়া খাইতে পারে না বলিয়া চাষীরা মনে করে ইহারা কিছুই ক্ষতি করে না। ইহাদিগকে সহজেই ঝাড়ু দ্বারা জড় করিয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া কিম্বা মাটিতে পুতিয়া মারা যায়। চাষীরা এইরূপে জড় করিয়া এক ধারে ফেলিয়া দেয়। ইহারা আবার আসিয়া তিলে লাগে। ইহাদিগকে মারিয়া ফেলা উচিত।

———o———

দশম পরিচ্ছেদ।

ভেরেণ্ডা বা রেড়ী।

লেদা পোকা।

৫৩ চিত্র—রেড়ীর লেদা পোকা।

৫৩ চিত্রে যে পোকা দেখান হইয়াছে ইহারা রেড়ীর পাতা খায়। প্রথম হইতে নজর না রাখিলে এক এক সময় ইহার সংখ্যা এত বাড়িয়া যায় যে বড় বড় ক্ষেতের একটী পাতাও থাকে না। ৫৪ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে। প্রজাপতি রাত্রিতে উড়িয়া উড়িয়া পাতার উপর এখানে ওখানে এক একটীতে ৪০০।৫০০ ডিম পাড়ে। ডিম হইতে আবার প্রজাপতি হওয়া পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রায় ২০।২৫ দিন লাগে। ইহারা যত রকম বন ভেরেণ্ডারও পাতা খায় এবং আরও অন্যান্য জঙ্গলের গাছের পাতা খাইয়া থাকিতে পারে। রেড়ীর ক্ষেতের কাছে বন জঙ্গল থাকিলে এক এক সময় এই জঙ্গলে ইহাদের সংখ্যা এত বাড়িয়া যায় যে কীড়া পাল হইয়া আসিয়া রেড়ীর ক্ষেতে পড়ে এবং দুই এক দিনের মধ্যেই ক্ষেত পাতা শূন্য করিয়া দেয়।

৫৪ চিত্র—রেড়ীর লেদা পোকার প্রজাপতি

রেড়ীর পাতায় এক রকম শুঁয়া পোকা লাগে। ইহার পীঠে একটা ডোরা থাকে এবং গায়ে, বিশেষ করিয়া দুই ধারে ভালুকের মত সাদা রোঁয়া থাকে। মাথার কাছ হইতে দুই ধারে শিঙের মত দুই গোছা লম্বা লম্বা রোঁয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রী প্রজাপতি হলদে এবং পুং প্রজাপতিরা সবুজ রঙের হয়।

পীঠে ডোরা যুক্ত, সবুজ রঙের এবং গায়ে অনেক কাঁটা ওয়ালা আর এক রকম পোকাও রেড়ীর পাতা খায়। ইহাদের প্রজাপতি কাল দাগ মিশ্রিত হলদে রঙের হয়। রেড়ীর ক্ষেতে দিনের বেলা অনেক উড়িতে দেখা যায়।

এই সমস্ত পোকাকে বাছিয়া মারাই সহজ উপায়। আর যেখানে রেড়ীর চাষ হয় তাহার নিকটে কোন খানে কোন রকম ভেরেণ্ডা গাছ হইতে দেওয়া উচিত হয় না। ভেরেণ্ডা গাছ আপনা আপনি যেখানে সেখানে জন্মে। ইহাদিগকে কাটিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত।

ভেঁড়ির পোকা।

এক রকম লাল সুতলী পোকা রেড়ীর ফলের ভিতর ঢুকিয়া বীজ খাইয়া দেয়। যখন গাছে ফল ধরে না বা ফল থাকে না তখন ইহারা ডাঁটার ভিতর ফুকর করিয়া খায়। ডাঁটা ও ফলের ভিতরেই বড় হইয়া পুত্তলি হয়। পরে অনেক কাল ফোঁটাযুক্ত হলদে রঙের প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং পাতার ও ডাঁটার উপর ডিম পাড়ে।

ডাঁটায় ও ফলে ফুকর করিয়া কীড়া ঢুকিলে একটা ছিদ্র দেখা যায় এবং এই ছিদ্রের মুখ হইতে অনেক কাল দানার মত পোকার বিষ্ঠা বাহির হইয়া সেইখানেই জড় হয় ও লাগিয়া থাকে। এই বিষ্ঠা দেখিয়া কোথায় কীড়া আছে সহজেই ধরা যায়।

প্রথম হইতে নজর রাখিয়া ডাঁটার যেখানে কীড়া থাকে তার একটু নীচে হইতে কাটিয়া কিম্বা যে ফলে কীড়া থাকে সেই ফল বাছিয়া পুড়াইতে হয়। এ রকম ফল ও ডাঁটা বাছিয়া লওয়া কঠিন নয়। ক্ষেতের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইলেই নজরে পড়ে।

এই সমস্ত ছাড়া পাটের শুঁয়া পোকা এবং তামাকের লেদা পোকা অনেক সময় রেড়ী গাছে লাগে এবং পাতা খায়। ছোট বেলায় মাঠফড়িঙও পাতা খাইয়া গাছ মারিয়া দিতে পারে। কিন্তু আমদের দেশে রেড়ী প্রায় অন্য ফসলের সঙ্গে লাগান হয়। সেই জন্য মাঠফড়িঙ হইতে তেমন ক্ষতি হয় না। কখনও পাতার নীচে হল্‌দে রঙের আঁইস পোকা হয়। প্রথম হইতে নজর না রাখিলে আঁইস পোকা সমস্ত ক্ষেত ছাইয়া ফেলে। আঁইস পোকার বিবরণ ইক্ষুতে দেখ।

———o———

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তামাক।

মাঠফড়িঙ।

বীজ বুনিবার পর বীজের ক্ষেতে বা হাপরে মাঠফড়িঙ অনেক সময় আঁকুর ও ছোট গাছ খাইয়া দেয়। কখনও কখনও প্রায় সমস্তই খাইয়া ফেলে। মাঠফড়িঙের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

কোথাও কোথাও মশারীর কাপড়ের মত পাতলা কাপড় দ্বারা বীজের ক্ষেত ঢাকিয়া রাখা হয়। নিমপাতা ঢাকা দিয়া রাখিলেও মাঠফড়িং খাইতে পায় না।

তার পর যখন বীজের ক্ষেত হইতে উঠাইয়া মাঠে গাছ লাগান হয় তখনও মেটে ফড়িঙ এবং সবুজ ও মেটে রঙের আরও দুই এক রকম ফড়িঙ গাছের পাতা খাইয়া দেয়। ক্ষেত হইতে মাঠফড়িঙ ধ্বংস করিয়া তবে গাছ রোয়া উচিত। গাছের উপর কেরাসিন মিশ্রিত ছাই বা চূণ বা ধুলা ছিটাইয়া দিলে মাঠফড়িঙ গন্ধে আর পাতা খায় না। গাছ যখন লাগান হয় তখন সেঁকো বিষ, লেড্ আর্সিনিয়েটের জলে ডুবাইয়া লাগাইলে গাছ বাঁচান যায়। পাতার সঙ্গে বিষ খাইয়া ফড়িঙরা মরিয়া যায়।

গাছ বড় হইলেও অনেক ফড়িঙ পাতার উপর বসিয়া খাইতে থাকে এবং পাতায় বড় বড় ছিদ্র করিয়া দেয়। ছিদ্র হইলে সে পাতা চুরুট প্রস্তত করিবার জন্য ব্যবহার করিতে পারা যায় না। হাত জালে ইহাদিগকে ধরিয়া মারাই সহজ উপায়। তাছাড়া আর কিছুই করিতে পারা যায় না।

চোরাপোকা বা কাটুই।

হাপর হইতে উঠাইয়া মাঠে লাগাইবার পর যতদিন না গাছ বড় হইয়া যায় এবং ডাঁটা শক্ত ও মোটা না হয় ততদিন চোরাপোকা বা কাটুই গাছ কাটিয়া অনেক লোকসান করে। চোরা পোকার বিবরণ ছোলা মসুর প্রভৃতির পোকার কথা বলিবার সময় দেওয়া হইয়াছে।

লাল উইচিংড়ি।

চোরা পোকা ছাড়া এক রকমের লাল রঙের বড় উইচিংড়িও এই রকমে গাছ কাটিয়া অনেক লোকসান করে। ৫৫ চিত্রে নীচে ইহাকে আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। ইহার রং লাল। ইহারা মাটিতে গর্ত্ত করিয়া থাকে। গর্ত্ত করিয়া মাটির নীচে দেড় হাত দুই হাত পর্য্যন্ত যায়। আর এই গর্ত্ত হইতে ইন্দুরের মত অনেক মাটি উঠায়। ইন্দুর যে মাটি উঠায় তাহার দানা বড় বড় হয়। ইহাদের দ্বারা উঠান মাটির দানা খুব ছোট ছোট, আর মাটি ইন্দুরের উঠান মাটির মত তত বেশী নয়। মাটি দেখিয়া ইহার গর্ত্ত ধরা যায়। সন্ধ্যার সময় ও রাত্রিতে ইহারা খুব চীৎকার করে। ইহাদের চীৎকারকেই ঝিল্লিরব বলে। সেই জন্য কোথাও কোথাও ইহাকে ঝিল্লি বলে। বেহার অঞ্চলে ইহাকে ঝিঙ্গুর বলে। কেহ কেহ ঝিঁঝিঁ বলে। এই ঝিল্লিরব প্রায় চৈত্র মাস হইতে শুনা যায় এবং বর্ষার শেষ সময়ে খুব বেশী হয়। বর্ষার শেষেই ইহারা ডিম পাড়ে। ৫৫ চিত্রের বাঁধারে একটী ডিম বড় করিয়া অঙ্কিত রহিয়াছে। মাটির নীচে গর্ত্তের শেষে এক একটী উইচিংড়ি ৪০।৫০টী ডিম এক জায়গায় পাড়ে। সাধারণতঃ ভাদ্র মাসে ডিম ফোটে এবং ছানারা এই বড় গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া নিজেরা ছোট

ছোট গর্ত্ত করিয়া থাকে। ইহারাও অনেক ছোট ছোট পিঁপড়ের মত একটু একটু মাটি উঠায়। ছোট বেলায় দেখিতে ইহারাও বড় উইচিংড়ির মত তবে ইহাদের ডানা থাকে না। ফড়িঙদের মত যত বড় হয় ক্রমে ক্রমে ডানা গজায়। প্রায় অর্দ্ধেক ডানা হইয়াছে এমন একটী উইচিংড়ি ৫৫ চিত্রের উপরে ডান ধারে অঙ্কিত হইয়াছে। বৎসরে ইহাদের একবার বংশ হয়।

ডানা হইলেও ইহারা উড়ে না, ছোট বড় সকলেই লাফাইয়া লাফাইয়া যায়। ইহারা দিনের বেলা গর্ত্তের ভিতর থাকে এবং রাত্রে বাহির হইয়া গাছ কাটিয়া গর্ত্তের মধ্যে লইয়া যায় ও খায়।

৫৫ চিত্র—লাল উইচিংড়ি।
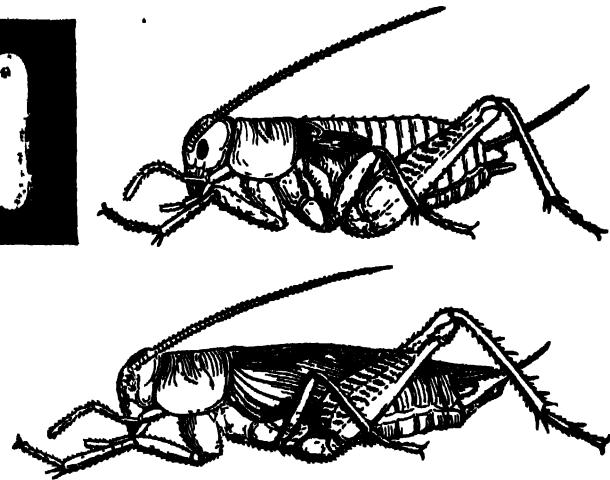
বৃষ্টি হইয়া ইহাদের গর্ত্তে জল ঢুকিলে ইহারা বাহির হয়। তখন কাক প্রভৃতি অনেক পাখী ইহাদিগকে ধরিয়া খায়। এই সময় ইহাদিগকে ধরিয়া মারা খুব সহজ। এক এক সময় বৃষ্টির পর উইচিংড়িতে মাঠ ছাইয়া ফেলে। যে জায়গা জলে ডোবে না বর্ষাকালে ইহারা সেই জায়গায় থাকে।

উইচিংড়ির উপদ্রব বেশী হইলে যদি সম্ভব হয় ক্ষেতে জল ঢুকাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে সকলেই গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহিরে আসে এবং সেই সময় ধরিয়া কেরাসিন তেল মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়।

উপরের বিবরণ হইতে ক্ষেতে উইচিংড়ি আছে কিনা সহজেই ধরা যায়। সন্দেহ হইলে মাটি খুঁড়িয়া দেখিতে হয়। তামাক রুইবার পূর্ব্বে ক্ষেতের সমস্ত ঘাস আগাছা ইত্যাদি উঠাইয়া পরিস্কার করিয়া দিতে হয়। রাত্রিতে লেড্ আর্সিনিয়েট নামক সেঁকো বিষের জলে ডুবাইয়া কোন রকমের কাঁচা পাতা ক্ষেতের এখানে ওখানে রাখিয়া দিতে হয়। দিন কয়েক এই রকম করিলে অন্য কিছু খাবার না পাইয়া এই বিষাক্ত পাতা খাইয়া উইচিংড়িরা মরিয়া যাইবে। তার পর ফসল লাগাইতে হয়।

৫৬ চিত্র—কাচ পোকা।

বর্ষাকালের মাঠের শস্যাদি ছাড়া প্রায় অন্য সকল ফসলেরই ইহারা ক্ষতি করে। কপি ইত্যাদি প্রায় অনেক সময় হইতেই দেয় না। অনেক ফুলের গাছও কাটিয়া দেয়।

৫৬ চিত্রে অঙ্কিত এক রকমের চক্‌চকে নীল রঙের বোলতা বা কাচ পোকা অনেক উইচিংড়ি নষ্ট করে। ইহারা উইচিংড়িকে হুল ফুটাইয়া মারে এবং নিজেদের গর্ত্তে লইয়া যায়, তার পর ইহার গায়ে একটী ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে ছানা এই উইচিংড়ি খাইয়া বড় হয়।

১১শ চিত্রপট।

তামাকের ডাঁটার আব্ পোকা।

আরও এক রকম কাল ও পীঠে দুইটী হলদে ফোঁটা ওয়ালা উইচিংড়ি আছে। ইহারাও মাটিতে গর্ত্ত করিয়া থাকে এবং গাছের শিকড় কাটিয়া গাছ নষ্ট করে। ৫৭ চিত্রে ইহাকে আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। আমাদের দেশে যাহাকে ঘুরঘুরে বলে ইহারাও মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া থাকে। ইহারা অন্য পোকা ধরিয়া খায় (৫৮ চিত্র দেখ)। ৫৯ চিত্রে যে ভীষণাকৃতি পোকা আঁকিয়া দেখান হইয়াছে ইহারা প্রায় নদী প্রভৃতির ধারে বালুকাময় জায়গায় গর্ত্ত করিয়া থাকে। বেহার অঞ্চলে ইহাকে "ভিরুয়া", বাঁকুড়া জেলায় মালকাঁকড়া এবং কোথাও কোথাও ঝিঁঝিঁ বলে। ইহারাও অন্য পোকা ধরিয়া খায়।
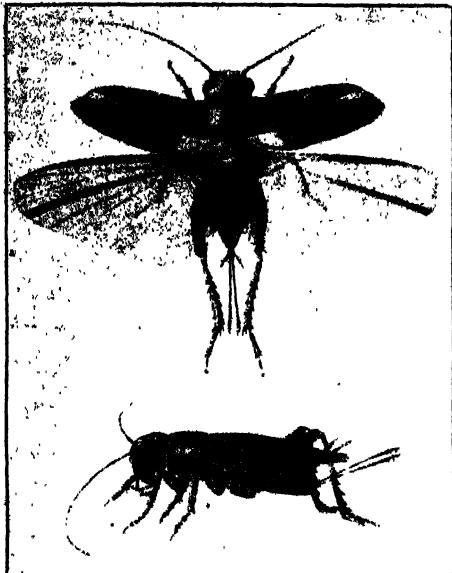
৫৭ চিত্র—উইচিংড়ি।

৫৮ চিত্র—ঘুরঘুরে।

এই রকম পোকা যাহারা মাটিতে গর্ত্ত করিয়া থাকে তাহারা প্রায়ই গর্ত্ত কাটিয়া যাইতে যাইতে অনেক শিকড় কাটিয়া দেয়। বেশী হইলে অনেক ক্ষতি করে। বর্ষাকালে ইহারা মাটির অল্প নীচেই থাকে এবং এই সময় বেশী অনিষ্ট করা সম্ভব। ইহাদিগকে খুঁড়িয়া মারা কিম্বা ক্ষেতে জল ঢুকাইয়া দিলে যখন বাহির হয়, তখন ধরিয়া মারা ছাড়া প্রায় আর কিছুই করিতে পারা যায় না। প্রথম বৃষ্টির পর সকলেই গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহির হয় এবং উঁচু জায়গায় যাইতে চেষ্টা করে; এই সময় ধরা সহজ।

৫৯ চিত্র—ভিরুয়া বা মালকাঁকড়া।

ডাঁটার আব পোকা।

(১১শ চিত্রপট।)

তামাক গাছের ডাঁটা প্রায়ই ফুলিয়া উঠে। ১১শ চিত্রপটের ১ ও ৬ চিত্রে এই রকম ফোলা ডাঁটা দেখান হইয়াছে। ৪ ও ৫ চিত্রে যে সুরুই বা ছোট প্রজাপতি রহিয়াছে ইহার কীড়া ডাঁটার ভিতর থাকিয়া খায় বলিয়া এই রকম ফুলিতে দেখা যায়। সুরুই পাতা ও ডাঁটার উপর বালির কণার মত ছোট ছোট ডিম পাড়ে; এক একটীতে

প্রায় ৬০।৭০ ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া যেখানে থাকে সেইখানেই পাতা বা ডাঁটার ভিতর ঢুকিয়া খায়। পাতার উপর ফুটিলেও সিঁদ কাটিয়া সকলেই ডাঁটায় আসে। একটী কীড়া পাতা হইতে কি রকমে ডাঁটায় আসিয়াছে এই চিত্রপটের ৬ চিত্রে দেখান হইয়াছে। কীড়া ডাঁটায় ফুকর করিয়া খায় ও বড় হয়। ২ চিত্রে কীড়া বড় করিয়া আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। তার পর প্রজাপতি সহজে বাহির হইতে পারে ডাঁটাতে এই রকম একটী ছিদ্র করিয়া কীড়া ডাঁটার ভিতরেই পুত্তলি হয়। ৩ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে। ডিম পাড়িবার সময় হইতে পুনরায় প্রজাপতি হইয়া বাহির হইতে শীতকালে প্রায় ৩ মাসেরও বেশী সময় লাগে।

কীড়া যেখানেই থাকিয়া খায় সেই স্থানটীই ফুলিয়া যায়। যখন ডাঁটা হয় না তখন পাতার বোঁটাতে থাকিয়া খায় এবং এই বোঁটাটীও ফুলিয়া উঠে। গাছের ডাঁটার গোড়ার দিকে যদি খায় তবে উপর দিকে গাছ বাড়িয়া যাইতে পারে কিন্তু অনেক সময়ে গাছের ডগায় কীড়া লাগে। ডগটী ফুলিয়া উঠে এবং গাছ আর বাড়ে না। একটা কি দুইটা কীড়া একটী গাছে লাগিলে গাছের তেমন ক্ষতি হয় না, কারণ গাছ মরিয়া যায় না। কিন্তু কমজোর হয় এবং বেঁটে হইয়া থাকে।

প্রথম হইতে নজর রাখিয়া যখনই পাতার বোঁটা বা শির ফোলে কিম্বা গাছের কচি ডগটী ফোলে তখনই এই সমস্ত পাতা ও ফোলা ডগটী একটু নীচে হইতে কাটিয়া পুড়াইতে হয়। তাহা হইলে ইহাদের বংশ বাড়িতে পায় না এবং আদত ফসল বাঁচিয়া যায়। এইরূপে ডগ কাটিয়া দিলে গাছের ভালই হয়। কারণ না কাটিলে কীড়া খাইতে থাকিলেত গাছ বাড়িবেই না। তাছাড়া কীড়ার বংশ বাড়ে। ডগ কাটিয়া দিলে নীচে হইতে নুতন ডাল গজায়। এই সমস্ত ডাল ভাঙ্গিয়া দিয়া যদি কেবল একটীকে বাড়িতে দেওয়া যায় তাহা হইলে ইহাই গাছের মত বড় হয়।

আদত ফসলের সময় ছাড়া যদি এখানে ওখানে আপনা আপনিই তামাক গাছ জন্মে তবে তাহা কাটিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। ইহা খাইয়া পোকার বংশ বাড়ে এবং আদত ফসলের ক্ষতি হয়। গাছ কাটিয়া লইবার পর গাছের গোড়া ক্ষেতেই রাখিয়া দেওয়া হয়। দেখা যায় ইহাতে অসংখ্য পোকা হয়। সেই জন্য ফসলের পর গোড়া উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

আব পোকা লাগিলে গুজরাট অঞ্চলে চাষীরা ধারাল ছুরি দিয়া আবটীর এক দিক লম্বালম্বি ফাড়িয়া দেয়। ইহাতে প্রায়ই কীড়া কাটা যায় এবং গাছ আবার তেজ করিয়া উঠে। আবটী ফাড়িয়া দিলেও গাছের ক্ষতি হয় না। কিন্তু কীড়া না মরিলে কোন ফল হয় না।

লেদা পোকা।

তামাকের লেদা পোকা কাল রঙের এক রকম মোটা সুতলী পোকা। ৬০ চিত্রে লেদা পোকা দেখান হইয়াছে। ৬১ চিত্রে ইহার প্রজাপতি ডানা ছড়াইয়া রহিয়াছে। প্রজাপতির রঙ কাল এবং ডানার উপর সরু সরু সাদা ও কটা রঙের অনেক দাগ আছে। ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৩ চিত্রে পাতার উপর কাতরী পোকার যেমন ডিমের গাদি দেখান হইয়াছে ইহারাও সেইরূপে পাতার উপর গাদা করিয়া ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলিকে কটা রঙের লোমে ঢাকিয়া রাখে। একটী প্রজাপতি ৫০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৭ চিত্রে ছোট শুঁয়া পোকারা যেমন
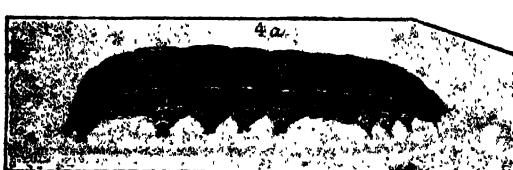
৬০ চিত্র—তামাকের লেদা পোকা।

৬১ চিত্র—তামাকের লেদা পোকার প্রজাপতি।

এক পাতার উপরেই দলে দলে থাকিয়া পাতার পর্দ্দা খাইয়া সাদা করিয়া দেয়, ডিম হইতে ফুটিয়া এই লেদা পোকার ছোট ছোট কাল কীড়ারাও সেইরূপে খায়। তার পর একটু বড় হইলেই ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে। বড় হইয়া কেবল পর্দ্দা না খাইয়া পাতা কাটিয়া খায়। তার পর মাটির ভিতর যাইয়া পুত্তলি হয়। ইহাদের পুত্তলি ৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রে চোরা পোকার পুত্তলির মত। শীতকালে এই লেদা পোকার ডিম ৮ দিন পরে ফোটে। কীড়ারা প্রায় দেড় মাস খাইয়া পুত্তলি হয় এবং পুত্তলি প্রায় ১ মাস থাকে। গ্রীষ্মকালে ডিম ৩।৪ দিনেই ফোটে; কীড়া ১৯।২০ দিন খাইয়া পুত্তলি হয় এবং পুত্তলি ৭।৮ দিন থাকে।

তামাকের লেদা পোকা বাগানে আলু কপি প্রভৃতি তরিতরকারির, রেড়ি, মুগ শীম প্রভৃতির এবং অনেক আগাছার পাতা খায়। প্রায় বারমাসই ইহাদিগকে দেখা যায়।

তামাকের পাতায় নজর রাখিয়া ডিম জড় করিতে হয়। ছোট কীড়ারা যখন খায় তখন পাতা সহিত তাহাদিগকে কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। বড় হইয়া যখন ছড়াইয়া পড়ে তখন বাছিয়া মারা ছাড়া আর উপায় থাকে না। পাতার উপর ডিমের স্তূপ খুব সহজেই নজরে পড়ে। ছোট ছেলেতে অনায়াসেই পাতা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া জড় করিতে পারে এবং পুড়াইয়া বা মাটিতে পুঁতিয়া নষ্ট করিতে পারে।

তামাকের উপর কখনও কখনও পাটে যে শুঁয়াপোকার কথা বলা হইয়াছে তাহারা আসিয়া পড়ে। আরও এক রকম সবুজ রঙের কীড়াও কখনও কখনও দেখা যায়। ইহারাও পাতা খায়। ইহাদিগকে বাছিয়া মারিতে হয়।

শুকান তামাক।

শুকান তামাকে এক রকম সুরুই লাগে। সুরুই লাগা তামাকে এক রকম সাদা সাদা ডিমের মত ছোট ছোট জিনিস দেখা যায় এইগুলি সুরুই পোকার গুটী; ইহারই মধ্যে পুত্তলি হয়।

শুকান তামাকে ১৮শ চিত্রপটের ৪ চিত্রের পোকাও খুব হয়। ইহারাও অনেক লোকসান করে। এই দুইএরই জন্য কার্ব্বন বাইসালফাইড্ গ্যাস দিয়া তামাক শুদ্ধ করিয়া লইত হয়। শুদ্ধ করিয়া এমন কোন ঢাকা জায়গায় রাখিতে হয় যেন এই পোকারা তামাকে আর পৌঁছছিতে না পারে। প্রথম হইতেই যদি এইরূপে বন্ধ করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে পোকা লাগিতে পায় না।

———o———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বেগুন।

(১২শ চিত্রপট।)

ফলের পোকা।

বেগুন গাছে প্রায়ই পোকার উৎপাত দেখা যায়। কখনও বা ডগা শুকাইয়া যায়, বেগুন কাণা হয়, পাতা কোঁকড়াইয়া শুকাইতে থাকে, কখনও বা সমস্ত গাছ শুকাইয়া যায়। ১২শ চিত্রপটের ৪ চিত্রে যে বেগুণের উপর লাল কীড়া দেখান হইয়াছে ইহাই ডগা শুকাইয়া দেয় এবং বেগুন কাণা করিয়া দেয়। বেগুণের মধ্যে সকলেই এমন কীড়া দেখিতে পায়। এই চিত্রপটের ৭ চিত্রে যে প্রজাপতি রহিয়াছে ইহাই ইহার প্রজাপতি। স্ত্রী প্রজাপতি বেগুণের গাছে, পাতা ও বেগুণের উপর যেথানে সেখানে অতি ছোট ছোট ডিম পড়িয়া যায়। ৩।৪ দিন পরে ডিম ফুটিলে ছোট কীড়ারা যদি বেগুণ পায় তবে তাহার মধ্যে ফুকর করিয়া প্রবেশ করে। যদি বেগুণ না পায় তবে ডগগুলিতে ঐরূপে প্রবেশ করিয়া খায় ও ডগগুলি শুকাইয়া ঝুলিয়া পড়ে (এই চিত্র পটে গাছের চিত্র দেখ) এইজন্য ছোট বেগুণ গাছের প্রায়ই ডগ শুকায়। ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে আর প্রায় ডগ শুকায় না। ১০।১২ দিন খাইয়া যখন কীড়ারা বড় হয় তখন বেগুণ কিম্বা ডগের ফুকর হইতে বাহির হইয়া অনেকেই গাছ বাহিয়া মাটিতে নামিয়া আসে। মাটিতে শুকান পাতা ও জঞ্জালের মধ্যে গুটী বাঁধিয়া গুটীর মধ্যে পুত্তলি হয়। কেহ কেহ গাছের ডাঁটার উপর গুটী প্রস্তুত করিয়া পুত্তলি হয়। এই চিত্রপটের ৫ চিত্রে ডাঁটার উপর একটী গুটী দেখান হইয়াছে এবং ৬ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে। ৫।৬ দিন পুত্তলি অবস্থায় থাকিয়া প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং আবার ডিম দিতে আরম্ভ করে। এক একটী স্ত্রী প্রজাপতি ২০০ কিম্বা আরও অধিক ডিম পাড়ে।

যখনই ডগা শুকায় আমাদের চাষীরা ডগগুলি ভাঙ্গিয়া ক্ষেতের ভিতরে বা ধারে ফেলিয়া রাখে ; কাণা বেগুণ হয় গাছেই রাখিয়া দেয় না হয় ছিঁড়িয়া ক্ষেতের ধারে ফেলিয়া রাখে। ইহাতে পোকাগুলি না মরিয়া আবার প্রজাপতি হইতে পায় এবং অনেক গাছ নষ্ট করিতে পারে। শুকান ডগগুলি একটু নীচে হইতে কাটিয়া এবং কাণা বেগুণ ছিঁড়িয়া ক্ষেতে না রাখিয়া পুড়াইয়া ফেলা উচিত। প্রথম হইতেই এরূপ বন্দোবস্ত করিলে তত অনিষ্ট হইতে পারে না। ৫ দিন অন্তর অন্তর ক্ষেতের মাটির উপরের এবং গাছের সমস্ত শুকান পাতা জড় করিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। এই সঙ্গে শুকান ডগাগুলি ও জঞ্জাল পুড়ান উচিত।

মাজপোকা।

যখন গাছে খুব ফল ধরিতে থাকে সেই সময় হঠাৎ দেখা যায় গোটা গাছই শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার কারণ কিছু বুঝা যায় না বা বাহিরে কিছু দেখা যায় না। সকলেই বলিয়া থাকে যে কোনরকম রোগ হইয়াছে এবং জায়গায় জায়গায় বাঁছুরে ধরিয়াছে বলে। কিন্তু সেই গাছ গোড়া হইতে উঠাইয়া যদি ডাঁটার গোড়া কাড়িয়া দেখা যায় তাহাহইলে উহাতে দুটী একটী ছোট কীড়া আছে দেখা যায়। ১২শ চিত্রপটের ১ চিত্রে এই কীড়া দেখান হইয়াছে। এই কীড়াই গাছের মাজ খায় বলিয়া গোটা গাছ একেবারে শুকাইয়া যায়।

কখন কখনও দেখা যায় মাজপোকা খাইলেও গাছ একেবারে শুকাইয়া যায় না, তবে গাছের তেজ কমিয়া যায় এবং তেমন ফল ধরে না। মাজপোকা দ্বারা আক্রান্ত গাছের গোড়ার দিকে নজর করিয়া দেখিলে ডাঁটাতে ছিদ্র দেখা যায় এবং ঐ ছিদ্র হইতে অনেক ছোট ছোট গোল গোল শুকান দানা বাহির হইয়াছে দেখা যায়। এইগুলি মাজপোকার বিষ্ঠা। ইহা দেখিয়া মাজপোকা আছে বলিয়া জানা যায়। এই কীড়ার প্রজাপতি এই চিত্রপটের ৩ চিত্রে দেওয়া হইয়াছে। ডিম হইতে জন্মিয়া কীড়ারা গাছের গোড়ায় ফুকর করিয়া ভিতরে যাইয়া মাজ খাইতে থাকে; বড় হইলে ঐ ফুকরের ভিতরেই গুটী করিয়া পুত্তলি হয় এবং আবার প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। এই চিত্রপটের ২ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে।

এইরূপ শুকান গাছ দেখিলেই প্রায় জমি হইতে উপড়াইয়া ক্ষেতের ধারে ফেলিয়া রাখা হয়; কিন্তু এইরূপ উপড়ান শুষ্ক গাছের মাজ খাইয়াও কীড়ারা বাঁচিয়া থাকে। তাহারা আবার প্রজাপতি হইয়া অন্য গাছে ডিম পাড়ে এবং গাছের অনিষ্ট করে, এইজন্য শুকান গাছগুলি গোড়া হইতে তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুড়াইয়া ফেলা উচিত, তাহা না করিলে অপর অপর গাছ নষ্ট হইবার ভয় থাকে।

পাতার পোকা।

সময়ে সময়ে বেগুণ গাছের পাতা মুড়িয়া শুকাইতে দেখা যায়। দুই একটী পাতা এই রকম হইলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না; কিন্তু বেশী হইলে গাছের জোর কমিয়া যায়। শুকান পাতাগুলির ভাঁজ খুলিয়া দেখিলে লাল রঙের শুঁয়াপোকা দেখা যায়। এই শুঁয়া পোকার প্রজাপতি পাতার উপর ডিম পাড়ে; ডিম ফুটিয়া শুঁয়াপোকা হইলেই উহা পাতা মুড়িয়া বাসা করে ও উহার ভিতরে থাকিয়া পাতার পর্দ্দা খাইতে থাকে। একটী শেষ হইলে আবার অন্য পাতায় যায়। শুঁয়া পোকা ঐরূপ বাসায় গুটী তৈয়ারী করিয়া পুত্তলি হয় এবং পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইয়া আবার ডিম পাড়ে।

পাতাগুলি মোড়া দেখিলেই উহা ছিঁড়িয়া পুড়ান উচিত, তাহা হইলে আর অনিষ্ট হইতে পায় না। বেগুনের ডাঁটার মাজপোকা, ফলের ও ডগের পোকা এবং পাতার পোকা সকলেই শীতকালে গুটী বাঁধিয়া গুটীর মধ্যে নিদ্রা যায় এবং ফাল্গুন, চৈত্র মাসে আবার প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। অতএব শীত থাকিতে থাকিতে ক্ষেতের ও গাছের সমস্ত শুকান পাতা, কাণা বেগুণ এবং সমস্ত শুকান গাছ জড় করিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত।

কাঁটালে পোকা।

কখনও কখনও দেখা যায় বেগুণের পাতা ঝাঁঝরা হইয়া যাইতেছে। ঐরূপ পাতা উল্টাইয়া দেখিলে পাতার নীচে ১২শ চিত্রপটের ৯ চিত্রে গায়ে কাঁটা কাঁটা হল্‌দে রঙের যে পোকা দেখান হইয়াছে, ইহা এবং ঐ পাতারই উপর ১১ চিত্রে পীঠে কাল কাল ফোঁটা বিশিষ্ট বড় একটী মটরের দাইলের মত যে পোকা রহিয়াছে এই দুই রকমের পোকা দেখা যাইবে। ইহারাই এইরূপে পাতা কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া ঝাঁঝরার মত করিয়া দেয়। এই দুইটী একই পোকা, প্রথমটী কীড়া ও দ্বিতীয়টী পতঙ্গ। এই সময় ক্ষেতের ভিতর দিয়া একটু নজর রাখিয়া চলিলে পাতার উপর এক এক গাদা হল্‌দে রঙের ডিম দেখা যায়। ডিম ঐ পাতার উপর ৮ চিত্রে দেখান হইয়াছে। উহাই কাঁটালে পোকার ডিম। এক একটী গাদায় প্রায় ৩০ হইতে ৫ টী পর্য্যন্ত ডিম থাকে। ভাল করিয়া দেখিলে ডিমগুলি একটু লম্বা ধরণের বুঝা যায়। ৫।৬ দিনের ভিতর ডিম ফুটিয়া ছোট ছোট সবুজ রঙের পীঠে কাঁটাওয়ালা কীড়া বাহির হয়। কীড়ারা একটু বড় হইলেই রঙ হল্‌দে হইয়া যায়। (এই চিত্রপটে ৯ চিত্র) কীড়াগুলি প্রথম হইতেই পাতা কুরিয়া খায়। কেবল শিরগুলি ছাড়িয়া দেয়, এই জন্য যে পাতা খায় সেই পাতা-গুলির একেবারে শিরদাঁড়া ও শিরগুলি ছাড়া আর কিছু থাকে না। ইহাতে গাছের জোর কমিয়া যায়। ইহাদের

গায়ে কাঁটা থাকার দরুণ কাঁটালের গায়ের কাঁটার মতন দেখায় এই জন্ত ইহাদিগকে কাঁটালে পোকা বলিয়া থাকে এবং পতঙ্গ অবস্থায় বাঘের ন্যায় ছাপ্‌কা ছাপ্‌কা দাগ থাকে বলিয়া নদীয়া জেলায় বাগাপোকা বলিয়া থাকে। যখন পাতার উপর কীড়া চলিয়া বেড়ায় তখন ইহার ৬টী পা স্পষ্ট দেখা যায়। ১৭।১৮ দিন পরে ইহারা ডাঁটার উপর আসিয়া পুত্তলি হয়। ঐ চিত্রপটে ১০ চিত্রে পুত্তলি রহিয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই গোল গোল অর্দ্ধেকখানা মটরের মতন কাল কাল ফোঁটা বিশিষ্ট গাঢ় হলদে রঙের পতঙ্গ বাহির হয়। পতঙ্গেরা আবার ডিম দিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক স্ত্রীপতঙ্গ প্রায় ১৫০টী ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহারা যে কেবল বেগুণ আক্রমণ করে তাহা নহে। আলু, লাউ, কুমড়া, করোলা, ঝিঙ্গে প্রভৃতিরও এইরূপে অনিষ্ট করে।

প্রথমেই যখন ডিম দেখা যায় তখনই পাতা সমেত ডিম ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া কিম্বা কোনরূপে নষ্ট করা উচিত। ঝাঁঝরা পাতা দেখিলেই পাতা সমেত কীড়া ও পতঙ্গকে কেরাসিন তেল মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারা উচিত। পতঙ্গেরা উড়িয়া পালায় অতএব তাড়াতাড়ি পাতা ছিঁড়িয়াই জলে ফেলা উচিত।

১৩শ চিত্রপট।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।
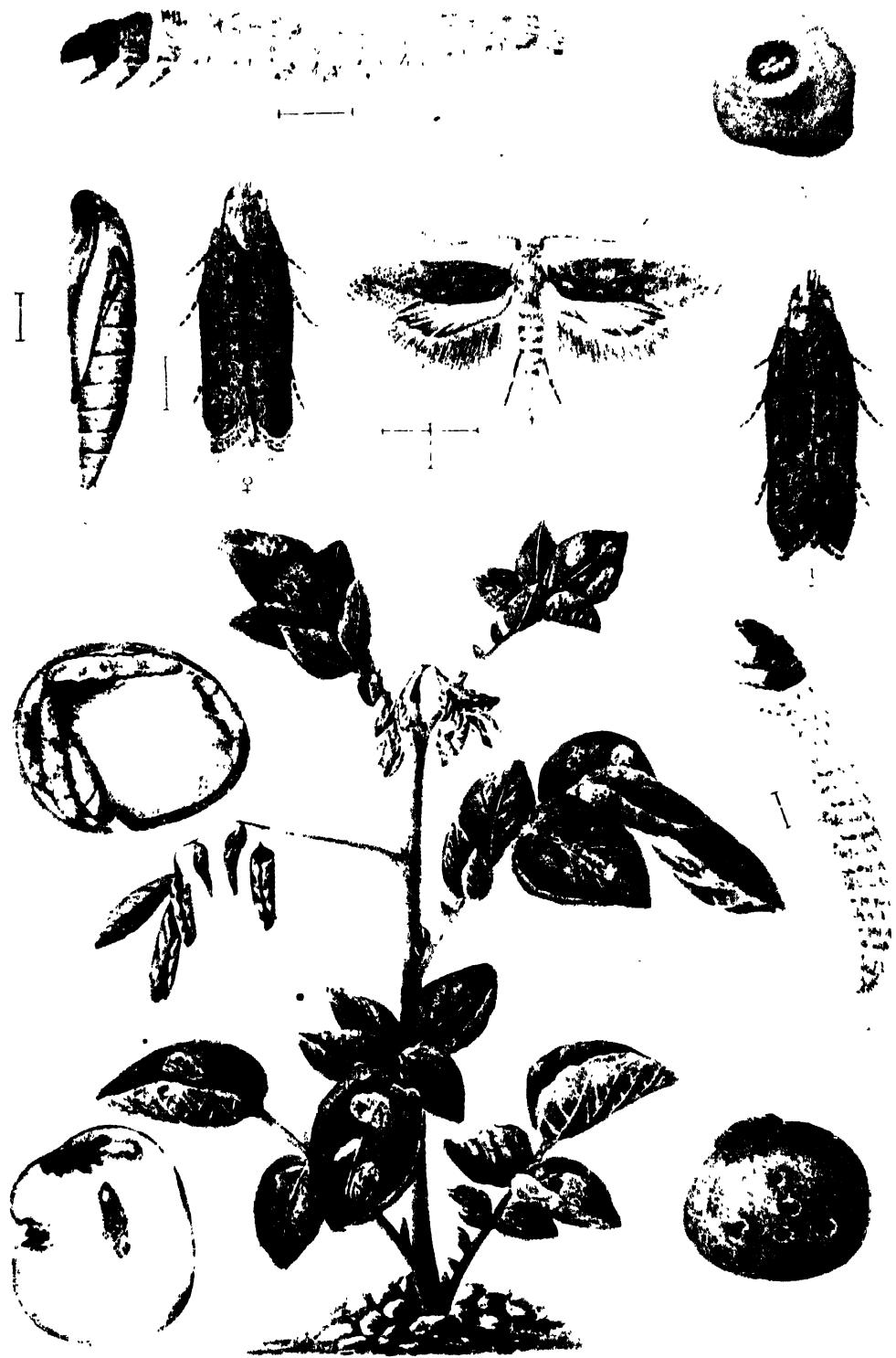
আলু।

কাঁটালে পোকা।

বেগুন গাছে যে কাঁটালে পোকা লাগে তাহারা আলুরও পাতা কখনও কখনও খায়। ইহার কথা পূর্ব্বে বেগুনের সময় বলা হইয়াছে।

কাটুই বা চোরা পোকা।

যেমন ছোলা ও অন্য ফসলে চোরা পোকা বা কাটুই লাগে আলু গাছেও সময়ে সময়ে লাগে। হঠাৎ গাছ শুকাইতেছে দেখিলেই বুঝা যায়। ঐ গাছের তলা খুঁড়িয়া পোকা মারিয়া ফেলিতে হয়। কাটুইয়ের বিস্তৃত বিবরণ ছোলা প্রভৃতির পোকার কথা বলিবার সময় দেওয়া হইয়াছে।
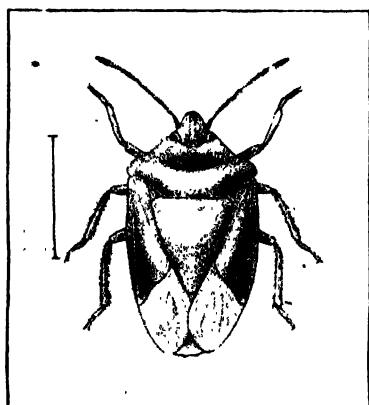
৬২ চিত্র—সবুজ শোষক পোকা।

কাঁটালে পোকা ও চোরা পোকা ছাড়া আর কতকগুলি শুঁয়া পোকাকে আলুর পাতা খাইতে দেখা যায়; ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট কখনও শুনা যায় না। তবে যখনই পোকা দেখিতে পাওয়া যায় তখনই নষ্ট করিতে হয়।

৬২ চিত্রে যে পোকা দেখান হইয়াছে এই রকম সবুজ রঙের পোকা অনেক সময় আলুর গাছে দেখা যায়। ইহারা গান্ধি বা ছারের জাতের এবং গাছের রস চুষিয়া খায়। বেশী হইলে গাছ কমজোর হয়। ইহাদিগকে হাত জালে ধরিয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া বা মাটিতে পুঁতিয়া মারিতে হয়।

বীজ আলুর পোকা।

(১৩শ চিত্রপট।)

আজ কাল আলুর আর একটী ভয়ের কারণ হইয়াছে। আলু ঘরে বা গুদামে রাখিলে উহার ভিতরে ছোট সাদা সাদা সুতলী পোকা ঢুকিয়া নষ্ট করিয়া দেয়; বাহির হইতে কেবল আলুর কোন কোন চোখের কাছে পোকার নাদী, কাল বালির মত অল্প অল্প জড় হইয়াছে দেখা যায়। বাঙ্গালা কি সমস্ত ভারতবর্ষেই এই পোকা আগে ছিল না। বীজ-আলুর সহিত বিলাত হইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে; পাটনা অঞ্চলে ইহার মধ্যেই বিস্তর ক্ষতি করিতেছে।

যখন আলু ক্ষেতে থাকে তখনও গাছের পাতার দুই পর্দ্দার ভিতর কিম্বা ডাঁটার ভিতর ইহার কীড়া থাকিয়া খায়। সেইরূপ গাছের মাথাগুলি এবং খাওয়া পাতা শুকাইয়া যায়। ১৩শ চিত্রপটে এইরূপ খাওয়া গাছ দেখান হইয়াছে। আলু ক্ষেত হইতে তুলিয়া ঘরে আনিলে এই পোকার প্রজাপতি আলুর চোখের কাছে ডিম পাড়িয়া থাকে। এই চিত্রপটে ২ চিত্রে আলুর চোখের উপর কয়েকটী ডিম বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ডিম ফুটিলে কীড়া একেবারে আলুর ভিতর ঢুকিয়া যায় এবং শাঁস কুরিয়া কুরিয়া খাইতে থাকে। পোকার নাদী

কতক ভিতরে থাকে এবং কতক চোখের পাশে বাহিরে আসিয়া জড় হয়। যদিও কীড়া ভিতরে খাইতে থাকে আলুগুলি পচিয়া যায় না। এই চিত্রপটে ৭, ৮ ও ৯ চিত্রে এইরূপ খাওয়া আলু দেখান হইয়াছে। ১, ও ১০ চিত্রে কীড়া বড় করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে। এইরূপে বড় হইলে আলুর ভিতরেই পুত্তলি হয়; চিত্রপটের ৩ চিত্রে পুত্তলি বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। তার পর প্রজাপতি বা সুরুই হইয়া বাহির হয়। ৪, ৫ ও ৬ চিত্রে প্রজাপতি বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। যদি রাত্রিতে পোকা লাগা আলুর ঘরে আলো লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে অনেক সময়েই দেখা যায়, ছোট ছোট সুরুই উড়িয়া আলোর কাছে আসে; সেই প্রজাপতি বীজ আলুর শত্রু।

উপায়—বীজ আলুর পোকা এখনও বাঙ্গালার সব জায়গায় ছড়ায় নাই। যাঁহারা অপর স্থান হইতে বীজ আমদানি করেন তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত। বীজের সহিত পোকা আসে। যে আলুর গাদায় বা ঘরে এই পোকা দেখা দিবে, সেই আলু যেমন করিয়া হউক শীঘ্র খরচ করিয়া ফেলা উচিত; খরচ বাদে যাহা থাকে এবং পচা আলু ও ছাল ইত্যাদি পুড়াইয়া দিতে হয়; যদি তাহা না সম্ভব হয়, সমস্ত পুড়ান উচিত।

আলুর গাছে যদি এই রকমের পোকা লাগে তবে সঙ্গে সঙ্গে সে গাছ উঠাইয়া জ্বালাইয়া দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশে ঘরে বা গুদামে আলু রাখিবার নানা রকম প্রথা আছে। আলুকে যদি কোনরূপে ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায় যাহাতে সুরুইরা আলুর উপর বসিয়া ডিম পাড়িতে না পারে তাহা হইলে বীজপোকা আলুর কিছুই করিতে পারে না। কোথাও আলু বিছাইয়া মশারির মত পাতলা কাপড়ে আলুকে ঢাকিয়া রাখা হয়। দিনের বেলায় সুরুইরা উড়ে না। মাঝে মাঝে দিনের বেলায় ঢাকা খুলিয়া দেখিতে হয়। সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি যেন কিছুতেই আলু না খোলা থাকে। ঠাণ্ডা জায়গায় বালি ঢাকা দিয়া রাখিলে আলু পচে কম এবং পোকাও লাগিতে পায় না। এক ভাগ ক্রুড্ অয়েল তিন ভাগ জলে গুলিয়া আলুকে এই জলে ধুইয়া শুকাইয়া বালির ভিতর রাখিলে আরও ভাল থাকে।

ছাতরা।

বর্ষাকালে আলুতে এবং আলুর আঁকুরে সাদা তুলার মত ছাতরা পোকা হয়। ইহার কথা আগে বলা হইয়াছে। যে গাদায় ছাতরা দেখা যায় সেই গাদার সমস্ত আলুকে চুণের জলে বা তুঁতের জলে ধুইয়া আবার শুকাইয়া রাখিতে হয়। আলু ভিজা রাখিলে বেশী পচে। ক্রুড্ অয়েল ইমলসনের ও ফিনাইলের জলে ধুইলেও হয়। ব্যবস্থা না করিলে সমস্ত আলুতেই ছাতরা ধরে।

———o———

১৪শ চিত্রপট।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শসা কুমড়া ইত্যাদি।

১৫শ চিত্রপটের ৯ চিত্রে লাল ও নীল রঙের যে দুই পোকা পাতার উপর দেখান হইয়াছে, ইহারা চারা গাছের পাতা খাইয়া কখনও কখনও গাছ মারিয়া ফেলে। গৃহস্থেরা প্রায়ই ২।৫টা শসা, কুমড়ার গাছ লাগায়। এখানে ওখানে ২।৫টা গাছ থাকিলে তাহারই বিশেষ ক্ষতি করে। যেখানে অনেক গাছ লাগান হয় সেখানে তত ক্ষতি হয় না। গাছ একবার বড় হইয়া বেশী পাতা হইলে ইহারা যদিও পাতায় ছিদ্র করিয়া খাইতে থাকে, আর কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না। যাহারা ২।৫টা গাছ লাগায় তাহারা যদি গাছের কাছে একটী কাঠী পুতিয়া তাহার উপর দিয়া ছোট জাল কিম্বা মশারির মত পাতলা কাপড় ঢাকা দিতে পারে তাহা হইলে পাতা খাইতেপারে না। আমাদের দেশে গাছে ছাই দেয়। এই ছাইয়ের সঙ্গে যদি একটু কেরাসিন মিশাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়। ছাইয়ের বদলে গুঁড়া চুণও দেওয়া চলে। ৫ সের আন্দাজ ছাই কিম্বা চুণের সঙ্গে এক পোয়া কেরাসিন মিশাইতে হয়। সমস্ত পাতার উপর বেশ করিয়া এই ছাই বা চুণ ছিটাইয়া দিতে হয়। অধিক গাছ হইলে লেড্ আর্সিনিয়েট নামক সেঁকো বিষের জল পাতায় ছিটাইয়া পোকা মারিতে হয়।

বেগুনের পাতায় যে কাঁটালে পোকা লাগে ঝিঙ্গে, করোলা, শসা প্রভৃতির পাতায় এই কাঁটালে পোকা এক এক সময় খুব বেশী হয়। বেগুনে কাঁটালে পোকার বিবরণ দেখ।

কখনও কখনও পাতার নীচে জাব পোকা লাগিয়া থাকে। যব গমে জাব পোকার বিবরণ দেখ।

এক রকম সাদা রোঁয়াযুক্ত শুঁয়া পোকা প্রায়ই পাতা খায়। ইহারা পাটের শুঁয়া পোকার জাতের। শুঁয়া পোকার বিবরণ পাটে দেখ।

ফুল ধরিতে আরম্ভ করিলে এক রকম কাচ পোকা বা বড় ঘোড়া পোকা (১৭শ চিত্রপটের ৯ চিত্র) আসিয়া ফুল খাইয়া দেয়। ইহারা কখনও কখনও অনেক আসে। সুবিধা মত ধোঁয়া দিতে পারিলে পলায়। তাহা না হইলে হাত জালে ধরিয়া মারিতে হয়।

ফলের মাছি পোকা।

(১৪শ চিত্রপট।)

উপরে যে পোকাদের কথা বলা হইল তাহাদের দ্বারা যত ক্ষতি হউক না হউক শসা লাউ ফুটী তরমুজ খরমুজ প্রভৃতি সকল ফলেই যে "মুড়ীর" মত সাদা সাদা পোকা লাগে তাহারাই বিশেষ ক্ষতি করে। চাষী মাত্রেই এই পোকা জানে। চাষীরা পোকা ধরা ফল ছিঁড়িয়া মাঠের ধারে ফেলিয়া রাখে। ১৪শ চিত্রপটের ২ চিত্রে এই পোকা বড় করিয়া আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। পোকা ধরা ফল কাটিলে এই রকম অনেক পোকা নড় বড় করিয়া বেড়াইতেছে দেখা যায়। এই পোকারা এই চিত্রপটের ৬ চিত্রে যে মাছিকে বড় করিয়া আঁকিয়া দেখান হইয়াছে এই মাছির কীড়া বা ক্রমি। ঘরে যে মাছি দেখা যায় ইহার চেহারা তাহাদের মত নয়। একবার দেখিলেই ফলের মাছি সহজেই চেনা যায়। কাঁটা ফুটিয়াই হউক কিম্বা কোন রকম চোট লাগিয়াই হউক ফল দাগী হইলেই এই ক্ষত স্থান খুঁজিয়া খুঁজিয়া মাছিরা ফলের ভিতর ডিম ঢুকাইয়া দেয়। চিত্রপটের ১ চিত্রে ডিম ও ফলের ভিতর ক্রমি দেখান হইয়াছে। প্রায় দেড় দিন পরেই ডিম ফোটে এবং কীড়ারা ফলের ভিতর খাইতে থাকে। বাহির হইতে কিছুই জানা যায় না। কীড়ারা খাইতে খাইতে ফল পচিয়া যায়। ৫।৬ দিন

মাত্র খাইয়া কীড়ারা বড় হয় এবং প্রায় সকলেই ফল হইতে বাহির হইয়া মাটির নীচে যাইয়া পুত্তলি হয়। পুত্তলি চিত্রপটের ৩ চিত্রে দেখান হইয়াছে। তারপর ৬।৭ দিন পরে মাছি হইয়া বাহির হয় এবং আবার ডিম পাড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে ডিম হইতে আবার মাছি হইতে কেবল মাত্র ১৪।১৫ দিন সময় লাগে।

ফলকে যদি মশারির মত পাতলা কাপড় কিম্বা এমন মিহী জাল দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায় যাহার ভিতর দিয়া মাছি গলিয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে মাছি ফলের উপর বসিতে পায় না এবং ফলের মধ্যে ডিমও পাড়িতে পারে না। জাল কিম্বা কাপড় ঢিলা করিয়া বাঁধিতে হয়; আঁট করিয়া বাঁধিলে জাল বা কাপড়ের ছিদ্র দিয়া ডিম ঢুকাইয়া দিতে পারে। যে সব ফল মাটি চাপা দিয়া রাখিলে চলে তাহাদিগকে মাটি ঢাকা রাখিতে হয়। কোথাও কোথাও কাগজের বড় বড় ফন্দেলের মত করিয়া এই ফন্দেল দ্বারা ফল ঢাকিয়া রাখা হয়। যে কোন উপায়েই হউক মাছি যদি ফল ছুঁইতে কিম্বা ফলের উপর বসিতে না পায় তাহা হইলে ফলে ডিম পাড়িতে পারে না এবং পোকাও হয় না।

ফলে পোকা দেখিলেই কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়াই হউক আর পুড়াইয়াই হউক পোকা নষ্ট করা উচিত। পোকা ধরা ফল যেখানেই ফেলা হউক কীড়ারা পুত্তলি হইয়া আবার মাছি হইয়া বাহির হয়। তার পর আসিয়া নূতন নূতন ফলে ডিম পাড়ে।

যদি কোন ফলের একটু কাটিয়া দেওয়া যায় তবে মাছিরা প্রায় এই কাটা জায়গায় আসিয়া ডিম পাড়ে। অতএব মাছিদিগকে এইরূপে ফাঁদে ফেলা যায়। প্রথম যখন ফল হয় তখম এখানে একটা ওখানে একটা ফলের ডগই হউক আর যে স্থানই হউক একটু কাটিয়া দিতে হয়। মাছিরা এই কাটা জায়গায় ডিম পাড়িবে। দুই দিন পরে এই কাটা দিকের কতকটা পুড়াইয়া দিয়া ফলের বাকীটা ব্যবহার করা চলে। ইহা দ্বারা মাছির ডিম ও যদি ফুটিয়া থাকে ছোট কীড়াদিগকে মারা হইল এবং মাছির বংশ বাড়িতে দেওয়া হইল না, অথচ সমস্ত ফলও নষ্ট হইল না। যে সব ফল এইরূপে ফাঁদ করা যায় তাহাদিগকে দুইদিনের বেশী থাকিতে দিতে নাই। কারণ দুইদিনের মধ্যেই ডিম ফোটে এবং বেশী দিন থাকিলে কীড়া ভিতরে চলিয়া আসিতে পারে।

ধোঁয়া দিতে পারিলে মাছিরা ধোঁয়ার কাছে আসে না। কিন্তু ধোঁয়া দেওয়া সব সময় সম্ভব হইয়া উঠে না।

———o———

১৫শ চিত্রপট।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কপি।

যখন হাপরে বা গামলায় কপির চারা হয় তখন ইহাদিকে পান্‌লা জাল কিম্বা মশারির মত পাত্‌লা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত। তাহা না করিলে মাঠফড়িঙ আঁকুর খাইয়া কিম্বা যেমন চারা হয় পাতা খাইয়া চারা বড় হইতে দেয় না।

হাপর হইতে উঠাইয়া ক্ষেতে লাগাইবার পরেও মাঠফড়িঙ পাতা খাইয়া গাছ মারিয়া দেয়। অতএব মাঠ-ফড়িঙ ক্ষেত হইতে ধ্বংস করিয়া গাছ বসাইলে ভাল হয়।

ক্ষেতে গাছ বসাইবার পর উইচিঙড়িতে গাছ কাটিয়া দেয়। উইচিঙড়ির বিবরণ তামাকে দেখ।

অনেক সময় চোরা পোকা গাছ কাটে। কপির ক্ষেত হইতে চোরা পোকা বাছিয়া মারাই সহজ।

তামাকের লেদা পোকাও কপিতে লাগে। ইহারা কপির মধ্যে বড় বড় ছিদ্র করিয়া খায়।

৮ম চিত্রপটের ৯ চিত্রে যে সবুজ ডোরা কাটা পোকা দেখান হইয়াছে ইহারাও কপি খায়। ইহার বিবরণ ছোলা মসুরে দেখ। ইহাকে বাছিয়া মারাই সহজ।

কপিতে জাব পোকা লাগে। এক এক সময় সমস্ত গাছ ছাইয়া ফেলে। প্রথম হইতেই ইহাদের উপর কেরাসিন মিশ্রণ বা ক্রুড্‌ অয়েল ইমল্‌সনের জল ছিটাইয়া মারা উচিত। তাহা না করিলে শীঘ্রই ছড়াইয়া পড়ে।

সুরুই পোকা।

১৫শ চিত্রপটের ২ চিত্রে যে ছোট সুতলী পোকা পাতা খাইতেছে ইহা কপির অনেক ক্ষতি করে। গাছ যখন ছোট থাকে তখন পাতায় ছিদ্র করিয়া খায়। ফুলকপির ফুল হইলে ফুলের ভিতর ছিদ্র করিয়া খায়। বাঁধা কপিকেও ছিদ্র করিয়া নষ্ট করে। ১৫শ চিত্রপটের ৪ চিত্রে যে ছোট প্রজাপতি বা সুরুই বসিয়া আছে ইহাই এই সুতলী পোকার প্রজাপতি। দিনের বেলায় অনেক এই রকম সুরুই কপির উপর বসিয়া থাকিতে এবং এখানে ওখানে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। সুরুই উড়িয়া উড়িয়া পাতা ও কপির উপর ছোট ছোট ডিম পাড়ে। শুধু চোখে ডিম বালিকণার মত দেখায়। চিত্রপটের ১ চিত্রে পাতার উপর ডিম বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। শীত থাকিলে ডিম ৬।৭ দিন পরে ফোটে। ছোট কীড়ারা প্রথমে পাতার কিম্বা কপির ছাল খাইয়া একটু বড় হইলে ছিদ্র করিয়া খাইতে থাকে। শীতের সময় কীড়ারা প্রায় ১৫।১৬ দিন খাইয়া প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি বড় হয়। তার পর পাতা কিম্বা কপির উপরেই চিত্রপটের ৩ চিত্রের মত একটী পাতলা জালের গুটী করিয়া ইহার ভিতর পুত্তলি হয়। ৯।১০ দিন পরে পুত্তলি হইতে সুরুই বাহির হয়। গরম পড়িলে দুই দিন পরেই ডিম ফোটে কীড়া প্রায় ৭ দিন খাইয়া পুত্তলি হয় এবং পুত্তলি হইবার ৪।৫ দিন পরেই সুরুই বাহির হয়।

যে কোন উপায়ে হউক মারিয়া বংশ যাহাতে না বাড়ে তাহার উপায় করিতে পারিলে লোকসান করিতে পারে না। লেড্‌ আর্সিনিয়েট নামক সেঁকো বিষের জল ছিটাইতে পারিলে পোকারা মরে। কিন্তু কপির উপর বিষ ছিটান উচিত নয়। কেরাসিন মিশ্রণ ছিটাইতে পারা যায় কিম্বা নিম্নলিখিত উপায়ে তামাক ও সাবানের জল করিয়া ছিটাইতে পারা যায়। যাহাই হউক ঝারি পিচকারী দ্বারা ছিটান উচিত।

এক পোয়া তামাক দশ সের জলে ভিজাইয়া তামাকের জল কর। এক ছটাক সাবান কুচি কুচি করিয়া দুই সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিয়া সাবান জল কর। তামাক ও সাবানের জল ভাল করিয়া মিশাইয়া লও।

পাতার উপর ভাল করিয়া ছাই মাখাইয়া দিলেও অনেক সময় পোকারা আর পাতা খায় না। পাতা যখন একটু ভিজা থাকে তখন ছাই দিতে হয় তাহা হইলে ছাই ভাল লাগিয়া থাকে।

এই সুরুই পোকা মেড়ির সঙ্গে থাকিয়া মেড়ির মত সরিষা মূলা প্রভৃতি নষ্ট করে।

সুরুই পোকার কীড়া অপেক্ষা একটু বড় এবং আরও সাদা রঙের এক রকম অনেক সুতলী পোকা এক এক সময় কপির পাতা খায় এবং ফুল ও বাঁধা কপি ছিদ্র করিয়া খায়; তার পর ডাঁটার ভিতর ফুকর করিয়া খাইতে থাকে। ডাঁটায় লাগিলে গাছ একবারে মরিয়া যায়। তবে ইহারা একেবারে ডাঁটার ভিতর ঢোকে না। পাতা খাইয়া বড় হইলে তার পর ডাঁটায় ঢোকে। ইহাদের প্রজাপতি সাদা রঙের এবং ডানায় ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে; দেখিতে অনেকটা ২য় চিত্রপটে ৬ চিত্রে নলীপোকার প্রজাপতির মত। ইহারা শালগম ও গাজোর প্রভৃতিতেও লাগে। প্রথমে পাতা খাইয়া তার পর মূলে ঢোকে।

সুরুই পোকার মত ইহাদেরও ব্যবস্থা করা যায়। প্রথমে ইহারা পাতার উপর প্রায় এক জায়গায় অনেক থাকে। সেই সময় নজর করিয়া অনায়াসে পাতা সহিত ছিঁড়িয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে কিম্বা মাটিতে পুঁতিয়া মারা যায়।

———o———

বেশী হইলে এই দুই পোকাকেই সমস্ত গাছ সহিত উঠাইয়া বা যে কোন রকমে হউক ধ্বংস করা উচিত; তাহা হইলে অন্য গাছ বাঁচান যায়।

সাদা প্রজাপতি।

১৫শ চিত্রপটের ৬ চিত্রে যে শুঁয়া পোকা পাতার উপর রহিয়াছে এক এক সময় এই রকম শুঁয়া পোকা অনেক হইয়া ফুল ও বাঁধা কপির সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলে; পাতার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না, কেবল শিরগুলি বাকী থাকে। পাতা খাইয়া পোকারা অদৃশ্য হয়। যখন এই শুঁয়া পোকা লাগে তখন কপির উপর ১৫শ চিত্রপটের ৮ চিত্রের ন্যায় অনেক সাদা সাদা প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়ায়। শুঁয়া পোকারা এই প্রজাপতির কীড়া। প্রজাপতি পাতার উপর চিত্রপটের ৫ চিত্রের ন্যায় এক জায়গায় অনেকগুলি ডিম পাড়ে। পাতার দুই পীঠেই ডিম পাড়ে। ৪ দিন পরে ডিম ফুটিলে ছোট কীড়ারা প্রথমে পাতার ছাল খায়। তার পর যত বড় হয় সমস্ত পাতাই খাইয়া ফেলে। প্রায় ১৬ দিন খাইয়া কীড়ারা বড় হয়। বড় হইলে কপির ক্ষেত ছাড়িয়া কীড়ারা দূরে চলিয়া যায়। কখনও কখনও বড় বড় গাছে উঠে কিম্বা ঘরের দেওয়াল ও চালের উপর যাইয়া চিত্রপটের ৭ চিত্রের ন্যায় পুত্তলি হয়। ৬ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং কপির উপর আসিয়া উড়িতে থাকে ও ডিম পাড়ে।

ডিম সহজেই পাতার উপর নজরে পড়ে, ডিম ছিঁড়িয়া নষ্ট করাই সহজ উপায়। পাতার উপরেই হাতে করিয়া ঘসিয়া নষ্ট করিলেও হয়। যদি ডিম নষ্ট করা না হয় তাহা হইলে কীড়াদিগকে কেরাসিন তেল মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারা উচিত। প্রজাপতিদিগকেও হাতজালে ধরিয়া অনায়াসেই মারা যায়।

১৫শ চিত্রপটের ১০ চিত্রে যে পোকা দেখান হইয়াছে ইহারা গান্ধির জাতের। ইহারা কপি শালগম সরিষা প্রভৃতি অনেক ফসলের রস চুষিয়া খায়। ইহাদের সংখ্যা এক সময় খুব বেশী হয়। পাতা ও ডাঁটার উপরে সাজাইয়া এক জায়গায় অনেকগুলি গোলদানার মত ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়া ছানারাও খাইতে থাকে। তখন ইহাদের ডানা থাকে না। যত বড় হয় ক্রমে ক্রমে ডানা গজায়। ইহাদের ডিম নষ্ট করিতে পারিলেই ভাল হয়। পোকাদিগকে ধরিয়া মারা ছাড়া উপায় নাই।

———o———

১৬শ চিত্রপট।

সাদা ও রাঙ্গা আলুর পোকা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাঙ্গা আলু, সাদা আলু, ঢেঁড়স, নটে খাড়া।

রাঙ্গা আল ও সাদা আলু।

৫১ চিত্রে যে তিলের লেজওয়ালা কীড়ার কথা বলা হইয়াছে এই কীড়া কিম্বা এই জাতেরই মেটে রঙের এক রকম কীড়া সাদা ও রাঙ্গা আলুর পাতা খায়। ইহাদের দ্বারা অনিষ্ট কমই হয়। তবে প্রথম হতে বাছিয়া মারিয়া দেওয়া ভাল। বংশ বাড়িলে অনিষ্ট হইতে পারে।

১৬শ চিত্রপটের ৬নং চিত্রে যে লম্বা শুঁড়ওয়ালা পোকা অঙ্কিত হইয়াছে ইহা হইতেই সাদা ও রাঙ্গা আলুর বিশেষ ক্ষতি হয়। ১নং চিত্রে ইহার ডিম বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। শুঁড় দ্বারা আলুতে গর্ত্ত করিয়া কিরূপে ডিম পাড়ে ২ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। আলুর ডাঁটাতেও এইরূপে গর্ত্ত করিয়া ডিম পাড়ে। ৩ ৪ দিন পরে ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া ভিতরে কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া যায। ৩নং চিত্রে কীড়া বড় করিয়া দেখান হইযাছে। প্রায় ২০ দিন খাইয়া কীড়া বড় হইলে আলু কিম্বা ডাঁটার ভিতরে পুত্তলি হয়। ৪ ও ৫ নং চিত্রে পুত্তলি বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ৫।৬ দিন পরে ৬নং চিত্রের ন্যায় পতঙ্গ বাহির হইয়া আবার ডিম পাড়িতে থাকে।

যখন আলু না পায তখন ডাঁটায় ডিম পাড়ে। অনেক সময় দেখা যায় ডাঁটার ভিতর দিয়া খাইতে খাইতে কীড়া মাটির নীচে আলুতে যাইয়া পৌঁছায়। যে সমস্ত কীড়া লতার গোড়ায় থাকে তাহারাই আলুতে যাইতে পারে। যদি আলু মাটি ঢাকা না থাকিয়া মাটি হইতে জাগিয়া থাকে তাহা হইলে কেবল আলুতেই ডিম পাড়ে। পোকা লাগা আলুর ভিতরটী কিরূপে কাল হইয়া খারাপ হইয়া যায় ৭ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। এইরূপ আলুর ভিতর অনেক কীড়া ও পুত্তলি থাকে।

যদি আলু রুইয়া ফসল লাগান হয় তাহা হইলে আলুকে মাটির একটু নীচে বোযা উচিত, যাহাতে পোকা ইহাতে পৌঁছিতে না পারে। আর যখন আলু ফলিতে আরম্ভ হয় তখন সমস্ত আলুকে বেশী করিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখা উচিত। কোন আলুই যেন মাটির উপর জাগিযা না থাকে।

যখন আলু তোলা হয় সমস্ত পোকাধরা আলু পুড়াইয়া নষ্ট করা উচিত। মাঠে ফেলিয়া রাখা উচিত নয় কিম্বা ঘরে আনাও উচিত নয়। ঘরে আনিলে ঘরের ভাল আলুতে পোকা লাগিবে।

ঢেঁড়স।

ঢেঁড়স ও কাপাস এক জাতের গাছ। ডাঁটার পোকা, গুটীর পোকা, ফন্দেল পোকা, কাপাসী পোকা প্রভৃতি কাপাসের সমস্ত পোকা ঢেঁড়সে লাগে। তাছাড়া ঢেঁড়সে অন্যান্য পোকাও লাগিয়া থাকে। একটু নজর রাখিয়া পোকা বাছিয়া মারিলে কিছুই ক্ষতি হয় না। কাপাসের গুটীর পোকাই ঢেঁড়সে ছিদ্র করিয়া কাণা করিয়া দেয়। এই ছিদ্র দিয়া ইহারা ভিতরে ঢুকিয়া খায়। কাণা ঢেঁড়স সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া পুড়াইয়া নষ্ট করা উচিত। যেখানে কাপাসের চাষ আছে সেখানে কাপাসের সময় ছাড়া অন্য সময় ঢেঁড়স জন্মান উচিত নয়। অন্য সময় ঢেঁড়স জন্মিলে ঢেঁড়সে পোকাদের বংশ বাড়ে এবং কাপাসে বেশী পোকা হয়। কাপাসের সময় ঢেঁড়স চাষ করিলে অনেক পোকা কাপাস ছাড়িয়া ঢেঁড়সে লাগে। কিন্তু পোকা লাগিলেই পোকা নষ্ট করা উচিত।

নটে খাড়া।

নটে খাড়ার ডাঁটার ভিতর এক রকম সাদা সাদা পোকা লাগে। ইহারা ভিতরে কুরিয়া কুরিয়া খায় এবং যেখানে খায় সেই স্থানটী গিরার মত একটু ফুলিয়া উঠে। ফোলা দেখিয়াই পোকা আছে বলিয়া ধরা যায়। পোকা লাগিলেও গাছ মরিয়া যায় না। অবশ্য গাছ কমজোর হয়। ইহারা ১৭শ চিত্রপটের ২ চিত্রের ন্যায় এক কঠিনপক্ষ পতঙ্গের কীড়া। কীড়ারা গাছের ভিতরেই পুত্তলি হয় এবং পরে পতঙ্গ হইয়া বাহির হয় এবং আবার গাছে ডিম পাড়ে। যাহাতে ইহাদের বংশ না বাড়ে সেই জন্য গাছ একবারে না কাটিয়া ফোলা গিরার কাছে লম্বালম্বি ফাড়িয়া পোকা বাহির করিয়া মারা যায় এবং সময় মত গাছ ব্যবহার বা বিক্রয় করা চলে।

---o---

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ফলের বাগান।

উই।

ফলের গাছ বসাইবার পর অনেক সময় গাছে উই লাগিয়া গাছ মারিয়া দেয়। গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া জলের সঙ্গে একটু কেরাসিন তেল মিশাইয়া গোড়ায় দিলে উই আসে না। কেরাসিন তেল গাছে লাগিলে গাছের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। সেই জন্য সাবানের সহিত কেরাসিন মিশ্রণ করিয়া এক সের আন্দাজ মিশ্রণ ৩০ সের কিম্বা ৪০ সের জলে মিশাইয়া গোড়ায় দিতে হয়। ইহাতে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। এক ছটাক আন্দাজ ক্রুড্ অয়িল ইমল্সন্ বা ফিনাইল আন্দাজ ১০ সের জলে মিশাইয়া দিলেও উপকার হয়। কেরাসিন মিশ্রণ বা ক্রুড্ অয়িল ইমল্সন বা ফিনাইলের জল দিলে উই আসে না এবং যদি থাকে, তবে এই জল দিলে গন্ধে পালায়। এমন পরিমাণ দিতে হয় যে জল মাটির অনেক ভিতর পর্য্যন্ত যায়। একবার এই জল দিলে কিছু দিন পর আবার উই আসিতে পারে। অতএব উপদ্রব বেশী হইলে অবস্থা বুঝিয়া ৮।১০ দিন কিম্বা আরও বেশী দিন অন্তর এক এক বার এই জল দিতে হয়। (উইএর বিস্তৃত বিবরণ দেখ)

আমের ফলের মাছি পোকা।

খাইবার জন্য পাকা আম লইয়া অনেক সময় দেখা যায় ইহার ভিতর মুড়ীর মত পোকা নড়বড় করিতেছে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতির ফলে যেমন মাছির পোকা হয় এই পোকারাও সেই রকম মাছির পোকা। এই ফলের মাছির পোকার বিবরণ লাউ কুমড়াতে দেখ। পিচেও এই রকম অনেক পোকা লাগে। মাছি আসিয়া ফলে বসিতে পারিলেই ডিম পাড়ে। গাছের নীচে যদি এমন ভাবে ধোঁয়া দিতে পারা যায়, যে ধোঁয়া লাগিয়া মাছি আসিতে না পারে তাহা হইলে পোকা হয় না। ফলে পোকা দেখিলেই সেই ফল না ফেলিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। অনেক সময় পোকা ধরা ফল বাগানেই ফেলিয়া রাখা হয়।

আমের ভোঁ পোকা।

রঙ্গপুর পূর্ণিয়া প্রভৃতি জায়গায় আমে ভোঁ পোকা লাগে। আমের ভিতর হইতে ভোঁ শব্দ করিয়া যে পোকা উড়িয়া যায় তাহা ৬৩ চিত্রে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। একই গাছে বৎসর বৎসর পোকা লাগে; কিন্তু পাশের গাছে প্রায় লাগিতে দেখা যায় না।
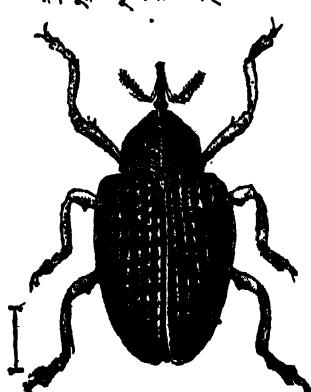
৬৩ চিত্র—আমের ভোঁ পোকা।

এই ভোঁ পোকা ছোট ছোট আম যেমন ধরে তাহাদের উপর ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া ছিদ্র করিয়া আমের ভিতর ঢোকে। কীড়া খুব ছোট এবং খুব সরু ছিদ্র করিয়া ঢোকে। আম বাড়িতে বাড়িতে ছিদ্র বুজিয়া যায়। সেইজন্য যদিও ভোঁ পোকার কীড়া ভিতরে খায়, বাহির হইতে কিছুই জানা যায় না। কীড়া প্রায় শাঁস খায়, কিন্তু আঁটির ভিতর পর্য্যন্তও যাইতে পারে। কীড়া দেখিতে অনেকটা ১৬শ চিত্রপটের ৩ চিত্রের ন্যায়। কীড়া বড় হইয়া আমের

ভিতরেই পুত্তলি হয়। তার পর ভোঁ পোকা হইয়া আম কাটিয়া বাহির হয়। আমের সঙ্গে ভোঁ পোকার বৎসরে একবার মাত্র বংশ হয়। আম হইতে বাহির হইয়া ভোঁ পোকা ডালে কিম্বা গুঁড়িতে যাইয়া বসে। ইহার রঙ গাছের ছালের রঙের মত। ছালের উপর বসিয়া থাকিলে চেনা যায় না। ছালের উপরে বসিয়াই বর্ষাকাল ও শীতকাল কাটায়। শীতের পরে গরম পড়িলে আবার ছোট ছোট আমে ডিম পাড়ে। ভোঁ পোকাকে যেখানে বসাইয়া দেওয়া যায় প্রায় সেই খানেই বসিয়া থাকে। সেই জন্য প্রায় এক গাছ হইতে অন্য গাছে যায় না। কাজেই একই গাছে পোকা লাগিতে দেখা যায়।

গাছের ছালে যদি কেরাসিন তেল এমন করিয়া মাখাইয়া দেওয়া যায় যে ফাটের ভিতর এবং সমস্ত জায়গাতেই তেল লাগে তাহা হইলে ভোঁ পোকা মরিয়া যায়। বউল বা মুকুল ধরিবার সময় কিম্বা শীত থাকিতে থাকিতে তেল মাখাইতে হয়।

অনেক পোকাই গাছের গোড়ায় মাটিতে পড়িয়া যায়, সেই জন্য শীতকালে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া উলট পালট করিয়া দিতে হয়। এই উপায় করিলে বৎসর কয়েকের মধ্যেই ভোঁ পোকা নির্ম্মূল করিতে পারা যায়।

আম মাছি।
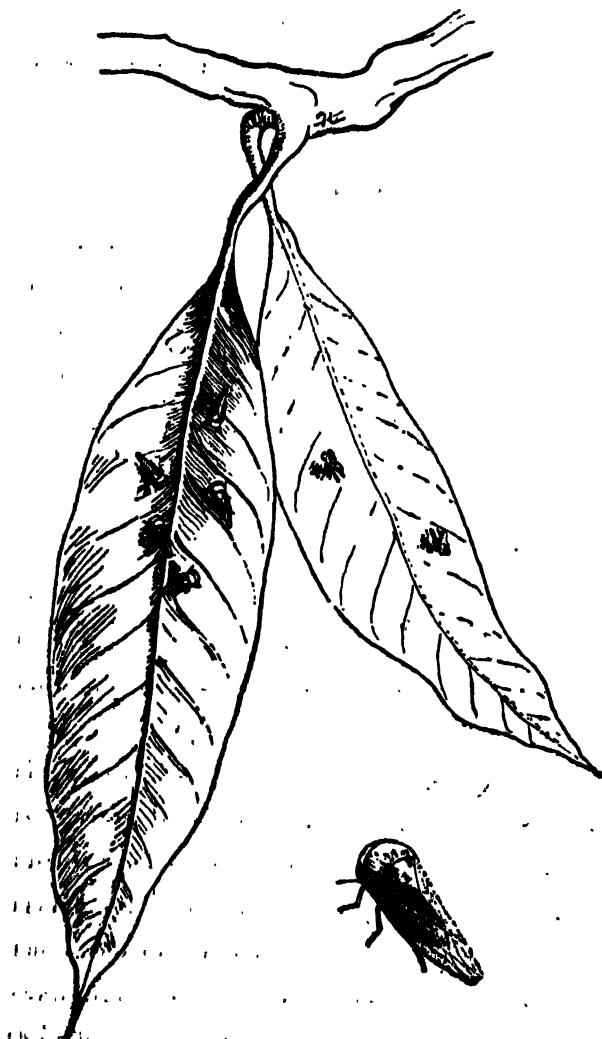
আম ও লিচু গাছে শীতের পর এক রকম ছোট ছোট পোকা হয়। ইহারা দেখিতে আম পাকিবার সময় যে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে সেই ঝিঁঝিঁ পোকারমত, কিন্তু আকারে খুব ছোট। ৬৪ চিত্রে ইহাদিগকে দেখান হইয়াছে। ইহাদিগকে কোথাও কোথাও "আম মাছি" বলে। এই সময় গাছের তলায় যাইলে অনেক পোকা উড়িয়া আসিয়া মুখে চোখে পড়ে। ইহারা গান্ধির জাতের পোকা। কচি কচি ডালের এবং বউল বা মুকুলের ডাঁটার রস চুষিয়া খায়। বেশী হইলে এত রস খাইয়া ফেলে যে আর ফল ধরে না। আম মাছি কচি কচি পাতার শিরে ছিদ্র করিয়া ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়া ছানারা রস চুষিয়া খাইতে থাকে। ছানাদের ডানা থাকে না; ক্রমে ক্রমে ৭।৮ দিনের মধ্যেই ডানা সম্পূর্ণ গজায়।

গাছের গোড়ায় ধোঁয়া দিলে বিশেষতঃ কোন গন্ধবিশিষ্ট পাতার ধোঁয়া দিলে ইহাদের গায়ে যদি ধোঁয়া লাগে তবে গাছ ছাড়িয়া পালায়।

কড়া ফিনাইল কিম্বা ক্রুড্ অয়িল ইমলসনের জল দমকলে করিয়া ইহাদের উপর ছিটাইয়া দিতে পারিলে একবারেই অধিকাংশ মরিয়া যায়।

৬৪ চিত্র—আম মাছি।

লেবু।

লেবুর পোকার কথা প্রথমেই বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে নজর রাখিয়া পাতার উপরের ডিম হাতে ঘসিয়াই হউক বা পাতা ছিঁড়িয়া পুড়াইয়াই হউক নষ্ট করিতে পারিলে পোকা হয় না। পোকা হইলে বাছিয়া কেরাসিন তেল মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারা উচিত।

দাড়িম।

দাড়িম ফলের ভিতর এক রকম মোটা কাল রঙের এবং পীঠের মাঝে সাদা দাগ যুক্ত শুঁয়া পোকা ঢুকিয়া বীজ খায়। যে দাড়িমে একটী মাত্রও পোকা লাগে, সে দাড়িম নষ্ট হইয়া যায়। ৬৫ চিত্রে এই পোকাকে দ্বিগুণ করিয়া দেখান হইয়াছে। ৬৬চিত্রে ইহার প্রজাপতি বসিয়া রহিয়াছে,

৬৫ চিত্র—দাড়িম ফলের শুঁয়া পোকা।
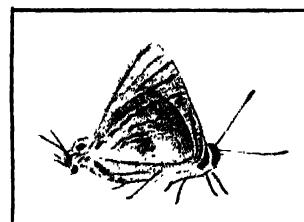
৬৬ চিত্র—দাড়িমের শুঁয়া পোকার প্রজাপতি।

প্রজাপতির রঙ সাদা। এই প্রজাপতি কেবল দিনের বেলা উড়িয়া উড়িয়া ফুল ও ফলের উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে কীড়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়। অনেক সময় এক ফল হইতে বাহির হইয়া অপর ফলে ঢোকে। সেই জন্য পোকা লাগা ফলে ছিদ্র দেখা যায়। খাইয়া বড় হইলে ফলের ভিতরেই ছিদ্রের দিকে মাথা করিয়া কিম্বা ফলের বাহিরে বা বোঁটার উপরে পুত্তলি হয়। ৬৭ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে। তার পর প্রজাপতি হইয়া আবার ডিম পাড়ে।

৬৭ চিত্র—দাড়িমের শুঁয়া পোকার পুত্তলি।

বংশ যাহাতে না বাড়ে সেই জন্য মাঝে মাঝে দেখিয়া যত কাণা ফল তুলিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। প্রজাপতি দিনের বেলায় উড়িয়া বেড়ায়, হাত জালে করিয়া ধরিয়া মারিতে পারিলে উত্তম হয়। ফল ফুল যদি ঢিলা করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায় তাহা হইলে প্রজাপতি ফলের উপর ডিম পাড়িতে পায় না এবং ফলে পোকাও লাগে না।

পানফল।

১৫শ চিত্রপটে ৯ চিত্রে শসা কুমড়ার যে লাল পোকা দেখান হইয়াছে এই রকমের এক পোকা পানফলের পাতা খায়। ইহারা পাতার উপরে এক জায়গায় অনেক হল্‌দে রঙের গোল গোল ডিম পাড়ে। ডিম সহজেই নজরে পড়ে। ডিম ফুটিলে কীড়ারাও পাতা খায়। কীড়া দেখিতে অনেকটা ১৯শ চিত্রপটের ৯ চিত্রের কীড়ার মত। কীড়া বড় হইলে পাতার উপরেই পুত্তলি হয়। পুত্তলি দেখিতে অনেকটা ১৯শ চিত্রপটের ১০ চিত্রের মত। তার পর পতঙ্গ হইয়া আবার ডিম পাড়ে। এক এক সময় ইহাদের সংখ্যা এত বেশী হয় যে পানফলের পাতা প্রায় থাকে না। মাঝে মাঝে নজর রাখিয়া ডিম, কীড়া, পুত্তলি জড় করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিলে কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। পতঙ্গকেও সহজে ধরা যায়।

নারিকেল, তাল ও খেজুর গাছের পোকা।

(১৭শ চিত্রপট।)

১৭শ চিত্রপটের ৮ চিত্রে যে শিঙওয়ালা বড় ভোঁমরা পোকা রহিয়াছে ইহা নারিকেল, খেজুর ও তাল গাছের মাজ পাতা খায় এবং যেখান হইতে মুচি ধরিয়া থাকে তাহার গোড়ায় ফুকর করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া খায়। তাহা হইলে আর মুচি হয় না এবং সে গাছ হইতে খুব কম তাড়ি পাওয়া যায়। কখনও কখনও গাছের মাথা শুকাইয়া মরিয়া যায়।

ইহার কীড়া ৪র্থ চিত্রপটের ১ ও ২ চিত্রের গোবরে বা কোরা পোকার মত, তবে খুব বড়। ভোঁমরা রাত্রে গো মহিষ প্রভৃতির নাদীর সারে কিম্বা যেখানে অনেক পাতা ইত্যাদি পচিয়া সার হইয়াছে এমন জায়গায় ডিম পাড়ে। কীড়া এই সব খাইয়াই বড় হয় এবং ইহার মধ্যে বা মাটির ভিতর যাইয়া পুত্তলি হইয়া পরে ভোঁমরা হইয়া বাহির হয়। ভোঁমরা নারিকেল ও তাল গাছের মাথায় উড়িয়া যাইয়া উপরি উক্ত ভাবে খায়।

সিংহল দ্বীপে মাঝে মাঝে গাছ সকল পরীক্ষা করা হয় এবং ভোঁমরা ছিদ্র করিয়া ঢুকিয়াছে দেখিলে ঐ ছিদ্রে বড়শী বা মাছ ধরা কাঁটার মত কাণা বিশিষ্ট মোটা তার বা সরু কেঁচা ঢুকাইয়া দিয়া ভোঁমরাকে বিঁধিয়া বাহির করা হয় এবং মারা হয়।

কোথাও কোথাও গাছের নীচে গামলায় বা বড় মুখ ওয়ালা হাঁড়িতে খোল ভিজাইয়া পচাইয়া রাখে। ভোঁমরা রাত্রে উড়িতে উড়িতে খোলের গন্ধে জলে আসিয়া পড়ে এবং নষ্ট হয়। আবার কোথাও গাছের ডগ হইতে গোড়া পর্যন্ত চিটা গুঁড় লাগাইয়া দেওয়া হয়। লোকে মনে করে ইহাতে পিঁপড়েরা যাইয়া ভোঁমরাকে মারিবে; কিন্তু না মরিলে প্রায় ভোঁমরাকে পিঁপড়েরা আক্রমণ করে না।

আলো দেখিলে ভোঁমরা আলোর কাছে আসে। অতএব আলোক ফাঁদে অনেককে মারা যায়। নারিকেল গাছের মাঝে মাঝে যদি একটা আলো জ্বালিয়া রাখা যায় এবং এই আলোর নীচে একটা বড় গামলায় কেরাসিন মিশ্রিত জল রাখা যায়, তবে অনেক ভোঁমরা এই জলে পড়িয়া মরে। আলো এমন করিয়া রাখিতে হয় যেন জলটা চকচক্ করে।

ভোঁমরা হইতে নারিকেল গাছের বেশী ক্ষতি হউক না হউক, ১৭শ চিত্রপটের ৭ চিত্রে যে শুঁড়ওয়ালা বড় চেলে পোকার মত লাল পতঙ্গ দেখান হইয়াছে ইহা নারিকেল তাল খেজুর প্রভৃতি গাছের পরম শত্রু। যে গাছে লাগে সেই গাছই প্রায় মারিয়া দেয়। গাছের মাথায় যেখানে ভোঁমরা ছিদ্র করিয়াছে, বা তাড়ির কিম্বা রসের জন্য যে স্থান কাটা হইয়াছে কিম্বা গাছে যদি কোন রকম ফাট হয়, এই সমস্ত স্থানের ভিতর এই লাল পতঙ্গ ডিম পাড়ে। কখনও কখনও এই রকম কাটা স্থান বা ফাট না পাইলে পাতার গোড়ায় খোলের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে কীড়া খাইয়া ভিতরে যায়। চিত্রপটের ৫ চিত্রে কীড়া রহিয়াছে। কীড়া খাইয়া বড় হইলে গাছের ভিতরেই চিত্রপটের ৬ চিত্রের ন্যায় ছোব্‌ড়া জড়াইয়া গুটী প্রস্তুত করে এবং ইহার মধ্যে পুত্তলি হয়। তার পর পতঙ্গ হইয়া বাহির হয়।

পতঙ্গ গাছের ছিদ্র বা কাটা স্থানে ও ফাটলে ডিম পাড়ে। সেই জন্য এই রকম সমস্ত স্থান, কাদা, আল-কাত্‌রা ও বালি প্রভৃতি দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হয়, যাহাতে পতঙ্গ ডিম পাড়িবার স্থান না পায়। যে স্থান কাটিয়া তাড়ি লওয়া হয় গুজরাটের লোকেরা সেই স্থানে মন্‌সাসিজের আটা মাখাইয়া দেয়।

আর যাহাতে পোকার বংশ না বাড়ে সেই জন্য গাছ শুকাইলেই কাটিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। সমস্ত না হউক মাথার কতকটা নীচে হইতে কাটিয়া পুড়াইলেই হইল।

———০———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সাধারণ অনিষ্টকারী পোকা।

সুতলী ও শুঁয়া পোকা।

ফসলের পোকাদের কথা বলিবার সময় অনেক সুতলী ও শুঁয়া পোকার বিস্তৃত জীবন বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রায় সকল গাছেই পাতা খাওয়া সুতলী ও শুঁয়া পোকা দেখা যায়। প্রথমে প্রজাপতি পাতার উপরেই হউক আর ডালের উপরেই হউক ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে কীড়ারা ছোট বেলায় পাতার ছাল খায়; যত বড় হয় পাতায় ছিদ্র করিয়া কিম্বা কিনারা হইতে পাতা কাটিয়া কাটিয়া খায়। এই সময় পাতার উপর কিম্বা গাছের তলায় গোল দানার মত পোকার বিষ্ঠা দেখা যায়। অনেকে মনে করে এই দানা পোকার ডিম। কিন্তু সুতলী বা শুঁয়া পোকা ডিম পাড়িতে পারে না। পরে প্রজাপতি হইলে তবে ডিম পাড়িতে পারে। খাইয়া বড় হইলে গাছের উপরেই হউক আর মাটিতেই হউক পুত্তলি হয়। কিছুদিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। গরমের সময় অপেক্ষা ঠাণ্ডার সময় ডিম বেশী দিন পরে ফোটে, কীড়া বেশী দিন খায় এবং পুত্তলি অবস্থাতেও বেশী দিন থাকে। অধিকাংশই শীতকালে নিদ্রিত থাকে। ফাল্গুন চৈত্র হইতে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত খায় এবং ইহাদের বংশ বাড়ে। তারপর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ ফাল্গুন কিম্বা চৈত্র পর্য্যন্ত নিদ্রায় কাটায়।

এইরূপ পাতা খাওয়া সুতলী ও শুঁয়া পোকাকে প্রথম হইতে নজর রাখিয়া বাছিয়া মারিতে পারিলে আর অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু প্রথমে ২।১০টা হয় এবং পাতা খাইয়া সামান্যই ক্ষতি করে। সেই জন্য প্রায় নজরে পড়ে না। পরে ইহারা প্রজাপতি হইয়া ডিম পাড়িলে যখন অনেক পোকা জন্মিয়া খাইতে থাকে তখন নজরে পড়ে। কিন্তু সংখ্যায় বেশী হইলে ২।১০টার মত বাছিয়া মারা সহজ হয় না। পোকা বাছিয়া দূরে ছাড়িয়া দিলে কোনই ফল হয় না। কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া বা মাটিতে পুঁতিয়া মারিয়া ফেলা উচিত। অনেক সময় গাছ নাড়া দিলে পোকারা মাটিতে পড়িয়া যায়। তখন পায়ে করিয়া ঘসিয়া মারিলেই চলে। অনেক পোকা সকালে ও সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে খায় এবং দিনের বেলা মাটির ভিতরে যাইয়া লুকায়। এস্থলে নিড়ানর মত মাটি উল্টাইয়া দিলে অনেক পোকা বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া যায় এবং পাখী ইত্যাদিতেও অনেক খায়। এই রূপে অনেক পুত্তলিও নষ্ট করা যায়। ফসল ছোট থাকিলে পোকা ধরা থলে টানিয়া অধিকাংশ কীড়াকেই ছাঁকিয়া লওয়া যায়। মিশ্র ফসল ও ফাঁদ ফসলের উপকারীতার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ময়না শালিক প্রভৃতি অনেক পাখীতে ফসলের এইরূপ পাতা খাওয়া পোকা খায়। মাঠের মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ থাকা ভাল, এই গাছে পাখীরা থাকিতে পারে। ক্ষেতের মাঝে বাঁশ বা ডাল পুঁতিয়া দিলে পাখীরা ইহার উপর বসিতে পারে। মুরগীও পোকা ধরিয়া খাইয়া অনেক উপকার করে। এইরূপ নানা প্রকার সহজ উপায়ে পাতা খাওয়া কীড়া নষ্ট করা যায়। যেখানে সম্ভব হয় এবং বিশেষতঃ সব্জী বাগানে বিষ ছিটাইতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার হয়। কীড়া ছোট হইলে কেরাসিন মিশ্রণেই কাজ হয়। বড় হইলে সেঁকো বিষ দেওয়া আবশ্যক। শসা কুমড়ার চারা ও কপি প্রভৃতি গাছে ১ ভাগ কেরাসিন তেল ও ১৯ ভাগ গুঁড় চুণ বা মিহী ধুলা মিশাইয়া পাতার উপর ভাল করিয়া ছড়াইয়া দিলেও উপকার হয়।

কীড়াপাল।

কখনও কখনও দেখা যায় যে হঠাৎ অসংখ্য সুতলী পোকা বা শুঁয়া পোকা দলে দলে আসিয়া ক্ষেতে পড়ে এবং সম্মুখে যাহা পায় তাহাই খাইয়া শেষ করিয়া দেয়। পঙ্গপাল যেমন দলে দলে আসে ইহারাও সেই

রকম আসে, ইহাদিগকে "কীড়াপাল" বলা যায়। ধানের লেদা পোকা, ছোলা মসুরের লেদা পোকা, পাটের কাতরী পোকা, তামাকের লেদা পোকা প্রভৃতির সংখ্যা যখন অত্যন্ত বেশী হয়, তখন ইহারাই প্রায় কীড়াপাল হইয়া আসে। যে কোন পাতা খাওয়া কীড়ার সংখ্যা বেশী হইলেই কীড়াপাল হইতে পারে। সাধারণতঃ ইহারা বনজঙ্গলের পাতা খায়। কিন্তু সংখ্যা বেশী হইলে খাবার কুলায় না। তখন খাবারের খোঁজে ফসলে আসিয়া পড়ে। এই জন্য মাঠের নিকটে পড়া পতিতে আগাছার জঙ্গল অত্যন্ত ভয়ের কারণ। নজর না রাখিলে ফসলের ক্ষেতেই কীড়ার সংখ্যা বাড়িয়া কীড়াপাল হইতে পারে। সেই ক্ষেতের ফসল শেষ করিয়া অন্যান্য ক্ষেতে যাইয়া পড়ে। ২।৫ দিনের ভিতর অনেক প্রজাপতি বাহির হইয়া ডিম পাড়িলে কীড়াপাল হওয়া সম্ভব। শীত নিদ্রার পর যখন গরম পড়ে তখন প্রায়ই এক সঙ্গে অনেক প্রজাপতি বাহির হয় এবং সেই জন্য ফাল্গুন চৈত্র মাসে কীড়াপাল হওয়ার সম্ভাবনা।

কীড়াপাল যে ফসলে আসিয়া পড়ে সেই ফসল যদি ছোট থাকে তাহা হইলে ফসলের উপর পোকা ধরা থলে টানিয়া কীড়াদিগকে ছাঁকিয়া লইতে পারা যায়। ১৯ ভাগ গুঁড়া চুণ ও এক ভাগ কেরাসিন তেল কিম্বা ঐ পরিমাণ শুষ্ক মিহী ধুলা ও কেরাসিন তেল মিশাইয়া ফসলের উপর ছিটাইতে পারিলে কেরাসিনের গন্ধে কীড়ারা আর ফসল না খাইতে পারে। একটা বাঁশ কিম্বা দড়া ফসলের উপর টানিয়া দিনের মধ্যে ২।৩ বার গাছ নাড়িয়া দিতে পারিলে কীড়ারা মাটিতে পড়িয়া যায় এবং তাহাদের খাওয়ায় ব্যাঘাত জন্মে। এইরূপে খাওয়াতে ব্যাঘাত দিয়া অনেক ফসল বাঁচান যাইতে পারে।

কীড়াপাল এক ক্ষেতের ফসল খাইয়া অপর ক্ষেতে যায়। ক্ষেতে আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বে কিম্বা অনেক ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে বা এক ক্ষেত হইতে অপর ক্ষেতে যাইবার পূর্ব্বে মাটিতে নালা কাটিয়া ইহাদিগকে রোধ করা যায়। নালা এক হাত চওড়া এবং এক হাতেরও কম গভীর হইলেই যথেষ্ট। নালার দুইধার ঢালু রাখিতে হয় এবং ঢালু ধারে যদি আলগা মাটি থাকে তাহা হইলে নালায় পড়িলে কীড়ারা আর উঠিতে পারে না। যদি জল পাওয়া যায় তাহা হইলে নালায় জল ভরিয়া জলে একটু কেরাসিন তেল ঢালিয়া দিতে হয়। যত কীড়া এই জলে পড়িবে সকলেই মরিবে। নালা কাটিয়া কীড়াদিগকে একস্থানে আটক করিতে পারিলে আর অন্য ফসলের ক্ষতি হয় না। আটক করিবার পর পোকা ধরা থলে দ্বারা কিম্বা বিষ ছিটাইয়া অনেককে মারা যায়। অনেকেই বিরক্ত হইয়া নালায় যাইয়া পড়ে। নালায় কেরাসিন মিশ্রিত জল দ্বারাই হউক আর মাটি চাপা দিয়াই হউক মারা যায়।

কীড়াপাল আসিলে কৃষকেরা প্রায় কিছুই করে না। তাহারা মনে করে কাহারও শাপে ইহারা দেখা দিয়াছে। কিন্তু একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই কীড়াপালকে দমন করা যায়। খাইতে খাইতে কীড়ারা বড় হইলে মাটির মধ্যে যাইয়া পুত্তলি হয়। কৃষকেরা মনে করে পোকারা মরিয়াছে বা ক্ষেত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যে স্থানে কীড়ারা অদৃশ্য হইয়াছে সেই স্থানের মাটি উল্‌টাইলে অনেক লাল লাল পুত্তলি দেখা যাইতে পারে। পুত্তলি জড় করিয়া মারিতে পারা যায়। আরও এইরূপে বাহির করিয়া দিলে পাখীরা অনেক খাইয়া ফেলে। যদি এই সমস্ত পুত্তলি হইতে আবার প্রজাপতি হইতে পায় তবে ফসলের উপরেই তাহারা ডিম পাড়িবে এবং আরও বেশী সংখ্যায় ফসলে কীড়া দেখা দিবে।

ফড়িঙ।

মাঠ ফড়িঙ বা মেটে ফড়িঙের কথা যব গমের পোকার কথা বলিবার সময় বলা হইয়াছে। ফড়িঙ নানা রকমের আছে। ছোট ফড়িঙকে অনেকে বড় ফড়িঙের ছানা মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ফড়িঙ কিম্বা যে কোন পোকাই হউক যাহার ডানা হইয়াছে এবং উড়িতে পারে তাহা নিজেই এক স্বতন্ত্র পোকা, এবং আকারে ছোটই হউক আর বড়ই হউক তাহার সেই পূর্ণাবস্থা।

আমরা ছোট বড় এবং নানা রকম রঙ বিশিষ্ট কত রকম ফড়িঙ দেখিতে পাই। ইহারা কেবল পাতা খায়। ইহাদের পশ্চাতের পা খুব বড়। দেখিলেই ইহাদিগকে চেনা যায়। সকলেরই আচরণ এক রকম। ধেনো ফড়িঙ ও মাঠ ফড়িঙের মত সকলেই মাটির ভিতর ডিম পাড়ে। ডিম হইতে যখন ছানা ফড়িঙরা বাহির হয় তখন তাহাদের ডানা থাকে না, তাহারা লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। খোলস ছাড়িতে ছাড়িতে ক্রমে ক্রমে ডানা গজায়। ডানা সম্পূর্ণ বড় হইলেই ইহাদের পূর্ণাবস্থা হইল। তার পর স্ত্রী ও পুং ফড়িঙ সঙ্গম করে এবং আবার ডিম পাড়ে।

সাধারণতঃ ধেনো ফড়িঙ ও মাঠফড়িঙ ফসলের ক্ষতি করে। ইহা ছাড়া অন্য কোন ফড়িঙ যদি ফসলে আসিয়া পড়ে তবে বুঝিতে হইবে মাঠের কাছে পড়া পতিতের জঙ্গল হইতেই ইহারা আসিয়াছে। আরও কয়েক প্রকার পোকার কথা বলিবার সময় পড়া পতিতে আগাছার জঙ্গল হইতে দেওয়ার অপকারিতার বিষয় বলা হইয়াছে। পড়া পতিতে যদি কেবল ঘাস হইতে দেওয়া যায় তবে অনেকানেক পোকার মত সেখানে ফড়িঙও হইতে পায় না।

পঙ্গপাল।

পঙ্গপাল এক রকমের ফড়িঙ। ইহারা দল বাঁধিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে উড়িয়া যায়। পঙ্গপাল কি ক্ষতি করে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার দরকার নাই। আমরা অনেক রকমের ফড়িঙ দেখিতে পাই; কিন্তু ইহারা দল বাঁধিয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় উড়িয়া যায় না। অতএব ইহাদিগকে পঙ্গপাল বলা যায় না। ইহারা যদি বড় বড় দলে এইরূপে উড়িয়া যায় তবে ইহারাও পঙ্গপাল হইবে।

ধেনো ফড়িঙ ছাড়া আরও কয়েক প্রকার বড় ফড়িঙ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় আকন্দ গাছে হলদে ও সবুজ দাগ যুক্ত এক রকম ফড়িঙ থাকে। ৬৮ চিত্রে ইহাকে আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। গঙ্গা ফড়িঙের কথা আমরা প্রথমেই বলিয়াছি। ৬৯ চিত্রের মত সাদা কাল ও মেটে রঙের বড় বড় দাগ ওয়ালা এক রকম বড় ফড়িঙ অনেক গাছেই দেখা যায়। বেশীর ভাগ কাপাস গাছের উপরেই থাকে। এই সমস্ত বড় ফড়িঙ দেখিয়া অনেকে পঙ্গপাল মনে করে।
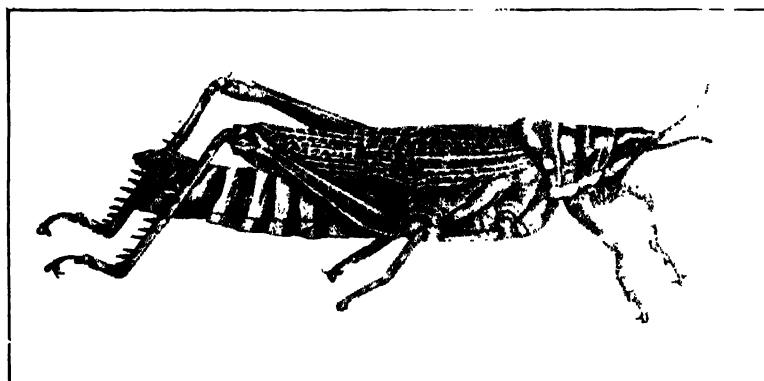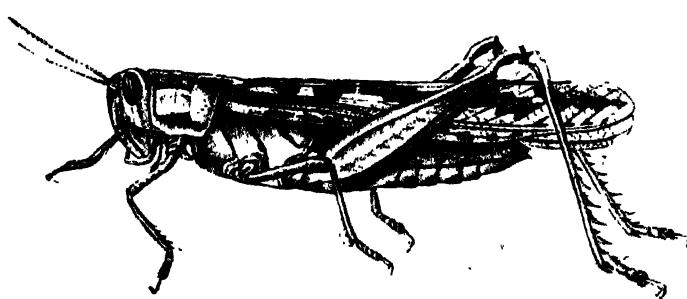
৬৮ চিত্র—ফড়িঙ।

ভারতবর্ষে কেবল দুই রকম পঙ্গপাল আছে। এক পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং অপর বোম্বাই প্রদেশে। পঞ্জাবের পঙ্গপালই কখনও কখনও বাঙ্গালা দেশে আসে। বোম্বাই প্রদেশের পঙ্গপাল কখনও বাঙ্গালা দেশে আসে না। নিম্নে পঞ্জা-

৬৯ চিত্র—ফড়িঙ

যেন পঙ্গপালের কথাই বলিব। বোম্বাইএর পঙ্গপালের সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। ৭০ চিত্রে যে ফড়িঙ রহিয়াছে, ইহাই বাঙ্গালা দেশে পঙ্গপাল হইয়া উড়িয়া আসে। ইহা দুই ইঞ্চিরও বেশী লম্বা

৭০ চিত্র—পঙ্গপাল।
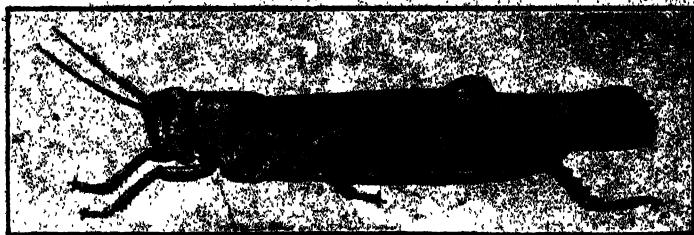
এবং প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি মোটা। ইহার গায়ে ও ডানাতে কোথাও সবুজ রঙ বা সবুজ ডোরা নাই। ইহার রঙ লাল এবং ঘাড়ে কাটা কাটা দাগ আছে ও ডানার উপর কাল কাল ছাপ্‌কা ছাপ্‌কা দাগ আছে। বাঙ্গালা দেশের কোন ফড়িঙের এরকম চেহারা নয়।

সাধারণতঃ ইহারা রাজপুতানার পাহাড়ে জায়গায় এবং বেলুচিস্থান ও পারস্য দেশের পাহাড়ের উপর থাকে। এই সমস্ত গরম স্থান ছাড়া ইহারা থাকিতে পারে না। অন্যান্য ফড়িঙের মত মাটিতে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তে এক
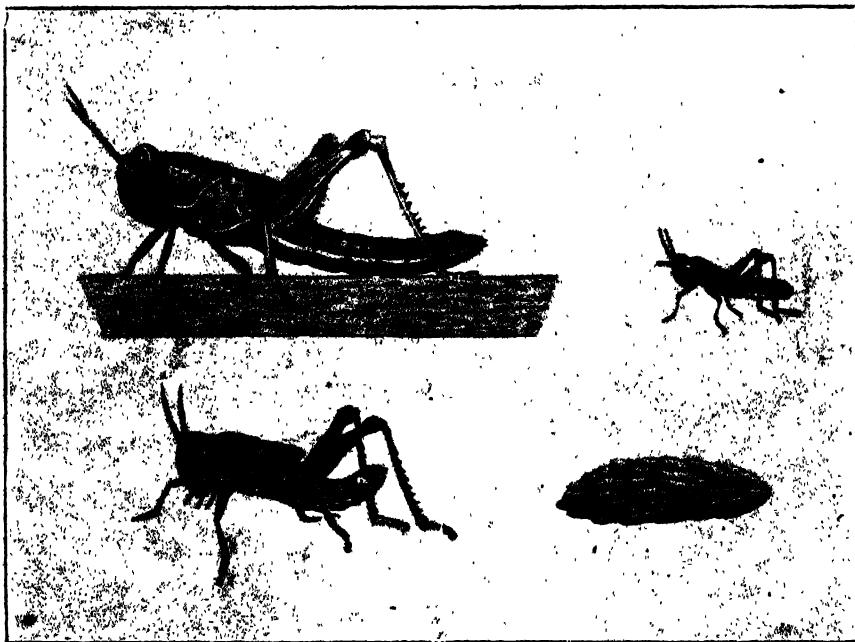
৭১ চিত্র—পঙ্গপালের ডিমের গোছা ও ছানা।

এক রাশি ডিম পাড়ে। ৭১ চিত্রের নীচে ডান ধারে এক রাশি ডিম মাটি হইতে উঠাইয়া মাটি ঝাড়িয়া দেখান হইয়াছে। এক একটা স্ত্রী পতঙ্গ এইরূপে এক সঙ্গে ১০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ১৫।২০ দিনে ডিম হইতে যখন ছানা বাহির হয় তখন ইহার ডানা থাকে না। খোলস ছাড়িতে ছাড়িতে ক্রমে ডানা গজায়। ৭১ চিত্রে ছোট বড় ৩টী ছানা ফড়িঙ আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। ছোট বেলায় ইহারা লাফাইয়া লাফাইয়া চলে এবং এক এক দলে অনেক থাকে। ৫ বার খোলস ছাড়িবার পর ইহাদের ডানা সম্পূর্ণ বড় হয়। সম্পূর্ণ ডানা হইতে প্রায় ২ মাস পর্য্যন্ত সময় লাগে। ডানা হইবার পর দলে দলে উড়িতে আরম্ভ করে। বড় বড় দল বাঁধিয়া উড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে গাছপালায় বসে ও খায়। এইরূপে খাইতে খাইতে কখনও কখনও বাঙ্গালা দেশে আসে এবং আসাম পর্য্যন্তও যায়। বাঙ্গালা দেশ তত গরম নয় এবং অধিকাংশই জলা। সেই জন্য বাঙ্গালা দেশে ইহারা ডিম

১৭শ চিত্রপট।

কয়েকটা অনিষ্টকারী কঠিনপক্ষ পতঙ্গ।

Engraved and Printed
by The Calcutta Phototype Co.

পারে না। পঞ্জাবে ইহাদের ছানাতে অনেক ক্ষতি করে। বাঙ্গালা দেশে ইহাদের ছানা কখনও দেখা যায় না এবং ছানা হইতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

পঙ্গপাল আসিলে আমাদের দেশে শাঁক, ঘণ্টা, ঘড়ি, কাঁসর প্রভৃতি বাজায়। বাজাইতে হয় বলিয়া বাজায়, কেন বাজায় তাহার কারণ অনেকে জানে না। শব্দ শুনিয়া পঙ্গপাল সে জায়গায় বসে না। না বসিলেই ক্ষতি হয় না। এক জায়গায় দাঁড়াইয়া দুই চারিজন লোকে এই রকম শব্দ করে তাহাতে প্রায় ফল হয় না; অনেক স্থলে পঙ্গপাল বসিয়া পড়ে।

পঙ্গপাল আসিতেছে জানিতে পারিলে সকলেই ভাঙ্গা টিন বা কেনেস্তারা হাতে করিয়া গ্রামের সমস্ত মাঠ ও বস্তির মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া খুব জোরে বাজাইতে হয়। বেড়াইয়া বেড়াইয়া বাজান ভাল। কেনেস্তারা না পাইলে থালা কাঁসর যাহা পাওয়া যায় বাজাইয়া খুব শব্দ করিতে হয়। ঢাক বাজাইলে, গেঁটে ও বন্দুক আওয়াজ করিলে, মাঝে মাঝে আগুন জ্বালিলে, কিম্বা যাহাদের কোন রকম বাজনা জোটে না তাহারা যদি সাদা কাপড় উড়ায় তাহা হইলেও প্রায় পঙ্গপাল বসে না। পঙ্গপাল উড়িয়া আসিতে আসিতে এবং না বসিতে বসিতে এই রকম শব্দ করিতে হয়। দলের আগে যে সকল ফড়িঙ আসে তাহারা যদি বসিয়া পড়ে তবে সমস্ত পালই বসিয়া যাওয়া সম্ভব। বসিয়া পড়িলেও নিশ্চিন্ত থাকিতে নাই। শব্দ করিতে হয় এবং পঙ্গপালের মধ্যে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া দুই হাতে কাপড় লইয়া ইহাদিগকে কাপড় দ্বারা আঘাত করিতে হয়। এই রকম করিলে অনেক সময় পঙ্গপাল সঙ্গে সঙ্গেই আবার উড়িয়া পালায়। পঙ্গপাল আসিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে নাই। ঝাঁটা দ্বারা আঘাত করিয়া কিম্বা জাল দিয়া ধরিয়া মারা প্রভৃতি নানা উপায়ে ইহাদিগকে খুব বিরক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সমস্ত না হউক অনেক ফসল বাঁচিয়া যায়। তাহা না করিলে সব শেষ করিয়া চলিয়া যায়। কাক চিল প্রভৃতি অনেক পাখী পঙ্গপাল ধরিয়া খায়। কোথাও কোথাও মানুষেও ইহাদিগকে ভাজিয়া ও সিদ্ধ করিয়া খায় বলিয়া শুনা যায়। কেহ কেহ বলে ভালুকেও খুব পঙ্গপাল খায়।

কয়েকটী অনিষ্টকারী কঠিন পক্ষ পতঙ্গ।

(১৭শ চিত্রপট।)

ধানের মরিচ পোকা, শশা কুমড়ার পোকা, ভোঁমরা ও কাঁটালে পোকার পাতা খাওয়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আরও অনেক এই জাতের পোকা আছে যাহারা গাছের পাতা খাইয়া অনিষ্ট করে। ১৭শ চিত্রপটের ১, ২ ও ৩ চিত্রে যে সাদা, সবুজ ও মেটে রঙের পোকা দেখান হইয়াছে ইহারা কাপাস অড়হর শীম প্রভৃতি আরও অনেক গাছের পাতা খায়। বেশী হইলে বিশেষ অনিষ্ট করে। ইহাদিকে মারা খুব সহজ। গাছের নীচে একটা কাপড় কিম্বা উল্টা করিয়া ছাতা ধরিয়া গাছ নাড়া দিলে সকলেই গাছ হইতে কাপড় কিম্বা ছাতার মধ্যে পড়িয়া যায়, তার পর কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়।

১৭শ চিত্রপটের ৪ চিত্রে যে ছোট পোকা পাতা খাইতেছে এই রকম ছোট পোকা অনেক রকমের আছে। কাহারও রঙ কাল বা নীল, কাহারও লাল, কাহারও গায়ে ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে। সকলেরই আবার ছোট এবং সকলেই খুব লাফাইতে পারে। ইহাদের কাছে না যাইতে যাইতে লাফাইয়া অন্য গাছে যাইয়া বসে। ইহারা পাতায় ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া খায়। ইহাদের খাওয়া দেখিলেই ধরা যায়। এক এক সময় ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী হয়। তখন পাতা খাইয়া ক্ষতি করে। ইহারা ধান যব গম প্রভৃতি মাঠের ফসল এবং আলু বেগুন ইত্যাদি খায়।

ধান যব গমের উপর দ্রুতগতিতে পোকা ধরা থলে টানিয়া ইহাদিকে ধরিয়া মারা খুব সহজ। থলে একটু কেরাসিন তেলে ভিজাইয়া লইতে হয়। বেগুণ প্রভৃতির উপর সেঁকো বিষ ছিটাইয়া দিলে বিষ খাইয়া মরে।

ফুলের কাঁচ পোকা, ধানের কাঁচ পোকা বা বড় ঘোড়া পোকার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৭ চিত্র পটের ৯ চিত্রে যে পীঠে হলদে ডোরাযুক্ত কাঁচ পোকা আঁকিয়া দেখান হইয়াছে শ্রাবণ ভাদ্র মাস হইতে অগ্রহায়ণ পৌষ পর্য্যন্ত ইহাকে প্রায় সব জায়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। দলে দলে আসিয়া লাউ কুমড়া শসা, ঢেঁড়স কাপাস প্রভৃতি অনেক গাছের ফুল খাইয়া দেয়। ইহারা কম উড়ে এবং সহজেই ধরা যায়। হাত জালে করিয়া ছোট ছোট ছেলেরা সহজেই ধরিয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে পারে। এমন করিয়া যদি ধোঁয়া দিতে পারা যায় যাহাতে ধোঁয়া গাছে লাগে তাহা হইলে ইহারা পালায়।

উই।

উই মৌমাছি ও পিঁপড়ের মত দলবদ্ধ হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের উই লইয়া দল গঠিত হয়।
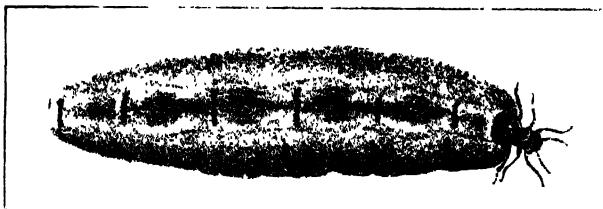
১ম—রাণী উই। ইহার চেহারা ৭২ চিত্রে দেখান হইয়াছে। ইহার পেটই সর্ব্বস্ব। মাথা ও পা ছোট। পেট ২·৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহার কাজ কেবল ডিম পাড়া। দিনের মধ্যে ৭০।৮০ হাজার ডিম পাড়ে বলিয়া শুনা যায়। রাণীই দল গড়ে এবং সে সেই দলের কর্ত্রী। রাণীকে মারিয়া দিলে উইএর দল ছোড় ভঙ্গ হইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

৭২ চিত্র—রাণী উই।

২য়—কতকগুলি ছানা উই। ইহাদের কেহ কেহ স্ত্রী উই ও কেহ কেহ পুরুষ উই। ইহাদের ডানা গজায় এবং ইহারাই বৃষ্টির পর বাদলা পোকা হইয়া বাহির হয়। ৬ চিত্রে বাদলা পোকা দেখান হইয়াছে। অনেক বাদলা পোকাকেই কাক পাখী, বেঙ, বাঁইবিড়াল, টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতি ধরিয়া খাইয়া ফেলে। যাহারা বাঁচিয়া যায় তাহাদের ডানা খসিয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষ উই এই সময় সঙ্গম করে। সঙ্গমের পর স্ত্রী উই বাসায় ফিরিয়া যায় কিম্বা আবার নিজেই নূতন একটা বাসা গঠন করে। এই সময় ইহার পেট ফুলিয়া বড় হয়। ইহারই ডিম ফুটিয়া উইএর দল হয় এবং ইহা নিজে রাণী হইয়া থাকে। রাণী উই দলের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্রকারের সকল উইএর মাতা।

৩য়—সৈনিক উই। ইহাদের বড় বড় দুইটী দাড়া আছে। ইহার চিত্র ৫ চিত্রের বাম ধারে দেওয়া হইয়াছে। ইহার কাজ পাহারা দেওয়া এবং দলকে শত্রু হইতে রক্ষা করা। ইহাদের কখনও ডানা হয় না।

৪র্থ—অনুচর উই। ইহার চেহারা ৫ চিত্রে ডান ধারে রহিয়াছে। আমরা সচরাচর যে উইকে দেখিতে পাই তাহারাই অনুচর উই। ইহারা দলের চাকর। ইহারা বাসা প্রস্তুত করে, খাবার যোগাড় করে, রাণী যে ডিম পাড়ে সেই ডিমের ও ছানা উইদের যত্ন করে। দলের সমস্ত কাজ কর্ম্ম ইহারাই করে। ইহারা নপুংসক এবং ইহাদের কখনও ডানা হয় না। দলের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই বেশী। ইহারাই আক্ যব গম আলু ইত্যাদি নষ্ট করে, গাছের শিকড় কাটিয়া গাছ মারিয়া দেয়, ঘর দরজার কাঠ খাইয়া দেয়, কাগজ, চামড়া প্রভৃতি যাহা পায় তাহাই নষ্ট করিয়া দেয়।

উই আলোক ভালবাসে না। প্রায়ই মাটির ভিতর দিয়া যাতায়াত করে; কিম্বা মাটি দিয়া রাস্তা

ঢাকিয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করে এবং এই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া যাতায়াত করে। উই মাটিতে ঘর করিয়া থাকে। ইহাদের ঘর কখনও কখনও সরজমিন্ হইতে ২।৩ হাতেরও বেশী উঁচু হয়। ইহাকেই বল্মিক বা উই ঢিপি কহে। প্রায়ই বাসা মাটির অনেক নীচে থাকে। উইএর ঘরে এক রকম ঝাঁঝরা স্পঞ্জের মত তাল তাল জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ডিম ও ছানা উই থাকিতে দেখা যায়। খাবার যোগাড় করিবার জন্য উই বাসা হইতে বহুদুর পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে। যেখানে উই দেখা যায় সেখান হইতে বাসা হয়ত অনেক দূরে।

উই যখন জিনিস খাইয়া প্রায় নষ্ট করিয়া দেয় তখনই উই ধরিয়াছে বলিয়া জানা যায়। উইএর উপদ্রব হইলে যদি ইহাদের বাসা খুঁজিয়া পাওয়া যায় তবে খুঁড়িয়া বাসা ও বাসার সমস্ত উই বিশেষতঃ রাণী উইকে নষ্ট করিয়া দেওয়াই সবচেয়ে ভাল উপায়। না খুঁড়িলেও কেরাসিন তেল ঢালিয়া দিয়া ঘরের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কিম্বা খুব বেশী পরিমাণে গরম জল ঢালিয়া দিয়া বাসা নষ্ট করিয়া দিতে হয়।

ঘরের মেজেতে যদি বেশী করিয়া সেঁকো কিম্বা হরিতাল জলে গুলিয়া এমন করিয়া ঢালিয়া দেওয়া যায় যে সব জায়গায় সেঁকো ও হরিতাল পড়ে তবে সে মেজেতে কখনও উই হয় না। পাকা ঘরের এক খান ইটের নীচে এবং কাঁচা ঘরের মাটির কিছু নীচে সেঁকো ও হরিতাল দিতে হয়। তবে দেওয়াল বহিয়া উই আসিতে পারে। সে সময় উহাদের রাস্তায় বা প্রবেশ দ্বারে কেরাসিন দিতে হয়। ঘরের খুঁটী ইত্যাদির কাঠে আল্কাৎরা মাখাইয়া দিলে অনেকদিন উই লাগে না। সেঁকো বা হরিতাল মাখাইয়া দিলে উই ধরে না। যেখানে সেঁকো থাকে সেখানে উই যায় না। নিম্নলিখিত উপায়ে সেঁকোর জল করিয়া সেই জল লাগাইতে হয়। ১ ভাগ সেঁকো ও ৪ ভাগ সোডা একত্রে কতকটা জলে মিশাইয়া যতক্ষণ না গলে ততক্ষণ আগুনে ফুটাইতে হয়। ফুটাইয়া যত থাকে তার ৩০ গুণ জল মিশাইয়া লইলেই সেঁকোর জল হইল। বাগানের অনেক গাছে উই লাগে তখন কি করিলে উপকার হয়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ফসলের ক্ষেতে উই লাগিলে ক্ষেতে জল সেচিবার সময় নালার মুখে জলের সঙ্গে একটু কেরাসিন মিশ্রণ বা কেরাসিন তেল, কিম্বা ক্রুড্ অয়িল ইমলসন্ কিম্বা ফিনাইল কিম্বা তামাকের জল মিশাইয়া দিতে পারিলে উপকার হয়। একটা টিনে কিম্বা হাঁড়িতে এই সমস্ত জিনিস রাখিতে হয় এবং টিন বা হাঁড়িকে নালার জলে বসাইয়া দিতে হয় এবং নীচে এমন একটা ছোট ছিদ্র করিয়া দিতে হয়, যাহাতে এই সব জিনিস অল্প অল্প বাহির হয় ও জলে মিশে। পুঁটুলি বাঁধিয়া তুঁতে নালার মুখে রাখিয়া দিলেও উপকার হয়। কেরাসিন তেল, তুঁতে প্রভৃতি জলের সঙ্গে যাইয়া মাটিতে বসে তাহা হইলে উই পালাইয়া যায়। গুজরাটে লঙ্কার ক্ষেতে উই লাগিলে এই রকমে জলের নালার মুখে রেড়ির খোল, নিমপাতা, আকন্দ পাতা ও সোর গোঁজা এক সঙ্গে বাঁটিয়া রাখিয়া দেয়। কখনও কখনও বেশী করিয়া রেড়ির বা সরিষার খোল দিতে পারিলেও উপকার হয়।

জমিতে শুকান গোবর ও মহিষ ছাগল প্রভৃতির শুকান নাদী দিলে প্রায় উই লাগে। উই প্রথমে সার খাইতে আসে তার পর সার ফুরাইলে ফসল নষ্ট করে। সারকে উত্তমরূপে পচাইয়া জমিতে দিলে আর সার হইতে উইএর ভয় থাকে না।

অনেক জায়গার লোক বলে যে আম গাছ মোটা হইতেছে না তাহার ছালের উপরটা যদি উই খাইয়া দেয় তাহা হইলে গাছ মোটা হয়। এই জন্য এই গাছের সমস্ত গুঁড়িতে খড় বা বিচালী জড়াইয়া তাহার উপর কাঁচা গোবর লেপিয়া দেয়। উই লাগিয়া গোবর ও খড় খাইয়া ছালের উপরটাও খাইয়া দেয়। ইহাতে গাছ মোটা হয় কিনা বলা যায় না। তবে অনেক স্থানেই দেখা যায় উই লাগিয়া বড় বড় গাছ মারিয়া দেয়। শিকড়ে লাগিলে গোড়ার মাটি কতকটা খুঁড়িয়া কেরাসিন বা ফিনাইল বা তুঁতের জল দিলে উই পালায়। গুঁড়িতে কেরাসিন, ফিনাইল বা ক্রুড্ অয়িল মাখাইয়া দিলে উই লাগে না। নিম্নলিখিত জিনিস মাটি হইতে দেড় হাত উপর পর্য্যন্ত গুঁড়িতে ভাল করিয়া মাখাইয়া দিলেও উই লাগে না।

হিক্কমালী গদ ১ ভাগ, হিঙ্গু ২ ভাগ, গুগ্গুল ২ ভাগ ও রেড়ির খোল ২ ভাগ লইয়া সকলকে গুঁড়া করিয়া এক সঙ্গে মিশাইয়া ১৫ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তার পর জল মিশাইয়া সামান্য আটা থাকিতে মাখাইয়া দিতে হয়। মাটি মিশাইয়া পাত্‌লা কাদার মত করিয়া প্রলেপ দিলেও হয়।

লাল পিঁপড়ে।

৭৩ চিত্র—লাল পিঁপড়ে।

এক রকম লাল লম্বাধরণের পিঁপড়ে ও উইএর মত কপি প্রভৃতির শিকড় খাইয়া গাছ মারিয়া দেয়। ইহারাও মাটির নীচে ঘর করিয়া থাকে। ৭৩ চিত্রে বড় করিয়া এই পিঁপড়ে দেখান হইয়াছে। ইহার স্বাভাবিক আকার মাঝখানের চিত্রের মত। ইহাদের পুরুষেরা দেখিতে বড় বড় বোলতার মত হয় এবং কখনও কখনও উড়িয়া আলোর কাছে আসে। জলের সঙ্গে ফিনাইল, কেরাসিন ইত্যাদি মিশাইয়া গোড়ায় দিলে ইহারাও পালায়।
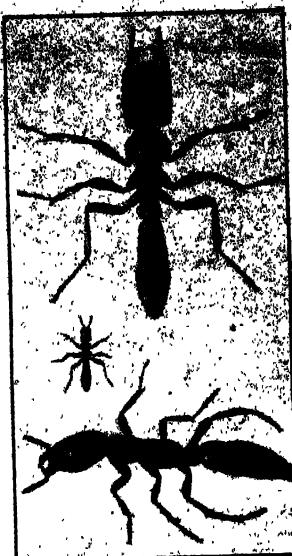
লাল মাকড়সা।

কখনও কখনও দেখা যায় অনেক গাছে পাতা কোঁক্ড়াইয়া শুকাইতেছে কিম্বা পাতার উপর অনেক ছোট ছোট কাল হল্‌দে ও সাদা দাগ হইয়া পাতা শুকাইতেছে। ভাল করিয়া দেখিলে পাতার উপর সরু মাকড়্সার জাল রহিয়াছে দেখা যাইবে এবং জালের মধ্যে অনেক ছোট ছোট লাল মাকড়সাও দেখা যাইবে। মাকড়সারা খুব ছোট এবং লাল বিন্দুর মত দেখায়। জাল দেখিয়াই ধরা যায়। ৭৪ চিত্রে এই মাকড়সাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। এই মাকড়সারাই সরু ছিদ্র করিয়া পাতার রস খায় এবং এইরূপে কাল হল্‌দে ও সাদা দাগ করিয়া দেয় ও পাতা শুকাইয়া দেয়। গন্ধক এই মাকড়সার পক্ষে মহৌষধ। এক টিন অর্থাৎ ২০ সের আন্দাজ
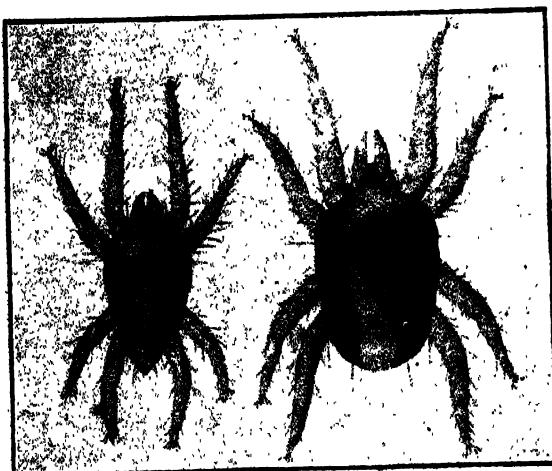
৭৪ চিত্র—লাল মাকড়সা।

ক্রুড্ অয়িল ইমাল্সনের বা স্যানিটারী ফ্লুইডের বা কেরাসিন মিশ্রণের জলে এক পোয়া গন্ধক উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া মিশাইয়া পাতার উপর ঝারি পিচ্‌কারী বা দমকলের দ্বারা ছিটাইতে পারিলে মাকড়সারা মরিয়া যায়। সামান্য জায়গায় হইলে যদি করাতের গুঁড়ার সহিত গন্ধক মিশাইয়া এই গুঁড়া জ্বালাইয়া এমন ভাবে ধোঁয়া দিতে পারা যায় যে ধোঁয়া পাতায় লাগে, তাহা হইলেও মাকড়সারা মরে। কাপড়ের থলিতে গন্ধকের গুঁড়া লইয়া পাতার উপর ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া দিলেও ইহারা মরে।

১৮শ চিত্রপট।

গোলাজাত শস্যাদির পোকা

Engraved and Printed by The Calcutta Phototype Co

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।
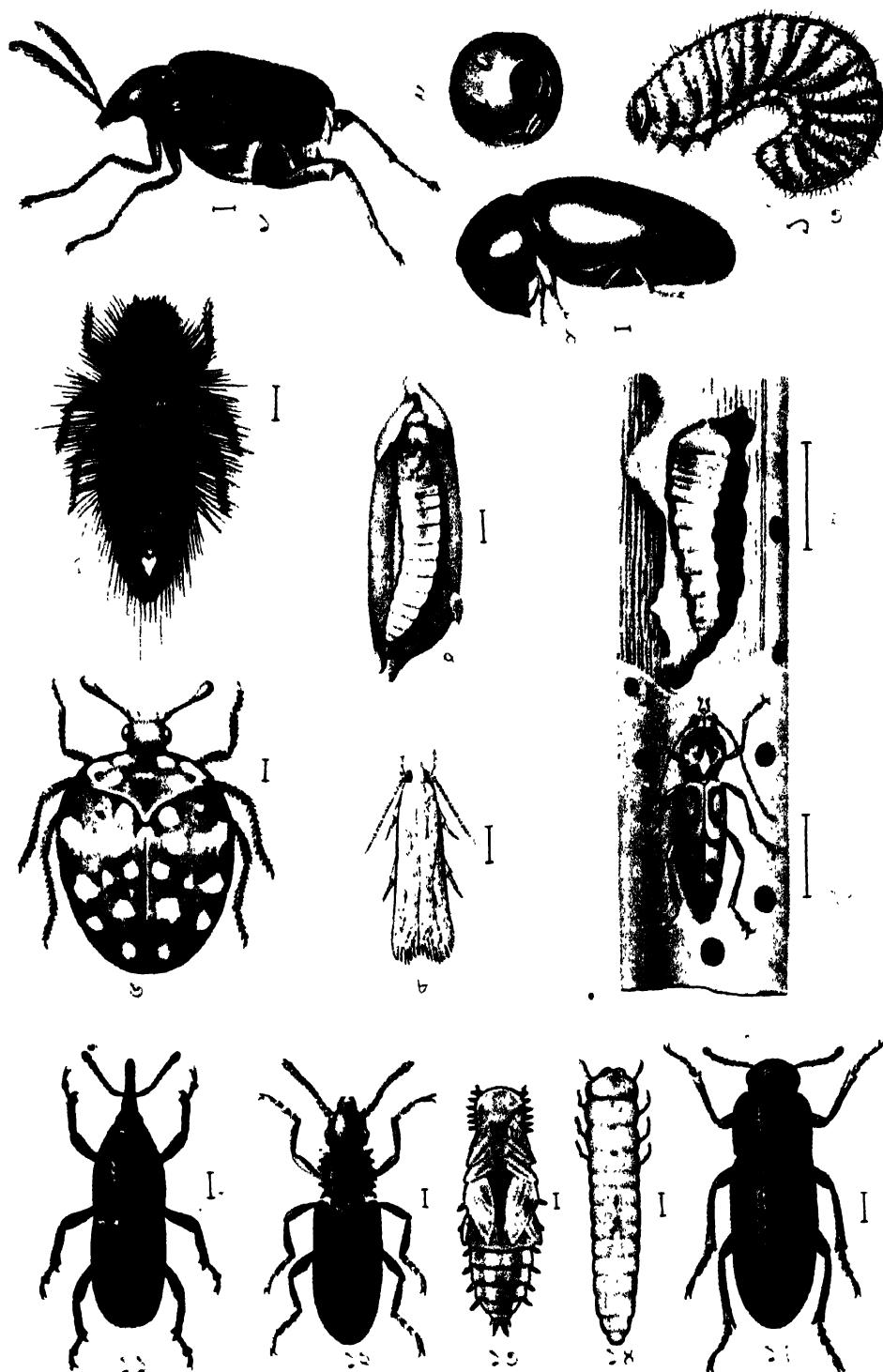
গার্হস্থ্য পোকা।

গোলাজাত শস্যের পোকা।

(১৮শ চিত্রপট।)

মটর, ছোলা প্রভৃতি কলাই যখন শুকাইয়া ঘরে রাখা হয় তাহাতে পোকা লাগে সকলেই জানে। ১৮শ চিত্রপটের ১ চিত্রে যে কঠিন পক্ষ পতঙ্গ দেখান হইয়াছে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহাকে চিনিতে পারিবেন; ইহাই সেই পোকা। ইহাকে অনেক বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ছোলা মটর প্রভৃতি পাইলেই ইহারা তাহার উপর ডিম পাড়ে। ১৮শ চিত্রপটের ২ চিত্রে মটরের উপর যে দুইটী তিসির আকারের সাদা সাদা ডিম দেখান হইয়াছে, ইহাই এই পোকার ডিম। যে ছোলা মটরে পোকা ধরিয়াছে হাতে লইয়া দেখিলেই তাহাদের উপর এই রকম অনেক ডিম দেখিতে পাওয়া যাইবে। ডিম ফুটিলে কীড়া বাহিরে আসে না। ডিমের ভিতর দিক হইতেই সিঁদ কাটিয়া কলাইএর মধ্যে ঢুকিয়া খাইতে থাকে। এই সময় ভাঙ্গিয়া দেখিলে ১৮শ চিত্রপটের ৩ চিত্রে যে কীড়া দেখান হইয়াছে, কলাইএর মধ্যে এই রকম কীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। কীড়া বড় হইয়া কলাইএর ভিতরেই পুত্তলি হয়। পুত্তলি হইবার পূর্ব্বে একটী বড় ছিদ্র করিয়া রাখে এবং ঐ ছিদ্রের মুখটী কলাইএর ছাল দিয়া ঢাকিয়া রাখে। এই সময় কলাই লইয়া যদি ভাল করিয়া দেখা যায়, তবে বুঝা যাইবে যে ছালটীকেও ভিতর হইতে গোল করিয়া কাটিয়া মাত্র ছিদ্রের মুখটীতে ঢাকনার মত লাগাইয়া রাখিয়াছে। পতঙ্গ এই ঢাকনাটীকে ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হয়। পোকা ধরা কলাইএর উপর এই জন্য বড় বড় ছিদ্র দেখা যায়।

তেঁতুলের বীজেও এই রকম এক প্রকার পোকা লাগে। তাহারাও এইভাবে ডিম পাড়ে ও খায়। তবে তাহারা পুত্তলি হইবার সময় প্রায় বীজ হইতে কতকটা বাহির হইয়া বীজের উপরেই একটী সাদা গোল গুটী প্রস্তুত করিয়া সেই গুটীর মধ্যে পুত্তলি হয়।

সুপারীতেও এই রকমের পোকা লাগে। তাহারা সুপারীর নাভিতে বা নাইএর ভিতর ডিম পাড়ে এবং এই রকমেই ভিতরে যাইয়া কুরিয়া কুরিয়া খায়। শুষ্ক মাছেও এই রকম পোকা ধরিতে দেখা যায়।

১৮শ চিত্রপঠের ৪ চিত্রে যে কঠিন পক্ষ পতঙ্গ দেখান হইয়াছে, ইহারা শুষ্ক তামাক, চুরুট, হলুদ প্রভৃতি ঘরের অনেক জিনিস খায়। এই সমস্ত জিনিস পাইলেই পতঙ্গ তাহাদের উপর ছোট ছোট ডিম পাড়ে। ৭।৮ দিনে ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া সিঁদ কাটিয়া খাইতে থাকে। ইহার কীড়া এই চিত্রপটের ৩ চিত্রের কীড়ার মত। ১ মাস কি কখনও দেড় মাস খাইয়া কীড়া হলুদ, চুরুট প্রভৃতির ভিতরেই পুত্তলি হয়। ৯।১০ দিন পরে পুত্তলি হইতে পতঙ্গ হইয়া আবার ডিম পাড়ে। পোকা ধরা চুরুটে যে ছিদ্র দেখা যায়, পতঙ্গেরাই এই ছিদ্র করিয়া বাহিরে আসে। পোকা ধরা হলুদেও ছিদ্র দেখা যায় এবং ভিতর হইতে অনেক গুঁড়া হলুদ বাহির হয়। এই গুঁড়ার সহিত পোকার বিষ্ঠাও থাকে।

"ঢেলে পোকা" সকলেরই চেনা সম্ভব। ১৮শ চিত্রপটের ১১ চিত্রে ইহাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহার শুঁড় দেখিয়া সহজেই বেশ চেনা যায়। ইহা চাউল গম মক্কা প্রভৃতি অনেক শস্যই আক্রমণ করে। ঢেলেপোকা শুঁড়দিয়া কুরিয়া কুরিয়া চাউলে ও গমে ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া এই গর্ত্তের ভিতর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে কীড়া ভিতরে খাইতে থাকে এবং চাউল ও গমকে ফোঁপরা করিয়া দেয়। এই সময় চাউল ও গম ভাঙ্গিয়া দেখিলে ৭৫ চিত্রের ন্যায় সাদা সাদা কীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। বড় হইয়া চাউল ও গমের ভিতরেই

পুত্তলি হয়, ৭৬ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে। তার পর পতঙ্গ অর্থাৎ আমরা যাহা দেখিতে পাই সেই চেলে পোকা হইয়া ছিদ্র করিয়া বাহির হয়।

১৮শ চিত্রপটের ১২ ও ১৫ চিত্রে যে পতঙ্গ দেখান হইয়াছে ইহারাও চাউল গম প্রভৃতি খায়। গুঁড়া চাউল,
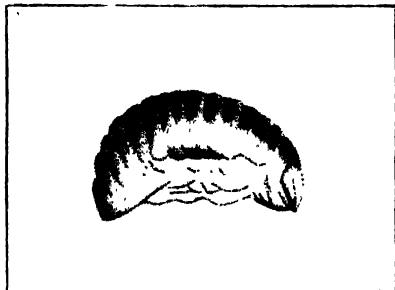
৭৫ চিত্র—চেলে পোকার কীড়া।
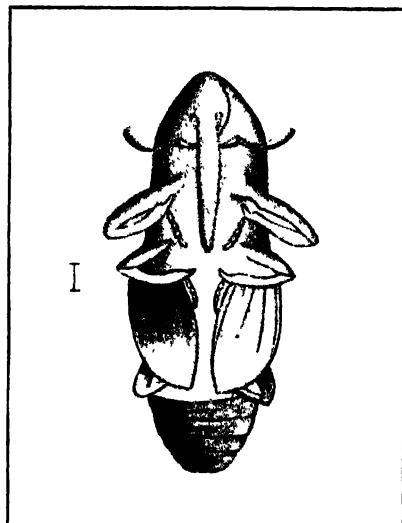
৭৬ চিত্র—চেলে পোকার পুত্তলি।

আটা, ময়দা প্রভৃতিও ইহারা আক্রমণ করে, এবং এই সকল জিনিস হইতে বিস্কুট প্রভৃতি যাহা প্রস্তুত হয় ইহারা সে সমস্তও খায়। মহুয়া বা গোলেও অনেক দেখা গিয়াছে। ইহারাও এই সমস্ত জিনিস পাইলে তাহার উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া কীড়া খাইতে থাকে। এই চিত্রপটের ১৪শ চিত্রে যে কীড়া বড় করিয়া দেখান হইয়াছে ইহাদের কীড়া দেখিতে এইরূপ। কীড়া খাইয়া বড় হইলে এই সমস্ত জিনিসের মধ্যেই পুত্তলি হয়। চিত্রপটের ১৩শ চিত্রে পুত্তলির চেহারা দেখান হইয়াছে।

ঘরে বা গুদামে ধান রাখিলে তাহাতে সুরুই লাগে সকলেই জানে। সুরুই এক রকম ছোট প্রজাপতি। ১৮শ চিত্রপটের ৮ চিত্রে ইহাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ধানের উপরে এক একটা প্রজাপতি ১৫০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিম অতি ছোট, শুধু চোখে দেখা যায় না। ৬।৭ দিন পরে ডিম ফুটিলে ছোট ছোট কীড়ারা সরু সিঁদ কাটিয়া ধানের ভিতর ঢোকে এবং চাউলটী খায়। সমস্ত চাউলটী খাওয়া শেষ হইতে হইতে ২০।২৫ দিনে কীড়া বড় হয়। ১৮শ চিত্রপটে ৭ চিত্রে ধানের উপর কীড়াকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। কীড়া বড় হইলে শূন্য খোসার ভিতরেই পুত্তলি হয়। পুত্তলি হইবার পূর্ব্বে খোসাতে একটী ছিদ্র করে এবং ছিদ্রের মুখ একটী পাতলা পর্দ্দায় বন্ধ করিয়া রাখে। পুত্তলি হইবার ৮।৯ দিন পরে প্রজাপতি বা সুরুই হইয়া এই পর্দ্দা ভেদ করিয়া বাহির হয় এবং আবার ডিম পাড়ে। ধানের গোলায় অনেক সুরুই উড়িয়া বেড়ায় দেখা যায়।
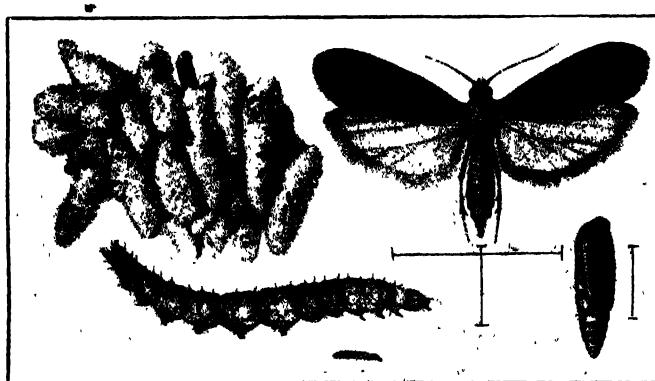
৭৭ চিত্র—।

চাউল, গম, আটা, ময়দা, সুজি, গুঁড়া চাউল, ভাঙ্গা চাউল, বেসন প্রভৃতিতেও সুরুই লাগে। সুরুই এর কীড়া এই সব জিনিসের দানা মুখের লালার দ্বারা জড়াইয়া বাসা প্রস্তুত করিয়া এই বাসার ভিতরে থাকে এবং ইহার ভিতরেই পুত্তলি হয়। ৭৭ চিত্রে বাম ধারে উপরে কতকগুলি এই রকম ময়দার বাসা দেখান হইয়াছে। তাহারই নীচে

কীড়াকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ডানধারে নীচে পুত্তলি এবং উপরে প্রজাপতি রহিয়াছে। তেঁতুল আমসত্ব প্রভৃতিতে এবং শুকান তামাক ও চুরুটেও সুরুই লাগে।

উপরি উক্ত সমস্ত জিনিস যখন ক্ষেতে থাকে তখন পোকা লাগে না। ঘরে আনিয়া রাখিবার পর এই সমস্ত পোকা দেখা দেয়। প্রথমে পোকারা এই সমস্ত জিনিস পাইলেই তাহার উপর ডিম পাড়ে। তার পর খাইয়া খাইয়া পোকাদের বংশ বাড়িয়া যায়। অতএব এই সকল জিনিস যদি এরূপে রাখিতে পারা যায় যাহাতে পোকারা তাহাদের উপর ডিম পাড়িতে না পারে তাহা হইলে পোকা লাগিতে পারে না।

কৃষক পরিবার পরবৎসর বীজের জন্য যে ধান কলাই গম ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে সেই সকলে পোকা লাগিয়া বীজ নষ্ট করিয়া দেয়। কৃষকেরা প্রায় হাঁড়ির মধ্যে বীজ রাখিয়া থাকে এবং হাঁড়ির মুখ ঢাকা রাখে। ইহাতে বাহিরের পোকা হাঁড়ির ভিতর যাইয়া ডিম পাড়িতে পারে না। কিন্তু যদি হাঁড়িতে রাখিবার পূর্ব্বেই পোকারা ডিম পাড়িয়া থাকে কিম্বা বীজের সঙ্গে ২।৪টা পোকা হাঁড়ির ভিতর ঢুকিয়া যায় তাহা হইলে হাঁড়ির মুখ ভাল বন্ধ থাকিলেও পোকারা খাইতে থাকিবে এবং তাহাদের বংশ বাড়িয়া সমস্ত বীজ নষ্ট করিয়া দিবে। বাঙ্গালা দেশের অনেক জায়গাতেই মরাই কিম্বা পুঁড়োর ভিতর ধান চাউল রাখা হয়। এরূপে ভরিয়া রাখা হয় যে পোকারা চলা ফেরা করিবার স্থান পায় না। এই জন্য মরাই পুঁড়োতে প্রায় পোকা লাগে না। কোথাও কোথাও মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া ধান কলাই প্রভৃতি রাখে। গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া রাখা হয়। কোথাও কোথাও মাটির দেওয়াল চড়াইয়া চড়াইয়া মরাইএর মত করা হয়। বেহার অঞ্চলে এই মাটির মরাইকে কোঠী বলে। কোঠীর এক ধারে নীচের দিকে হাত ঢুকাইতে পারা যায় এমন একটী ছোট ফুকর থাকে, সময় মত শস্য বাহির করিতে পারা যায়। কোঠী ভরিয়া উপরটাও মাটি দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়। কোথাও ধান ইত্যাদি রাখিবার জন্য গোল কিম্বা চারিকোণা ঘর প্রস্তুত করে এবং একধারে দেওয়ালে একটী ছোট দরজা রাখে। ইহাকে "হামার" বলে। কোঠীতে ও হামারেও পোকা ধরিতে দেখা যায়।

যে কোন উপায়েই শস্য রাখা হউক পোকারা যদি আসিয়া ডিম পাড়িতে পারে তবে সে শস্যে পোকা লাগিবেই। এমন জায়গায় রাখিতে হয় যেখানে পোকা ঢুকিতে পারে না। এক দিন খোলা জায়গায় পড়িয়া থাকিলে কখন পোকা আসিয়া ডিম পাড়ে জানিতে পারা যায় না। হাঁড়িতে বা জালাতে তলে উপরে নিমপাতা বা লসুন রাখিলে পোকা ধরে না বলিয়া শুনা যায়।

যেখানেই রাখা হউক মাঝে মাঝে শস্যাদি বাহির করিয়া পাতলা করিয়া বিছাইয়া রৌদ্রে দিলে উপকার হয়। এমন ভাবে বিছাইতে হয় যেন নীচের শস্যও গরম হয়। রৌদ্রে দিলে পোকারা পালায়। যদি বেশী গরম হয় তাহা হইলে ডিম এবং শস্যের ভিতরের কীড়াও নষ্ট হওয়া সম্ভব। বেশী গরম না হইলে ডিম ও কীড়া যেমন তেমনই থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। পোকা হইলে ঘন ঘন রৌদ্রে দিয়া পোকা তাড়াইতে হয়। পোকাদিগকে যদি মারিতে পারা যায় তাহা হইলেই ভাল হয়। কারণ ঘরের দরজায় বা অঙ্গনে শস্য শুকাইতে দেওয়া হয়। না মারিলে পোকারা শস্য ছাড়িয়া ঘরেই আশ্রয় লয়। পোকা বেশী হইলে চালুনী দ্বারা চালিয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। শস্য রৌদ্রে দিলে যখন শস্য ছাড়িয়া পালায় তখন ঝাঁটা দ্বারা জড় করিয়াও মারা যায়।

আগুনের উত্তাপে যদি কলাই ইত্যাদি গরম করা যায় তাহা হইলে ডিম, ভিতরের কীড়া এবং পতঙ্গ সমস্তই মরিয়া যায়। কিন্তু বীজকে এইরূপে আগুনে গরম করিলে সে বীজে আর গাছ হয় না। যে শস্য বীজরূপে ব্যবহৃত হইবে না তাহাকেই আগুনে গরম করা চলে।

কার্ব্বন বাই সালফাইড্ নামক এক প্রকার তরল পদার্থের গ্যাস দ্বারা বীজ ইত্যাদি যে কোন গোলাজাত

জিনিস শুদ্ধ করিয়া লইলে পোকা ডিম কীড়া ইত্যাদি সমস্ত মরিয়া যায়। মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বীজ ইহা দ্বারা শুদ্ধ করিয়া রাখা ভাল। শুদ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এমন জায়গায় রাখিতে হয় যেখানে পোকা পৌঁছিতে পারে না। শুদ্ধ করিলেও যদি খোলা জায়গায় রাখা হয় তাহা হইলে আবার পোকা লাগিতে পারে। এই গ্যাসে বীজ নষ্ট হয় না এবং যে শস্যে এই গ্যাস লাগান হইয়াছে তাহা খাইলে কোন ক্ষতি হয় না।

হাঁড়ি কিম্বা জালা কিম্বা কাঠের বাক্স কিম্বা গুদাম ঘর যাহা এমন করিয়া বন্ধ করিতে পারা যায় যে কোন রকমেই হাওয়া বাহির হইতে পায় না তাহাতেই এই গ্যাস দেওয়া চলে।

১ মণ ১০ সের বীজ বা শস্যের জন্য এক আউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক কার্ব্বন বাই সাল্‌ফাইড্‌ আবশ্যক হয়। হাঁড়িতে বা জালাতে এই হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়।
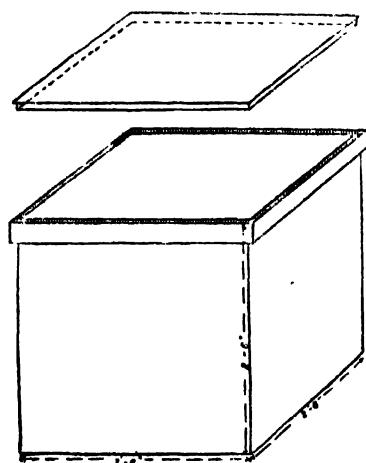
১৫ ঘন ফুট স্থানের জন্য এক আউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক কার্ব্বন বাই সাল্‌ফাইড্‌ ব্যবহার করিতে হয়। বড় ঘরে, বাক্সে বা টিনে ব্যবহার করিতে হইলে এই হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। ২৭½ মণ বীজ বা শস্যের জন্য ৮ ছটাক হইতে ১২ ছটাক পর্য্যন্ত কার্ব্বন বাই সাল্‌ফাইড্‌ দরকার।
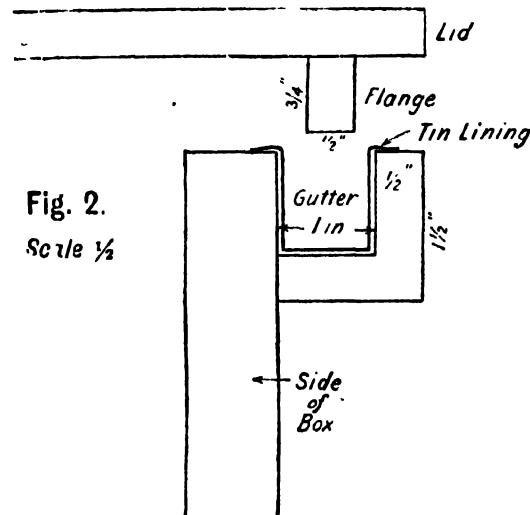
৭৮ চিত্র। ৭৯ চিত্র।

পুষা কৃষি কলেজে বীজ ইত্যাদি শুদ্ধ করিবার জন্য ৭৮ চিত্রের ন্যায় কাঠের বাক্স ব্যবহৃত হয়। ইহা ২½ ফুট দীর্ঘ ও ২½ ফুট প্রস্থ এবং ২½ ফুট গভীর। জোড়ন ফাট ইত্যাদি এমন ভাবে বন্ধ আছে যে সামান্য মাত্রও হাওয়া বাহির হইতে পারে না। বাক্সের উপরের কিনারার চারিধারে বাহিরে ৭৯ চিত্রের মত টিনের পাতে মোড়া নালা আছে এবং ঢাকনার নীচে চারিধারে কাঠের উঁচু কিনারা আছে। নালায় জল দিতে হয় এবং ঢাকনার নীচের উঁচু কিনারা ৮০ চিত্রের ন্যায় জলে ডুবিয়া থাকে। এই বাক্সে যত বীজ ধরে তাহার জন্য অর্দ্ধ ছটাক কার্ব্বন বাই সাল্‌ফাইড্‌ আবশ্যক হয়।
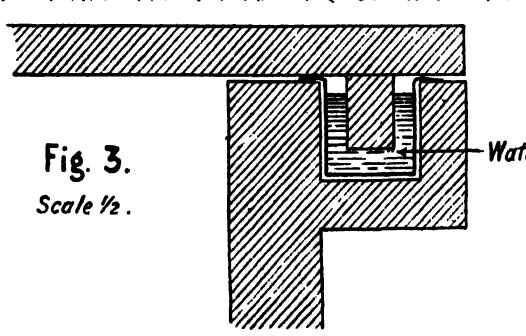
৮০ চিত্র।

হাঁড়ি বা জালার গলা পর্য্যন্ত ও বাক্সের প্রায় মুখ পর্য্যন্ত শস্য বা বীজ ভরিয়া উপরে কতকটা তুলা রাখিতে হয়। উপরে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে সেই হিসাবে যত কার্ব্বন বাই সাল্‌ফাইড্‌ আবশ্যক মাপিয়া লইয়া

তুলাতে ঢালিয়া দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করিতে হয়। ২৪ ঘণ্টা এইরূপে বন্ধ রাখিতে হয়। হিসাবের বেশী কার্ব্বন বাই সাল্‌ফাইড্ লইতে নাই কিম্বা ২৪ ঘণ্টার বেশী বন্ধ রাখিতে নাই। ২৪ ঘণ্টার পরে ঢাকা খুলিয়া পরিষ্কার পোকা শূন্য জায়গায় একবার শস্য ঢালিয়া দিতে হয়। থলের মধ্যে যদি শস্য থাকে তবে ঢালিবার আবশ্যকতা নাই। থলে হাওয়াতে থাকিলেই হইল। কতক্ষণ পরে গ্যাস উড়িয়া যায়। তখন শস্য উঠাইয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। গোলা বা গুদাম ঘরও এইরূপে কার্ব্বন বাই সাল্‌ফাইড্ দিয়া ২৪ ঘণ্টা বন্ধ রাখিতে হয়। তার পর দরজা ইত্যাদি খুলিয়া দিলে গ্যাস উড়িয়া যায়। গোলা বা গুদামের শস্যাদি এইরূপে পোকা শূন্য করিয়া ভাল করিয়া বন্ধ রাখিতে পারিলে পোকা লাগিতে পায় না। গোলা বা গুদাম বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার পরিষ্কার করা উচিত। আর গোলার ভিতর ভুষি তুঁষ ইত্যাদি রাখা উচিত নয়। ইহা খাইয়াও পোকারা বাঁচিয়া থাকে এবং ইহাদের বংশ বাড়ে।

কার্ব্বন বাই সাল্‌ফাইড্ বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। (১) ইহা বিষ। ইহার গ্যাস একটু বেশী শুঁকিলে জ্ঞান লোপ পায়। যেখানে লোকের যাওয়া আসার সম্ভাবনা নাই সেইখানে কার্ব্বন বাই সাল্‌ফাইড্ ব্যবহার করিতে হয়। (২) ইহার গ্যাস সহজেই জ্বলিয়া উঠে এবং কামানের মত আওয়াজ হয়। অতএব ইহার কাছে আলো বা আগুন লইয়া যাওয়া উচিত নয়। (৩) কাঁচের ছিপিওয়ালা শক্ত বোতলে কার্ব্বন বাই সাল্‌ফাইড্ রাখিতে হয়। সোলার ছিপি হইলে গ্যাস্ বাহির হওয়া সম্ভব। বোতল রৌদ্রে বা গরম জায়গায় রাখিতে নাই, তাহা হইলে ফাটিয়া যায়। বোতল সব সময়েই তালা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা উচিত। (৪) ইহার গ্যাস দুর্গন্ধময়; যেখানে বোতল থাকে সেখানে যদি গন্ধ পাওয়া যায় তবে কোন রকম আলো বা আগুন লইয়া সেখানে যাওয়া উচিত নয়। বোতল হইতে গ্যাস বাহির হইতেছে বুঝিলে ভাল বোতলে বদ্‌লাইয়া দেওয়া উচিত। আর সে ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া যাহাতে গ্যাস উড়িয়া যায় তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। (৫) বোতল কখনও আলো বা আগুনের কাছে লইয়া যাওয়া উচিত নয়।

ঘুণ।

কাঠে বাঁশে ঘুণ ধরিয়া নষ্ট করিয়া দেয় সকলেই জানে। ৮১ চিত্রে ঘুণের পতঙ্গের ও কীড়ার আকৃতি
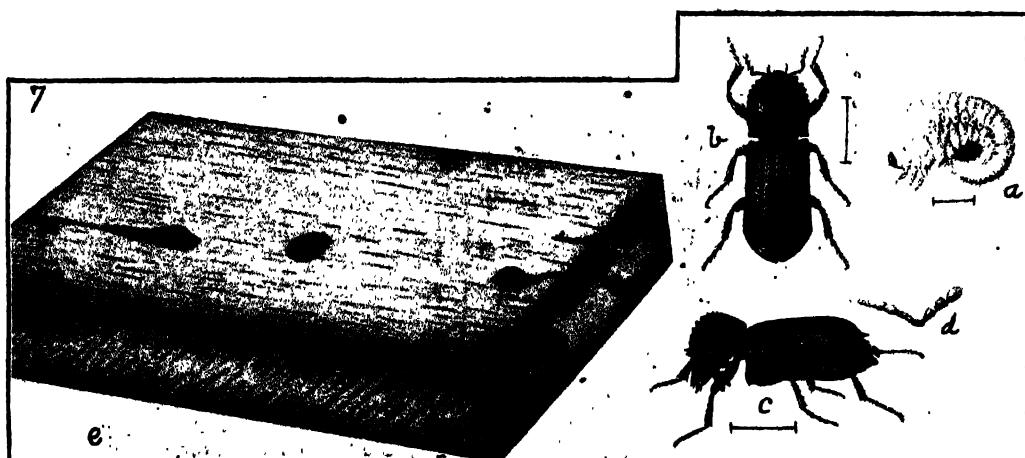
৮১ চিত্র—ঘুণ, কীড়া ও পতঙ্গ।

দেওয়া হইয়াছে। ৮২ চিত্রে আর এক রকম কাঠের ঘুণের কীড়া পুত্তলি ও পতঙ্গ রহিয়াছে। পতঙ্গ দেখিতে কাল রঙের এবং মাথাটা অত্যন্ত বড়। একবার দেখিলে সহজেই চেনা যায়। পতঙ্গ প্রথমে বাঁশ ও

৮২ চিত্র—ঘুণ, কীড়া, পুত্তলি ও পতঙ্গ।

কাঠে ডিম পাড়ে। কীড়া ফুকর করিয়া খাইয়া ভিতরে যায়। ইহাতেই কাঠ ও বাঁশ নষ্ট হয়। ইহারা ছাড়া ১৮শ চিত্রপটের ১০ চিত্রে যে পতঙ্গ দেখান হইয়াছে ইহারাও বাঁশের ঘুণ। এই পতঙ্গ কেবল আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বাহির হয়। তারপর যেখানে শুকান বাঁশ পায় তাহাতেই ডিম পাড়ে। ইহার কীড়া এই চিত্রপটের ৯ চিত্রে দেখান হইয়াছে। কীড়া খাইয়া বড় হইলে বাঁশের মধ্যেই পুত্তলি হয়। আবার জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণে পতঙ্গ বাহির হয়। খাট আলমারী প্রভৃতির কাঠের ভিতর ৮৩ চিত্রের কীড়ার ন্যায় কীড়া কর্ কর্ শব্দ করিয়া খায়। ইহাও এক প্রকার ঘুণ। কীড়া খাইয়া বড় হইতে কখনও কখনও দুই বা তিন বৎসর লাগে। তার পর কীড়া কাঠের মধ্যেই পুত্তলি হয় এবং পতঙ্গ হইয়া একটা ছিদ্র করিয়া বাহির হয়। ইহাদের পতঙ্গ ৮৪ চিত্রে দেখান হইয়াছে। ৮৩ চিত্রের ন্যায় কীড়া সচরাচর বড় বড় গাছের মধ্যে ফুকর করিয়া খায়। গাছ কাটিলে অনেক সময় এই কীড়া দেখা যায়। এই কীড়া তুঁত গাছের গুঁড়ি ও ডালের মধ্যে ফুকর করিয়া খায়।

৮৩ চিত্র—কাঠ ও গাছের ঘুণের কীড়া।

বাঁশের ঝুড়ি ইত্যাদিতেও ঘুণ লাগে। ঝুড়ি প্রস্তুত করিয়া গোবর মাটি লেপিয়া দেওয়া ভাল, তাহাতে ঘুণের পতঙ্গ আসিয়া ডিম পাড়িতে পায় না। বাঁশের জিনিস অনেকেই রসুই ঘরে ধোঁয়া পায় এমন স্থানে রাখিয়া থাকে। ইহাতেও ঘুণ ধরিতে পায় না। বার্নিশকরা বা রঙ লাগান বাঁশে ও কাঠে যতদিন রঙ ও বার্নিশ থাকে তত দিন প্রায় ঘুণ ধরিতে দেখা যায় না। বাঁশকে সচরাচর জলে ভিজাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে অনেক উপকার হয় সন্দেহ নাই। ইহার উপর যদি কেরাসিন তেলে ভিজাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে একবারেই ঘুণ ধরে না। বাঁশ কাটিয়া দুই এক দিন মধ্যে একটু শুকাইলে জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। দশ পনর দিন ভিজিলে উঠাইয়া যেখানে রৌদ্র লাগিতে পায় না এমন জায়গায় শুকাইতে হয়। শুকাইলে এমন করিয়া কেরাসিন তেল লাগাইতে হয় যে সমস্ত দিন ও রাত্রি তেলে ভিজা থাকে। মাসখানেক পরে আবার একবার এইরূপে কেরাসিন লাগাইতে হয়। এইরূপে জলে ভিজাইয়া কেরাসিন তেল লাগাইয়া লইলে কাঠেও ঘুণ ধরে না।

৮৪ চিত্র - ৮৩ চিত্রের কীড়ার পতঙ্গ।

অন্যান্য গার্হস্থ্য পোকা।

১৮শ চিত্রপটের ৫ চিত্রে যে কাল কাল লোমে ঢাকা ভালুকের মত কীড়া রহিয়াছে ইহারা পশমী কাপড়, উল ও বুরুষ খায়। ঐ চিত্রপটে ৬ চিত্রে ইহাদের পতঙ্গ দেখান হইয়াছে। এই রকমেরই রোম ওয়ালা আর এক রকম কীড়া চামড়া কাটিয়া ছিদ্র করিয়া দেয়। উল ও পশমের জিনিসে এক রকম মুরুইও লাগে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবে ইহাদের কীড়া পশমের টুকরা মুখের লালা দ্বারা বাঁধিয়া একটী ছোট বাসা প্রস্তুত করিয়া এই বাসার মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে বেশ ভাল করিয়া রৌদ্রে দিলে এবং ন্যাফ্থালিন্ দিয়া বাক্স আলমারীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে পোষাক ইত্যাদির পোকায় কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। কর্পূরেও কাজ হয়। তবে ন্যাফ্থালিন অনেক সস্তা। বড় বড় গুদামে এই সমস্ত পোকা যাহাতে না লাগে সেই জন্য গুদাম বেশ পরিষ্কার রাখিতে হয়। পোকা লাগিলে শস্যের গোলার ন্যায় কার্ব্বন বাই সালফাইড্ দিয়া পোকা মারিয়া যাহাতে আর পোকা এই সমস্ত জিনিসে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হয়।

আর্শলা—আর্শলাকে সকলেই ঘৃণা করে। আর্শলা প্রায় সকল জায়গাতেই দেখা যায়। ইহার কথা প্রথমে কিছু বলা হইয়াছে। গুড়—২ ভাগ ও বোরাসিক এসিড বা বোরাক্স—১ ভাগ মিশাইয়া কাগজের উপর ইহা মাথাইয়া ঐ কাগজ, যেখানে আর্শলা আছে সেই খানে রাখিয়া দিলে ইহারা ঐ গুড় খাইয়া মরিয়া যায়। যে ঘরে বেশ আলোক আছে এবং ময়লা জঞ্জাল ইত্যাদি থাকে না সেখানে আর্শলা থাকিতে পারে না। আর্শলাকে জলে ভিজাইয়া রাখিলে ঐ জল জ্বরের পক্ষে উপকারী বলিয়া শুনা যায়।

পিঁপড়ে—পিপড়েও ঘরে আসিয়া অনেক উৎপাত করে। ইহাদের হইতে চিনি ইত্যাদি কি করিয়া রক্ষা করিতে হয় সকলেই জানে। পিপড়ে অনেক রকমের আছে। তাহার মধ্যে ডেঁয়ে পিঁপড়ে প্রায় ঘরের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া থাকে এবং ডানা গজাইলে দলে দলে বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় বাহির হয়। সেই সময় অনেককেই কামড়ায়। গর্ত্তে তামাক ও গন্ধকের ধোঁয়া দিতে পারিলে কিম্বা কেরাসিন তেল কি ফিনাইল বা স্যানিটারি ফ্লুইড ঢালিয়া দিলে আর বাহির হয় না। অন্যান্য পিপড়েও যখন আসে কেরাসিন তেল ইত্যাদি দিলে তাহারাও পালায়।

ছার—বিছানা বালিস বেশ পরিষ্কার থাকিলে প্রায় ছার হয় না। তবে খাট চেয়ার টেবেল প্রভৃতির জোড়ন, ফাট ও ছিদ্রের মধ্যে থাকিয়া বড় বিরক্ত করে। এই সকল ছিদ্রের মধ্যে কেরাসিন তেল বা খুব গরম জল বা স্যানিটারি ফ্লুইড, ফিনাইল দিলে ইহারা মরিয়া যায়। মশার মত ছারও লোকের মধ্যে রোগ ছড়ায় বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন।

মাছি—মানুষের ঘরে যত রকম পোকা মাকড় থাকে তাহাদের মধ্যে মাছি ও মশা মানুষের বিষম শত্রু। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বিষ কেবল মাছিতেই লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। কলেরা প্রভৃতি রোগীর বিষ্ঠা ও বমিতে যাইয়া মাছি বসে এবং পায়ে করিয়া বিষ লইয়া যাইয়া কাহারও খাবারে বসে। তাহার খাবারে বিষ লাগিয়া যায়। এই খাবার খাইয়া তাহারও কলেরা হয়। মল, মূত্র, নর্দ্দমা, পচা জীবজন্তু ইত্যাদি এমন জিনিস নাই যাহার উপর মাছি বসে না। যে জিনিসে একবার মাছি বসিয়াছে সে জিনিস কিছুতেই খাওয়া উচিত নয়।

মানুষের ঘরে যে সকল মাছি দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা গোবরে ও মোহিষ ঘোড়ার নাদীতে জন্মে। গোবরে ও নাদীতে মাছিরা ডিম পাড়ে; ডিম হইতে ফুটিয়া ক্রমিরা গোবর ও নাদী খাইয়া বড় হয়। ক্রমিরা দেখিতে ফলের মাছির ক্রমির মত। বড় হইয়া মাটির একটু নীচে যাইয়া পুত্তলি হয়। পুত্তলিও ফলের মাছির ক্রমির পুত্তলির মত। পুত্তলি হইতে মাছি হইয়া বাহির হয়। শুকান গোবর বা নাদীতে মাছিরা ডিম পাড়ে না এবং ক্রমিরাও তাহা খাইয়া বাঁচিতে পারে না। নরম ও পাতলা গোবর নাদীতে মাছি জন্মে।

বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় গোবরের ঘুঁটে করিয়া জ্বালানি করা হয় ও তাহার ছাই সার হয়। ঘুঁটেতে কখনও

মাছি হয় না। অনেক জায়গাতেই মাটিতে একটা বড় গর্ত্ত করিয়া গো মোহিষাদির মল মূত্র এই গর্ত্তে রাখা হয়, ইহাতে বারমাসই গোবর নাদী ভিজা থাকে এবং লক্ষ লক্ষ মাছি জন্মে। আর বৃষ্টির জলও এই গর্ত্তে থাকিয়া যায়; গোবর নাদী কখনও একটুও শুকাইতে পায় না। গোবর নাদী অপেক্ষা গো মোহিষের মূত্র অধিক উপকারী সার। মূত্রও এই গর্ত্তে রাখায় প্রায়ই মাটিতে চারিয়া যায় এবং এমন উপকারী সারটা প্রায় সমস্তই ক্ষেতে না পড়িয়া লোকসান হইয়া যায়। গোয়ালে সরু সরু নালা কাটিয়া এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত, যাহাতে গোয়ালের সমস্ত গো-মোহিষের মূত্র এক ধারে একটা গর্ত্তে যাইয়া জড় হয়। প্রত্যহ এই মূত্র উঠাইয়া লইয়া যদি ক্ষেতে ঢালিয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে গোবর নাদী মূত্রের সহিত ঘাঁটা হয় না। গোবর নাদী গর্ত্তে না রাখিয়া একটা ডাঙ্গা জায়গায় বিছাইয়া ফেলিলেই শুকাইয়া যায়। শুকাইলে জড় করিয়া এক জায়গায় রাখিয়া দিতে পারা যায়। শুকাইলে ইহার গুণের হানি হয় না। গোবর নাদী ভিজা পাতলা থাকিলেও যেমন সার শুকাইলেও তেমনিই উপকারী সার। এইরূপ করিলে মাছিরও সংখ্যা বাড়িতে পায় না। ঘরের কাছে সার ডোবার দুর্গন্ধও ভোগ করিতে হয় না। যেখানে উইএর উপদ্রব আছে সেখানে শুকান সার জমিতে দেওয়া উচিত নয়। সে স্থলে গোবর ও নাদী মাটি চাপা রাখিলে মাছি জন্মিতে পায় না।

মশা।—মশার কামড়ে কেবল ঘুমের ব্যাঘাত হয় শুধু তাহাই নয়। ম্যালেরিয়ার রোগীকে কামড়াইয়া মশা যদি সুস্থ লোককে কামড়ায় তবে সেই সুস্থ লোকেরও ম্যালেরিয়া হয়। এইরূপে কয়েক রকমের জ্বর এবং কোথাও কোথাও পায়ের গোদ ইত্যাদি নানা রকমের রোগ মশাতে লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দেয় বলিয়া জানা গিয়াছে। সকল মশাতেই এইরূপে রোগের বিষ ছড়ায় না। তবে সাধারণ লোকের পক্ষে কোন মশাতে বিষ ছড়ায় জানা বড়ই কঠিন। সেই জন্য যাহাতে মশা না কামড়াইতে পায় তাহারই উপায় করা উচিত। সকলেরই মশারি ব্যবহার করা উচিত। "সিট্রনেলা অইল" নামক এক প্রকার তেল মাখিয়া ঘুমাইলে মশা কামড়ায় না দেখা গিয়াছে। মশা মারিবার জন্য ঘরে ধুনা গন্ধক ইত্যাদি পুড়াইয়া ধোঁয়া দেওয়া হয়। ধোঁয়াতে মশা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। ধোঁয়া দিবার পর ঝাঁটা দিয়া ঘর ঝাড়িয়া দেওয়া উচিত। তাহা না হইলে আবার অনেক মশাই বাঁচিয়া ঘরেই থাকিয়া যায়।

অন্ধকার ঘরেই বেশী মশা থাকে, এবং ঘরের যেখানে অন্ধকার পায় সেই খানেই দিনের বেলায় লুকাইয়া থাকে। জুতা, ভাঙ্গা বাক্স, হাঁড়ি ইত্যাদির ভিতর যাইয়া লুকায়। কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মাক্সয়েল লেফ্রয় মশা ধরা এক রকম কাঠের বাক্স প্রস্তুত করিয়াছেন। এই বাক্সের ভিতরটা কাল। ইহার ঢাকনা একটু খুলিয়া বাক্সটা ঘরে রাখিয়া দিতে হয়। মশারা যাইয়া ইহার ভিতর লুকায়। মাঝে মাঝে ঢাক্‌নাটা বন্ধ করিয়া পাশের একটা ছিদ্র দিয়া ভিতরে একটু ক্লোরোফরম্ বা বেনজিন্ বা কেরসিন তেল ঢালিয়া দিলে মশারা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। বাহিরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার বাক্স ঘরে রাখিতে হয়।

৮৫ চিত্র—মশার কীড়া।

মশারা জলের উপর গাদা করিয়া কাল কাল ডিম পাড়ে। বিশেষতঃ খাল ডোবায় যে জল দাঁড়াইয়া থাকে তাহাই বেশী ভালবাসে। ভাঙ্গা হাঁড়ি, খোলা বা গামলায় জল থাকিলে তাহাতেও ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া কীড়ারা জলেই থাকে। ৮৫ চিত্রে মশার কীড়া দেখান হইয়াছে। ইহাকেই সাধারণতঃ জলের পোকা বলা হয়। পুত্তলি হইয়া জলের মধ্যেই থাকে। তার পর মশা হইয়া ঘরে আসে।

ফ্লী—ঘরে ময়লা আবর্জ্জনা থাকিলে এক রকম পোকা হইতে পারে যাহাকে "ফ্লী" বলে। ইহারা মশা ও মাছি জাতীয় তবে ইহাদের ডানা হয় না; ইহারা লাফাইতে পারে। ইহারা ইন্দুর বিড়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তুর এবং মানুষেরও রক্ত খাইয়া থাকে। ময়লা জঞ্জালের মধ্যে ডিম পাড়ে। বিশেষতঃ যে খানে কোন জীব জন্তু শোয়

এমন জায়গায় ময়লাতে ডিম পাড়ে। কীড়ারা ময়লা, ইন্দুর ইত্যাদির বিষ্ঠা বা জীব জন্তুর রক্ত খাইয়া বড় হয়। তার পর ময়লা জঞ্জালের মধ্যেই পুত্তলি হইয়া ফ্লীরূপে বাহির হয়। ঘরের কোন স্থানেই ময়লা রাখিতে নাই। চুণের জল, বা ফিনাইল দিয়া ঘরদরজা ধোয়া খুব ভাল। তাহাতে ফ্লী ও ইহাদের কীড়া প্রভৃতি মরিয়া যায়। এই ফ্লীরাই প্লেগের বিষ ছড়ায় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। প্রথমে ইন্দুরের প্লেগ হয়। প্লেগাক্রান্ত ইন্দুরের রক্ত খাইয়া সেই ফ্লী যদি মানুষকে কামড়ায় তবে সেই মানুষের প্লেগ হয়।

উকুন।—উকুন কেবল অপরিষ্কার লোকের মাথাতেই হয়। যাহারা প্রত্যহ চুল ধুইয়া স্নান করে তাহাদের মাথায় কখনও উকুন হয় না। উকুনেরা চুলের উপর ডিম পাড়ে। উকুনের ডিমকেই "নিখি" বলে। উকুনেরা সরু শুঁড় মাথার চামড়ায় ঢুকাইয়া দিয়া রক্ত চুষিয়া খায়। গরু ছাগল মোহিষ প্রভৃতির গায়েও উকুন হয়। তাহাতে অনেক সময় চামড়ায় ঘা হইয়া যায়। মুরগী প্রভৃতি পাখীরও গায়ে এক রকম উকুন হয়। ইহারা রক্ত চুষিয়া খায় না, গায়ের মরা চামড়া বা পালক খাইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় পাখীরা গায়ে ধূলা মাখে; ধূলা মাখিয়াই ইহারা গায়ের উকুন দূর করে।

৮৬ চিত্র—এঁটেলী।
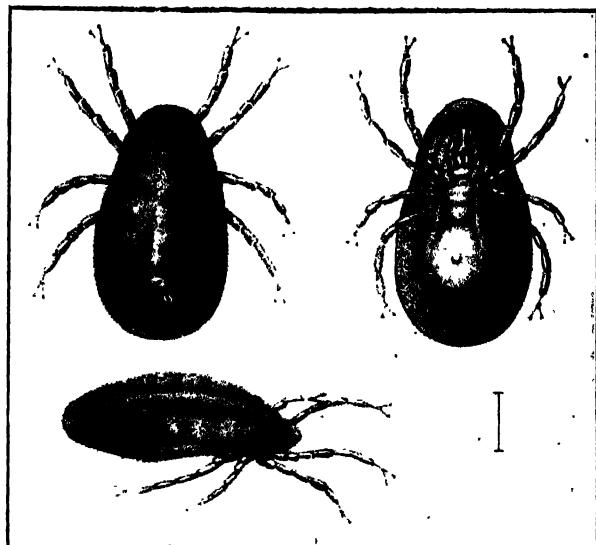
এঁটেলী—কুকুর ছাগল গোরু মহিষ প্রভৃতির এঁটেলী সকলেই দেখিয়া থাকিবে। ৮৬চিত্রে আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। ইহারা রক্ত চুষিয়া খায় এবং চামড়ায় এত শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে যে সহজে টানিয়া ছাড়ান যায় না। এঁটেলী খাইয়া বড় হইলে চামড়া ছাড়িয়া মাটিতে পড়ে এবং মাটিতেই একগাদা ডিম পাড়ে। ডিম হইতে যখন ফোটে তখন ছানা এঁটেলীদের ছয়টী পা থাকে। ছানারা ঘাস ইত্যাদির রস চুষিয়া খায় এবং গরু ছাগল সেই ঘাসের মধ্যে দিয়া যাইলেই ইহাদের গায়ে উঠিয়া যায়। তার পর একবার খোলস ছাড়ে, খোলস ছাড়িবার পর আরও দুইটা পা হয়। বড় এঁটেলীদের মাকড়সার মত ৮টী পা থাকে। মশা যেমন মানুষের মধ্যে রোগের বিষ ছড়ায় এঁটেলী সেই রকম গো মোহিষ প্রভৃতির মধ্যে সংক্রামক রোগের বিষ ছড়ায় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

৮৭ চিত্র—কুকুর মাছি।

ডাঁস, কুকুর মাছি। ডাঁস ও আরও অনেক রকমের মাছি গরু মহিষের রক্ত চুষিয়া

থাকে। কুকুরের মাছি সকলেই জানে (৮৭ চিত্রে)। বিশেষতঃ বর্ষাকালে এই সকল মাছির উপদ্রব অত্যন্ত বেশী হয়। ইহাদিগকে তাড়াইবার জন্য গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দেওয়া ভাল।

অন্ততঃ সপ্তাহের মধ্যে একদিন গোরু মহিষ ছাগলকে জলে নামাইয়া খড় বা খড়ের নুড়ি দ্বারা সমস্ত গা ঘষিয়া ধুয়াইয়া দিলে উকুন ও এঁটেলীতে কষ্ট দিতে পারে না।

ক্রুড অয়িল ইমলসন্ ১ ছটাক চারি সের আন্দাজ জলে গুলিয়া, খড়ের নুড়ি দ্বারা এই জল গোরু মহিষের গায়ে ঘষিয়া লাগাইয়া দিলে উকুন এঁটেলী ধরে না। ৭।৮ দিন অন্তর অন্তর একবার মাখাইয়া দিতে হয়। এক সের জল ছইটা গোরুকে মাখাইতে কুলায়।

ঘায়ের মাছি। গোরু মহিষের ঘায়ে এবং মানুষের ঘায়েও অনেক সময় পোকা হয়। লোকে বলিয়া থাকে "মুড়ীর" মত পোকা হইয়াছে। এই মুড়ীর মত পোকা মাছির কীড়া। মাছিরা ঘায়ে বসিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিলে কীড়ারা ভিতরে খাইতে থাকে এবং ঘা বাড়াইয়া দেয়, কোন মতেই ভাল হইতে দেয় না। পোকা না হইলেও মাছিরাই যদি ঘায়ে বসিতে পায় তবে খাইয়া খাইয়া ঘা শুকাইতে দেয় না। গোরু মহিষের ঘায়ে লোকে কেরাসিন তেল দেয়। ক্রুড অয়িল ইমল্সনের জল দিয়া ধুইয়া দিলে এবং এই জল লাগাইয়া রাখিলে মাছি বসিতে পায় না এবং ঘা শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

একরকম মাছি ভেড়ার নাকের ভিতর ডিম পাড়ে; ডিম ফুটিলে কীড়ারা নাকের মাংস খায় ইহাতে নাকে ঘা হয় ও পুঁজ হয়। কীড়া বড় হইলে মাটিতে পড়িয়া পুত্তলি হয় তার পর মাছি হইয়া উড়িয়া যায়। গোরু ঘোড়া প্রভৃতির পীঠে কখনও কখনও আব দেখা যায়। এক রকম মাছির কীড়া ভিতরে খাইয়া এই রকম আব করিয়া দেয়। মাছিরা প্রায় খুরের কাছে বা এমন জায়গায় লোমের উপর ডিম পাড়ে যে স্থানটী গরু চাটিতে পারে। ৮৮ চিত্রে ডিম দেখান হইয়াছে। ডিম ফুটিলে কীড়া লোমের মধ্যে চলিয়া বেড়ায় এবং সেই জায়গাটা চুলকায়; তাহা হইলেই গরু সেই স্থানটা চাটে এবং এইরূপে মাছির কীড়া পেটের মধ্যে যায়। তার পর কীড়া খাইয়া খাইয়া পীঠে চামড়ার নীচে আসিয়া পৌঁছায়।

৮৮ চিত্র—আব মাছির ডিম।

সেই জায়গাটা ফুলিয়া উঠে। এই রকম মাছি লাগিলে ঘোড়া গোরু ডাক্তারকে দেখান উচিত। যদি রোজ খড়ের নুড়ির দ্বারা গরুর সমস্ত গা ও পা মাজিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মাছির ডিম নষ্ট হয়।

———o———

১৯শ চিত্রপট।

পদ্মপোকা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

উপকারী পোকা।

পোকাদের খাদ্যের বিষয় বলিবার সময় বলা হইয়াছে যে অনেক পোকা আছে যাহারা অন্য পোকা খায় (১২ পৃষ্ঠা দেখ)। ইহারা উপকারী পোকা, কারণ যে সব পোকা ফসল ইত্যাদি খাইয়া মানুষের অনিষ্ট করে সেই পোকাকে খাইয়া ইহারা মানুষের উপকার করে। হিংস্রক পরভোজী ও পরবাসী পোকা প্রায় সকলেই উপকারী।

পোলুপোকার উপর কুজী মাছি যেমন ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটিলে মাছির কৃমি যেমন পোলুপোকার দেহের ভিতর ঢুকিয়া ভিতর হইতে শরীর কুরিয়া কুরিয়া খায় ও পোলুপোকাকে মারিয়া দেয়, অনেক মাছি ও অনেক বোল্‌তা জাতীয় পোকা ঠিক সেইরূপে অনেক সূতলী ও শুঁয়া পোকাকে এবং অপর অনেক পোকাকে ও কীড়াকে মারে। এই সকল সূতলী, শুঁয়া ও অপর পোকাই ইহাদের খাবার। অতএব দেখা যাইতেছে অনেক পোকাই পোকার শত্রু। পৃথিবীতে যত রকম পোকা আছে সকলেরই এই রকম শত্রু আছে। এই শত্রুরা মানুষের সহায়। অনেক ছোট ছোট পোকা আছে যাহারা প্রজাপতি প্রভৃতির ডিমের ভিতর ডিম পাড়ে এবং ইহাদের কীড়া প্রজাপতি প্রভৃতির ডিমের রস খাইয়া দেয় এবং ঐ সমস্ত ডিম নষ্ট হইয়া যায়। যখন পাটের কাতরী পোকা বা তামাকের লেদা পোকার ডিম জড় করা হয় অনেক ডিমের ভিতরেই এই রকম ছোট ছোট উপকারী পোকা থাকে। যদি সুবিধা হয় ইহাদিগকে মারা উচিত নয়। একটা মাটির গামলা বা মালসায় জল রাখিতে হয় এবং এই জলে একটু কেরাসিন তেল মিশাইয়া দিতে হয়। যে সমস্ত ডিম জড় করা হয় সেই গুলিকে অপর একটা ছোট মালসায় রাখিয়া এই ছোট মালসাটীকে বড় মালসার জলের মধ্যে একটা ইটের উপর রাখিয়া দিতে হয়। শুঁয়া বা সূতলী পোকারা কেরাসিন মিশ্রিত জল পার হইয়া যাইতে পারে না। উপকারী পোকারা যখন পতঙ্গ হয় তখন উড়িয়া যায় ও আবার অন্য ডিম নষ্ট করে। কাপাসের ফঁদেল বা চুঙ্গি পোকা যখন জড় করা হয় ইহাদিগকেও এই রকমে একটা হাঁড়ির ভিতর মুখে জাল বাঁধিয়া রাখিলে ভাল হয়। অনেক কীড়ার দেহের ভিতরেই উপকারী পোকা থাকে। জালের ভিতর দিয়া উপকারী পোকারা উড়িয়া যায় এবং প্রজাপতিরা ভিতরেই ধরা থাকে। কুম্ভকারিকা বা কুমরে পোকার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহারাও উপকারী পোকা।

১৯শ চিত্রপটে যে পোকার চিত্র দেওয়া হইয়াছে ইহারাও উপকারী পোকা। ইহাদিগকে কোথাও কোথাও পদ্ম পোকা বলিয়া থাকে। কাঁটালে পোকার পতঙ্গের মত ইহারও পতঙ্গ, হল্‌দে রঙের লম্বা লম্বা ডিম এক জায়গায় ৪০।৫০টা গাদা করিয়া পাড়ে। চিত্রপটের ৮ চিত্র দেখ। চিত্রপটের ১ ও ২ চিত্রে ডিম বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ফুটিবার সময় ডিমের ২ চিত্রের মত রঙ হয়। ৫।৬ দিন পরে ডিম ফুটিয়া কাল কাল ৬টী পা ওয়ালা কীড়া বাহির হয়। ৩, ৪, ৬ চিত্রে কীড়া বড় করিয়া দেখান হইয়াছে ও ৯ চিত্রে কীড়া পাতার উপর রহিয়াছে। অনিষ্টকারী কাঁটালে পোকা ও উপকারী পদ্ম পোকার কীড়া সহজেই চেনা যায়। কাঁটালে পোকার কীড়া হল্‌দে রঙের এবং গায়ে অনেক কাঁটা আছে। পদ্ম পোকার কীড়া কাল রঙের ; ইহাদের গায়ে অল্প কাঁটা আছে। কি খাইতেছে একটু নজর করিয়া দেখিলেও চেনা যায়। কাঁটালে পোকার কীড়া ও পতঙ্গ যে পাতায় থাকিবে সেই পাতা কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে দেখা যাইবে। পদ্ম পোকার কীড়া বা পতঙ্গ কখনও পাতা খায় না, কেবল জাবপোকা ও ছাতরা পোকা খায়। ১০।১২ দিনে বড় হইয়া কীড়া পাতা বা ডালের উপরেই পুত্তলি হয়। ৭ চিত্রে পুত্তলি বড় করিয়া দেখান হইয়াছে ও ১০ চিত্রে পুত্তলি পাতার উপর রহিয়াছে। ৪।৫ দিন পরে পতঙ্গ বাহির হয়। পতঙ্গ অর্দ্ধখানি মটরের ডাইলের মত। ইহার রঙ হল্‌দে, পীঠে কাল কাল দাগ আছে ; চিত্রপটের

৫ ও ১১ চিত্র দেখ। চিত্রে যে পদ্ম পোকার পতঙ্গ রহিয়াছে ইহার পীঠে দুটী কাল দাগ আছে। কাহারও পীঠে ৭টী কাল ফোঁটা থাকে। অনেকেই পদ্ম পোকার কীড়া ও পতঙ্গকে অনিষ্টকারী মনে করিয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু ইহারা খুব উপকারী। অনবরত জাব পোকা ও ছাতরা খায়। যেখানে জাবপোকা আছে সেইখানে পদ্ম পোকা দেখা দিলে কিছু দিনের মধ্যেই জাব পোকা খাইয়া শেষ করিয়া দেয়। পদ্মপোকার জাতের আরও অনেক পোকা আছে যাহাদের কীড়া ও পতঙ্গ জাবপোকা ও ছাতরা খায়। ইহাদের কীড়ার পীঠে প্রায় সাদা সাদা তুলার গোছার মত ছোট ছোট গোছা সাজান থাকে। কাপাস প্রভৃতি গাছে ছাতরা লাগিলে এই রকম কীড়া ছাতরা খাইতেছে দেখা যায়।

৮৯ চিত্রে যে পোকা বড় বড় দুইটী দাড়ার মধ্যে একটী জাব পোকা ধরিয়া খাইতেছে দেখান হইয়াছে ইহাও জাব পোকার পরম শত্রু। ইহাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহা মেটে বা লাল্‌চে রঙের হয়। ইহারা জাব পোকার দেহের রস চুষিয়া খাইয়া কেবল খালি চামড়া বা খোসাটী ফেলিয়া দেয় বা কখনও কখনও নিজের পীঠে এই খোসা সাজাইয়া রাখে। ৯০ চিত্রে যে পতঙ্গ দেখান হইয়াছে ইহা এই কীড়ার পতঙ্গ। পতঙ্গের দেহের রঙ সবুজ; ডানা খুব পাত্‌লা পর্দার মত। এই পতঙ্গ প্রায়ই আলোর কাছে উড়িয়া আসে। ৯১ চিত্রে পাতার উপর যে লম্বা লম্বা সরু ডাঁটার উপর ছোট ছোট গোল জিনিস দেখান হইয়াছে এই সকল এই পতঙ্গের ডিম। ডাঁটার ও ডিমের রঙ সাদা। অনেক এই রকম ডিম একত্রে দেখা যায়। ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া অনবরত জাব পোকা ধরিয়া ধরিয়া খায়। ১২।১৪ দিন এইরূপে খাইয়া কীড়া বড় হইলে পুত্তলি হয়। তার পর পতঙ্গ হইয়া বাহির হয় ও যেখানে জাবপোকা আছে সেই খানে যাইয়া ডিম পাড়ে।

৮৯ চিত্র।

৯০ চিত্র।

২০শ চিত্রপটের ৫ চিত্রে যে মাছি বড় করিয়া আঁকিয়া দেখান হইয়াছে অনেকেই দেখিয়া থাকিবে মৌমাছির মত ইহা প্রায়ই ফসলের ক্ষেতে উড়িয়া বেড়ায়। এখানে ওখানে উড়িয়া দেখে কোথায় জাব পোকা আছে এবং জাবপোকার মধ্যে বসিয়া ডিম পাড়ে। চিত্রপটের ১ চিত্রে বড় করিয়া ও ৮ চিত্রে স্বাভাবিক আকারে পাতার উপর ডিম দেখান হইয়াছে। ডিম দেখিতে লম্বা ও সাদা এবং ইহার উপরে কাটা কাটা দাগ আছে। শুধু চোখে দাগ প্রায় দেখা যায় না। ২।৩ দিনের মধ্যে ডিম হইতে ক্রমি বাহির হইয়া সরু মুখটী চারিধারে বাড়াইয়া জাব পোকা ধরে এবং চুষিয়া খায় ও খোসাটী ফেলিয়া দেয়। চিত্রপটের ৭ চিত্রে ক্রমি জাব পোকা খাইতেছে দেখান হইয়াছে। ১৩।১৪ দিনের মধ্যে বড় হইয়া ক্রমি পাতার উপরেই

৯১ চিত্র।

১০শ চিত্রপট।

পুত্তলি হয়। চিত্রপটের ৪ ও ৯ চিত্রে পুত্তলি রহিয়াছে। তার পর ১০।১১ দিন পরে মাছি হইয়া বাহির হয় এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া যেখানে জাব পোকা আছে সেইখানে ডিম পাড়ে। জাব খাইয়া উপকার করে বলিয়া অনেক জায়গায় ইহাকে "গুণী পোকা" বলে। চিত্রপটের ২, ৩ চিত্রে বড় করিয়া ও ৬ চিত্রে পাতার উপর কৃমির আকৃতি দেখান হইয়াছে।

ছয়টী কোঁটা বিশিষ্ট ধামসা পোকার গান্ধি খাওয়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (৩য় চিত্রপটের ১১ চিত্র)। জলফড়িঙ অন্য পোকা ধরিয়া খায়। ৯২ ও ৯৩ চিত্রে যে পোকা আঁকিয়া দেখান হইয়াছে ইহারাও অন্য পোকা প্রজাপতি প্রভৃতি ধরিয়া খায়। সাপের মাসীপিসী মেটে ফড়িঙ ধরিয়া ধরিয়া খায়। ঝুবঘুরে, উইচিংড়ে, মাল কাঁকড়া প্রভৃতিও মাটির নীচে পোকা ধরিয়া খায়।

অনেক গান্ধিরজাতের শোষক পোকা অন্য পোকাকে আক্রমণ করে। তাহাদের গায়ে শুঁড় ঢুকাইয়া রস টানিয়া খায় ও তাহাদিগকে মারিয়া দেয়। অতএব ইহারাও উপকারী পোকা এবং ইহাদিগকে মারা উচিত

৯২ চিত্র।

৯৩ চিত্র।

নয়। যে সব শোষক পোকা গাছের রস খায় তাহাদের শুঁড় গান্ধির ন্যায় পেটের নীচে লম্বা ভাবে থাকে। আর যাহাদের শুঁড় ১০ চিত্রের ডান ধারের চিত্রের ন্যায় বাঁকান তাহারা গাছের রস খায় না, অন্য পোকার রস খায়।

কাক, শালিক, ময়না, ফিঙে প্রভৃতি অনেক রকমের পাখী, বেঙ, টিকটিকী, গিরগিটী, বাদুড় প্রভৃতি আরও কত জীব জন্তু পোকা খায়।

উপকারী পোকা ও এই সমস্ত জীবজন্তু চাষীর পরম বন্ধু। এই সমস্ত শত্রু না থাকিলে পোকার সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইত যে পৃথিবীতে একটী ঘাসও থাকিত না।

এই সঙ্গে যে সকল পোকা হইতে মানুষ জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহাদেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। মৌমাছি বা মধুমক্ষিকা হইতে মধু ও মোম পাওয়া যায়। এই জন্য বিলাত ও আমেরিকায় লোকে মৌমাছি পোষে। মৌমাছিদিগকে খাওয়াইতে খরচ নাই। গরু বাছুরের জন্য যেমন রাখাল দরকার হয় ইহাদের জন্য তেমন কোন লোকের আবশ্যকতা নাই। কাজ কর্ম্মের মধ্যে যতটুকু অবসর পাওয়া যায় তখন সামান্যরূপ দেখা শুনা করিলেই হয়। মৌমাছিদিগকে কাঠের বাক্সর মধ্যে চাক্ প্রস্তুত করান হয়। বাক্স বাগানের ভিতর বা যে কোন গাছের তলায় রাখিলেই হয়। মধু ও মোম বিক্রয়ের দ্বারা অনেকে বেশ দুপয়সা রোজগার করে। ভারতবর্ষের পশ্চিমে কোথাও কোথাও মৌমাছি পোষা হয় এবং মৌমাছিদিগকে হাঁড়ির ভিতর চাক্ প্রস্তুত করান হয়।

বাঙ্গালাদেশে রেশম, পাট, তসর, গরদের পোকার বিষয় প্রায় সকলেই জানে। পাট ও গরদের পোকা বা পলু তুঁতপাতা খায়। ইহাদিগকে ঘরের ভিতর ডালায় রাখিয়া তুঁত পাতা খাওয়াইতে হয়। পলু পুত্তলি হইবার পূর্ব্বে মুখের ভিতর হইতে সূতা বাহির করিয়া গুটী প্রস্তুত করে এবং এই গুটীর ভিতর পুত্তলি হয়। যে সূতা দ্বারা এই গুটী প্রস্তুত করে সেই সূতাই রেশম। আসামের এণ্ডির পলুদিগকেও এইরূপে ঘরের ভিতর ডালায় রাখিয়া খাওয়াইতে হয়। এণ্ডির পলুরা রেড়ীর পাতা খায়। তসরের পলুরা কুল, পলাশ, অর্জ্জুন, শাল প্রভৃতি গাছের পাতা খায়। ইহাদিগকে গাছেই রাখিতে হয়; পলুরা গাছের পাতা খায় এবং গাছের উপরেই গুটী প্রস্তুত করে।

লা বা লাক্ষা ছাতরার জাতের এক রকম পোকা হইতে পাওয়া যায়। ইহারা কুল, কুসুম, পলাশ, ডুমুর, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের রস খায়। লাক্ষা চাষ করা সহজ। বৎসরের মধ্যে দুইবার যখন ছানা ফোটে তখন ছানা সমেত ডাল কাটিয়া গাছে বাঁধিয়া দিলেই হয়। ছানারা গাছে চড়িয়া আপনারাই গাছের রস খাইবে এবং লাক্ষা প্রস্তুত করিবে। লাক্ষা হইতে গালা হয়। লাক্ষার রঙ দ্বারা আল্‌তা প্রস্তুত হয়, এবং অনেক জিনিস রঙ করা হয়।

———o———

পরিশিষ্ট।

পোকার পতঙ্গ বা পূর্ণ অবস্থা না দেখিলে পোকা চেনা বড় কঠিন। দ্বিজন্ম পোকা অনেক স্থলেই চেনা যায়; কারণ ইহাদের ছানারা দেখিতে পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত পতঙ্গেরই মত হয়। কিন্তু চতুর্জন্ম পোকার চারি অবস্থাতেই আকার ভিন্ন। সেই জন্য কোন পোকার ডিম, কীড়া বা পুত্তলি পাইলে ইহাদিগকে যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া পতঙ্গ হইতে দিতে হয়। সকল পোকাকেই পোষা যায়। পোকাদিগকে পুষিতে হইলে তাহাদিগকে

৯৪ চিত্র—কঠিনপক্ষ পতঙ্গ।

৯৫ চিত্র—শোষক পোকা।

৯৬ চিত্র—প্রজাপতি।
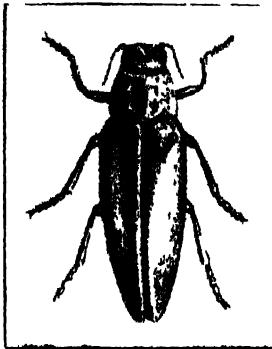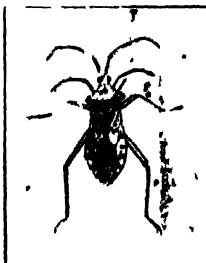
যে রকম অবস্থায় পাওয়া যায় সেই রকম অবস্থায় রাখিতে হয়। মাটির ভিতর বা গাছের ডাঁটায় কিম্বা যেরূপ ভিজা ঠাণ্ডা জায়গায় যে ডিম, কীড়া বা পুত্তলি পাওয়া যায়, তাহাদিগকে সেইরূপে ভিজা মাটি দিয়া বা অন্য কোন উপায়ে ঠাণ্ডায় রাখিতে হয়; শুকান অবস্থায় রাখিলে মরিয়া যায়।

৯৭ চিত্র—প্রজাপতি।

ডিম ফুটিলে ছোট ছোট কীড়াদিগকে যে পাতার উপর ডিম পাওয়া গিয়াছে সেই পাতা খাইতে দিতে হয়। ছোট কীড়াকে কচি পাতা দিতে হয় এবং ইহারা যেমন বড় হয় বড় পাতা দেওয়া চলে। কীড়াকে ছোট ডালা কিম্বা গ্লাস বা মাটির ভাঁড় বা মালসাতে রাখিতে হয়; মুখে কাপড় বাঁধিয়া বা অন্য কিছু দ্বারা ঢাকা দিতে হয় যেন কীড়া বাহির হইয়া না পালায়। রোজ রোজ নূতন পাতা দিতে হয় আর মালসার ময়লা ও পুরাতন পাতা পরিষ্কার করিতে হয়। মালসার তলে কিছু সেঁতসেঁতে মাটি রাখিলে ভাল হয়। অনেক কীড়া মাটির ভিতর যাইয়া পুত্তলি হয়। পুত্তলি হইলে আর খাবার দিতে হয় না; কিছুদিন পরে পতঙ্গ হইয়া বাহির হয়। যে কীড়া ডাঁটার ভিতর ফুকর করিয়া খায় তাহাকে ফুকর হইতে বাহির না করিয়া ডাঁটাটী কাটিয়া রাখিয়া দিতে হয়। ফুকরের ভিতরেই পুত্তলি ও পরে পতঙ্গ হইয়া বাহির
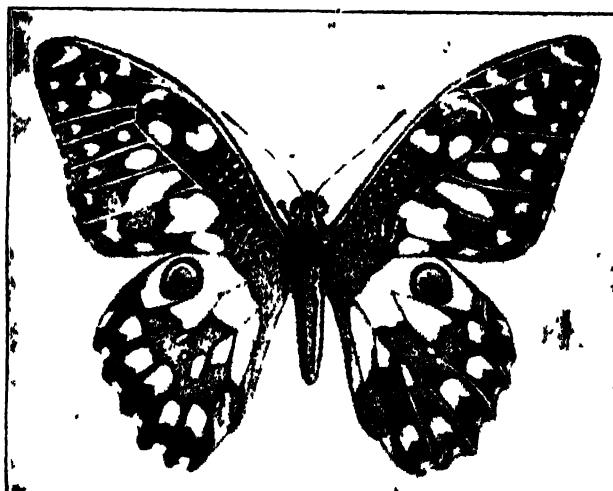
৯৮ চিত্র—প্রজাপতি।

হয়। অনেক সময় কাঁচা ডাঁটা শুকাইলে কীড়া মরিয়া যায়। সে স্থলে নূতন কাঁচা ডাঁটা আনিয়া তাহাতে একটী ছিদ্র করিয়া এই ছিদ্রের ভিতর কীড়াকে রাখিতে হয়। কীড়া খাইয়া ভিতরে যায়। এইরূপে মধ্যে মধ্যে ডাঁটা বদ্‌লাইয়া দিতে হয়। যাহারা মাটির ভিতর থাকিয়া শিকড় খায় তাহাদিগকে মাটিতে রাখিয়া শিকড় খাইতে দিতে হয়। যাহারা ফলের ভিতর থাকে তাহাদিগকে ফলের ভিতরেই রাখিতে হয়। যে পোকা পাতা ইত্যাদি কাটিয়া খায় তাহাদিগকে পোষা খুব সহজ; যাহা খায় রোজ রোজ সেই খাবার দিলেই হয়। যাহারা গাছের রস চুষিয়া খায় তাহাদিগকে পোষা কঠিন। গামলায় ছোট ছোট গাছ জন্মাইয়া তাহাদিগকে সেই গাছে রাখিতে হয়। যাহারা অপর পোকা খায় সেই পোকা ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়।

৯৯ চিত্র—লজফড়িঙ।
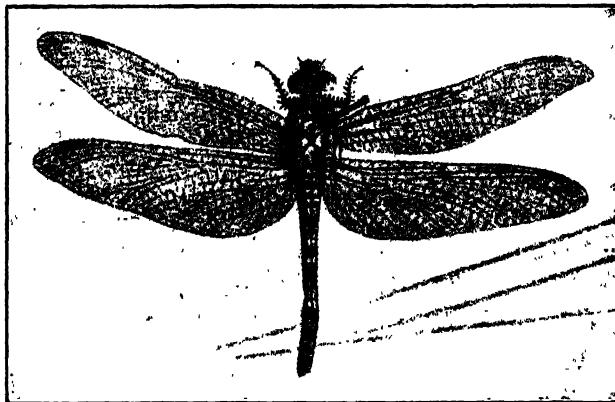
ভবিষ্যতে কীড়া বা পুত্তলি কিরূপ দেখিবার জন্য কাঁচের শিশিতে এক ভাগ ফর্ম্মেলিন্ (Formaline) ও ১৯ ভাগ জল মিশাইয়া এই জলে ইহাদিগকে রাখিলে পচে না, এবং ইহাদের আকার ও রঙ প্রায় ঠিক থাকে। স্পিরিটে (Rectified spirit) রাখিলেও বেশ থাকে। সরিষার তেলে রাখিলেও চলে। সুতলী পোকা প্রভৃতি যত নরম দেহ-বিশিষ্ট পোকাকে এইরূপে রাখা যায়। পতঙ্গকে জলে বা তেলে রাখিলে ভাল থাকে না। গ্লাস বা বড় মুখওয়ালা শিশি কিম্বা কৌটার ভিতর পতঙ্গকে রাখিয়া ক্লোরোফরম্ (chloroform) বা বেনজিনে (bengene) একটু তুলা ভিজাইয়া এই ভিজা তুলা ভিতরে দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়; ক্লোরোফরম্ বা বেনজিনের গ্যাসে পতঙ্গ কিছুক্ষণের মধ্যেই মরিয়া যায়। তার পর ইহাকে আল্‌পিনে গাঁথিয়া রৌদ্রে না দিয়া হাওয়া চলাচল হয় এমন স্থানে ২।৪ দিন রাখিয়া শুকাইতে হয়। শুকাইলে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। শুকাইবার সময় টিক্‌টিকী, পিঁপড়ে, ইন্দুর বা অন্য পোকায় যাহাতে না খায় সে বিষয়ে নজর রাখিতে হয়। যে বাক্সে রাখা হয় তাহাতেও ন্যাপ্‌থালিন্ রাখা উচিত। বাক্সের মধ্যে সোলা বসাইয়া সোলাতে আল্‌পিন্ ফুঁড়িয়া রাখিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতের পতঙ্গকে কিরূপে আলপিনে গাঁথিতে হয় ৯৪ হইতে ১০০ চিত্রে দেখান হইয়াছে। এইরূপে পোকা রাখিবার জন্য আলপিন বাক্স ইত্যাদি সমস্তই বিক্রয় হয়।

অনেকক্ষণ মরিলে পতঙ্গের পা ডানা ইত্যাদি শক্ত হইয়া যায় এবং আল্‌পিনে গাঁথিবার সময় ভাঙ্গিয়া যায়। ভিজা ব্লটিং কাগজ বা ভিজা করাতের গুঁড়া গ্লাস বা শিশিতে রাখিয়া ইহার উপর পতঙ্গকে রাখিতে হয় এবং ৮।১০ ঘণ্টা গ্লাস বা শিশির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলে পতঙ্গের পা ডানা ইত্যাদি নরম হইয়া যায় এবং যেমন ভাবে ইচ্ছা গাঁথা যায়।

১০০ চিত্র—দ্বিপক্ষ মাছি।

প্রজাপতি আল্‌পিনে না গাঁথিয়া ১০১ চিত্রের মত কাগজের ভাঁজের ভিতর রাখা যায়। ফড়িঙ উইচিংড়ি

প্রভৃতিকে ১০২ চিত্রের মত কাগজের নল করিয়া এই নলের ভিতর রাখা যায়। কঠিন পক্ষ পতঙ্গকে শুকান করাতের গুঁড়ার সঙ্গে রাখা যায়। যেরূপেই হউক পতঙ্গকে রাখিবার পূর্ব্বে শুকাইয়া রাখিতে হয় এবং যে বাক্সে রাখা হয় তাহাতে ন্যাপথালিন্ রাখিতে হয়।
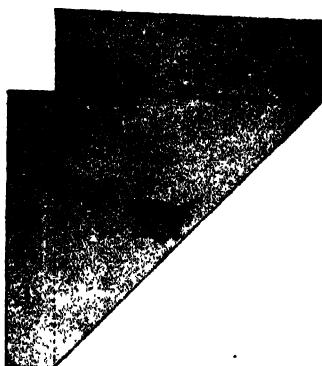
১০১ চিত্র।

১০২ চিত্র।

বিশেষ কথা।
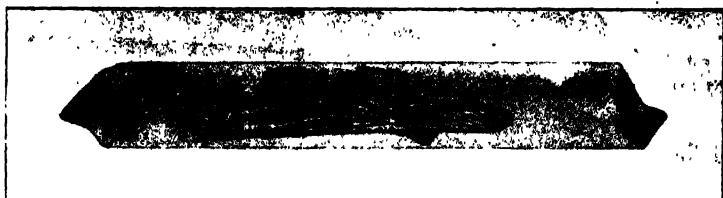
গবর্ণমেণ্ট ফসলাদির পোকার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। কোন পোকার বিষয় কিছু জানিতে হইলে ইকনমিক্ বটানিষ্ট, কৃষি কলেজ, সাবর, ভাগলপুর (Economic Botanist Ag icultural College, Sabour, Bhagalpur) এই ঠিকানায় লিখিলে তিনি যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবেন। তাঁহার নিকট ডাকযোগে বা রেলওয়ে পার্শেলে পোকা পাঠাইয়া দিতে হইবে। ডিম কতকটা তুলার সহিত কৌটায় বন্ধ করিয়া পাঠাইতে পারা যায়। যে ডিম মাটিতে পাওয়া যায় তাহা মাটির সহিত পাঠাইতে হয়। কীড়া টিনের বা কাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া পাঠাইতে হয়। বাক্সের ভিতর শুকান খড় পোয়াল বা ঘাস আল্‌গা করিয়া ভরিয়া কীড়াকে রাখিতে হয় এবং কীড়া যে পাতা খায় সেই পাতা সামান্য দিতে হয়। বেশী পাতা দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে পাতা পচে এবং কীড়া মরিয়া যায়। খাবার না দিলেও কীড়া এক দিন বাঁচিয়া থাকে। যে কীড়া ডাঁটার ভিতর থাকে তাহাকে বাহির না করিয়া ডাঁটা সহিত বাক্সের ভিতর পাঠাইতে হয়। পুত্তলিকে বাক্সের ভিতর তুলা, খড়, শুকান ঘাস বা করাতের গুঁড়ার সহিত পাঠান যাইতে পারে। যে পুত্তলি মাটিতে পাওয়া যায় তাহাকে সেঁতসেঁতে করাতের গুঁড়া বা মাটির সহিত পাঠান উচিত। পতঙ্গকে মারিয়া পাঠানই ভাল, তবে আল্‌পিনে গাঁথিবার প্রয়োজন নাই। মরা পতঙ্গকে কাগজের ভাঁজের ভিতর রাখিয়া তুলার সঙ্গে কৌটায় পাঠান যায়। প্রজাপতি, মাছি প্রভৃতি ছাড়া ফড়িঙ বা কঠিনপক্ষ পতঙ্গ প্রভৃতিকে কীড়ার মত জীবন্তও পাঠান যাইতে পারে। কীড়াকে স্পিরিট বা ফর্ম্মেলিনের জলে মৃত পাঠান যায়।

এইরূপে কোন পাকা পাঠাইয়া তাহার সম্বন্ধে কোন বিষয় অনুসন্ধান করিলে, সেই পোকা সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আছে লিখিয়া পাঠাইতে হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে লিখিয়া পাঠাইতে হয় নিম্নে দেওয়া হইল।

১। পোকা কোথায় (কোন জেলায় কোন স্থানে) দেখা দিয়াছে।

২। সেখানে এই পোকার কি নাম।

৩। কোন ফসল বা গাছ আক্রমণ করিয়াছে।

৪। কতদিন দেখা দিয়াছে।

৫। কি ভাবে ক্ষতি করিতেছে।

৬। ক্ষতির পরিমাণ কত।

৭। কত পরিমাণ জায়গায় দেখা দিয়াছে।

৮। সেই বৎসরে বা পূর্ব্বে আর কখনও এই পোকা দেখা দিয়াছিল কিনা।

৯। এই পোকা লাগিলে কৃষকেরা ফসল বাঁচাইবার জন্য কি উপায় করে।

১০। এই পোকার জীবন-বৃত্তান্ত কিছু জানা আছে কি না অর্থাৎ কোথায় ডিম পাড়ে, কীড়া ও পুত্তলি কিরূপে থাকে এবং পতঙ্গ কখন দেখা যায়।

১১। উপরের কয়েক বিষয় ছাড়া এই পোকা সম্বন্ধে আরও কিছু জানা আছে কি না।

অশুদ্ধি শোধন।

স্থলে	পড়িতে হইবে	পৃষ্ঠা	পংক্তি
গঙ্গাফড়িংএর	গঙ্গাফড়িঙের	২	১৯, ৩০
নাদি	নাদী	৫	৩১, ৩২, ৩৫
ক্রড্ অয়িলই মলসন	ক্রুড্ অয়িল ইমলসন	যেখানে দৃষ্ট হইবে	
ফুলিবার	ফুলানর	২৯	২৮
		২৫	৪
		২৬	২২
ফুলার	ফুলানর	২৮	১৫
ভিতরে	ভিতর	৩০	৮
উঠাইতে	উঠাইতে	৩৯	৩২
উপকারী	উপকারী	৪০	৩, ৫
সুরুইয়ের	সুরুইএর	৪৫	১৩
চুযিয়া	চুষিয়া	৪৭	৯
ঢেড়স	ঢেঁড়স	৪৮	৩৫
ইঞ্চি হয়	ইঞ্চি লম্বা হয়	৫১	২৩
দিন মধ্যে	দিনের মধ্যে	৫৫	১৯
দেঘান	দেখান	৫৬	১২
ছিড়িয়া	ছিঁড়িয়া	৫৬	২৬
ছাড়িরা	ছাড়িয়া	৫৭	২
পতঙ্গ	পতঙ্গকে	৫৯	৩
ঝাড়ু	ঝাঁটা	৬৪	৯
পুতিয়া	পুঁতিয়া	৬৪	৯
৫টী পর্য্যন্ত	৫০টী পর্য্যন্ত	৭৩	৩০
বীজ আলর পোকা	বীজ আলুর পোকা	৭৫	২০
ওজরাটের	গুজরাটের	৮৬	৩২

পত্রনির্ঘণ্ট।